একাত্তরের বীরযোদ্ধা

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই আজ আমরা স্বাধীন দেশে বসবাস করছি। কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সম্মান না দিলে আমরা কাদের সম্মান দেব? মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের বিবরণ নিয়ে *একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা* একটি অসাধারণ গ্রন্থ।

এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বীর উত্তম

প্রথম আলো HSBC

ISBN 978 984 90253 7 5

9 789849 025375

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরের বীরযোদ্ধা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথমা প্রকাশন

ক হও! ~ www.a

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ নামের এই রাষ্ট্র। মুক্তির লড়াইয়ে আমাদের বিজয়ের পেছনে ছিল বহু মুক্তিযোদ্ধার দুঃসাহসী অংশগ্রহণ। রাষ্ট্রও দেশমাতৃকার সেই সাহসী সন্তানদের সম্মানিত করে বীরত্বসূচক খেতাব দিয়ে। তাঁদের মোট ৬৭৬টি খেতাব দেওয়া হয়। চার স্তরের খেতাবের শীর্ষে রয়েছে 'বীরশ্রেষ্ঠ'। এরপর যথাক্রমে 'বীর উত্তম', 'বীর বিক্রম', 'বীর প্রতীক'।
যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ছাড়া এ দেশ স্বাধীন হতো না, তাঁদের অনেকে এখনো রয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। অনেকেরই পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত, বীরত্বগাথা অজানা। স্বাধীনতার ৪০ বছর উপলক্ষে তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে *প্রথম আলো* তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকে। ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধার সম্মুখযুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা* প্রথম খণ্ড। এবার বেরোল বইটির দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে আরও ৩১৬ জন খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাথা সংকলিত হলো। এই বইও আমাদের একাত্তরের রণাঙ্গনে নিয়ে যাবে, ইতিহাসের চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর উপাদানের সন্ধান দেবে আর পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করবে মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর উদ্দীপনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান

জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯৪৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর। সাপ্তাহিক *একতার* ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক (১৯৭০-১৯৭৩) ও সম্পাদক (১৯৭৪-১৯৯১) ছিলেন। পরে দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৯২-১৯৯৮)। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে *প্রথম আলোর* সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *কার রাজনীতি কীসের রাজনীতি; ইতিহাসের সত্য সন্ধানে : বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি*। ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে 'সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সৃজনশীল যোগাযোগ'-এ ২০০৫ সালে পেয়েছেন র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।

রাশেদুর রহমান

জন্ম ১৯৫৮, বগুড়ায়। পৈতৃক নিবাস বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলার চককাতুলী গ্রামে। পড়াশোনা বগুড়া ও ঢাকায়। পেশা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা ও সাংবাদিকতা। বর্তমানে *প্রথম আলোয়* কর্মরত। সম্পাদনা করেছেন *কুমিল্লা ১৯৭১ : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান* এবং *রাজশাহী ১৯৭১ : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান* (যৌথভাবে)।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরের বীরযোদ্ধা

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথমআলো HSBC

উদ্যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরের বীরযোদ্ধা

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

মতিউর রহমান

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা

রাশেদুর রহমান

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা প্রকাশন

একাত্তরের বীরযোদ্ধা :
খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, দ্বিতীয় খণ্ড
গ্রন্থস্বত্ব © প্রথমা প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৪১৯, মার্চ ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৫৫০ টাকা

Ekattorer Birjoddha : Khetab Pawa Muktijoddhader Birattagatha, Vol. 2
Edited by Matiur Rahman
Collected & Compiled by Rashedur Rahman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info
Price : Taka 550 Only

ISBN 978 984 90253 7 5
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে ১১
ভূমিকা (প্রথম খণ্ড) ১৩

বীরশ্রেষ্ঠ

নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯
মতিউর রহমান ২০
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ২১
মুন্সী আব্দুর রউফ ২২
মো. রুহুল আমিন ২৩
মোস্তফা কামাল ২৪
হামিদুর রহমান ২৫

বীর উত্তম

আকরাম আহমেদ ২৯
আনোয়ার হোসেন ৩০
আফতাব আলী ৩১
আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী ৩২
আবদুল করিম খন্দকার ৩৩
আবদুল কাদের সিদ্দিকী ৩৪
আবদুল লতিফ মণ্ডল ৩৫
আবদুস সালেক চৌধুরী ৩৬
আবু তালেব ৩৭
আবু তাহের ৩৮
আবু মঈন মো. আশফাকুস সামাদ ৩৯
এ এন এম নূরুজ্জামান ৪০
এ জে এম আমিনুল হক ৪১
কাজী নূরুজ্জামান ৪২
কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ ৪৩
খালেদ মোশাররফ ৪৪
চিত্তরঞ্জন দত্ত ৪৫
জিয়াউর রহমান ৪৬
নাসির উদ্দিন ৪৭
বেলায়েত হোসেন ৪৮
মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী ৪৯
মাহবুবুর রহমান ৫০
মীর শওকত আলী ৫১
মেহবুবুর রহমান ৫২
মো. আজিজুর রহমান ৫৩
মো. নুরুল আমিন ৫৪
মো. শাহজাহান ওমর ৫৫
মোজাহার উল্লাহ ৫৬
মোহাম্মদ আবদুর রব ৫৭
মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর ৫৮
মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার ৫৯
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ৬০
লিয়াকত আলী খান ৬১
শরীফুল হক ৬২
শামসুল আলম ৬৩
সালাহউদ্দিন আহমেদ ৬৪
সুলতান মাহমুদ ৬৫
হারুন আহমেদ চৌধুরী ৬৬
হালদার মো. আবদুল গাফফার ৬৭

বীর বিক্রম

অলি আহমদ ৭১
আনিস মোল্লা ৭২
আফসার আলী ৭৩
আবদুর রব চৌধুরী ৭৪
আবদুল আজিজ ৭৫
আবদুল করিম ৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল খালেক ৭৭
আবদুল জব্বার পাটোয়ারী ৭৮
আবদুল মান্নান ৭৯
আবদুল মান্নান ৮০
আবদুল হক ৮১
আবদুল হক ৮২
আবদুল হালিম ৮৩
আবদুস সাত্তার ৮৪
আবিদুর রহমান ৮৫
আবু বকর সিদ্দিকী ৮৬
আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ৮৭
আবুল কালাম আজাদ ৮৮
আবুল কাশেম হাওলাদার ৮৯
আমিন উল্লাহ শেখ ৯০
আমীন আহম্মেদ চৌধুরী ৯১
আলী আশরাফ ৯২
ইমাম-উজ-জামান ৯৩
এ আর আজম চৌধুরী ৯৪
এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান ৯৫
এ টি এম হামিদুল হোসেন ৯৬
এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী ৯৭
কাজী কামালউদ্দীন আহমেদ ৯৮
কামরুল হক ৯৯
খন্দকার মতিউর রহমান ১০০
খন্দকার রেজানুর হোসেন ১০১
গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ১০২
গোলাম মোস্তফা খান ১০৩
গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান ১০৪
জনাব আলী ১০৫
জাফর ইমাম ১০৬
জুম্মা মিয়া ১০৭
তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ১০৮
তৌহিদ আলী ১০৯
দেলোয়ার হোসেন ১১০
নূর আহমেদ গাজী ১১১
নূরুল হক ১১২
ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ১১৩
ফরিদউদ্দিন আহমেদ ১১৪
মইনুল হোসেন চৌধুরী ১১৫
মতিউর রহমান ১১৬
মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ১১৭
মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ১১৮
মেহেদী আলী ইমাম ১১৯
মো. আবদুল মান্নান ১২০
মো. আবদুল মালেক ১২১
মো. আবদুস শুকুর ১২২
মো. আবু বকর ১২৩
মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া ১২৪
মো. আশরাফ আলী খান ১২৫
মো. কামরুজ্জামান খলিফা ১২৬
মো. দৌলত হোসেন মোল্লা ১২৭
মো. নাজিম উদ্দীন ১২৮
মো. নিজামউদ্দীন ১২৯
মো. বদিউল আলম ১৩০
মো. মহিবুল্লাহ ১৩১
মো. মোহর আলী ১৩২
মো. সানা উল্লাহ ১৩৩
মোজাফফর আহমদ ১৩৪
মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী ১৩৫
মোহাম্মদ উল্লাহ ১৩৬
মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীন ১৩৭
রঙ্গু মিয়া ১৩৮
রফিকুল ইসলাম ১৩৯
লিলু মিয়া ১৪০
শওকত আলী সরকার ১৪১
শমসের মবিন চৌধুরী ১৪২
শাফী ইমাম রুমী ১৪৩
শামসুল হক ১৪৪
সকিম উদ্দিন ১৪৫
সৈয়দ মনসুর আলী ১৪৬
হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ ১৪৭
হেমায়েত উদ্দিন ১৪৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর প্রতীক

আজিজুর রহমান ১৫১
আতাহার আলী খান ১৫২
আনিসুর রহমান ১৫৩
আনোয়ার হোসেন ১৫৪
আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী ১৫৫
আবদুর রউফ শরীফ ১৫৬
আবদুর রশিদ ১৫৭
আবদুর রহমান ১৫৮
আবদুল আউয়াল সরকার ১৫৯
আবদুল আলিম ১৬০
আবদুল ওয়াজেদ ১৬১
আবদুল ওয়াহেদ ১৬২
আবদুল কাদের ১৬৩
আবদুল কুদ্দুস ১৬৪
আবদুল গফুর ১৬৫
আবদুল জব্বার ১৬৬
আবদুল জব্বার ১৬৭
আবদুল বাতেন ১৬৮
আবদুল বাতেন খান ১৬৯
আবদুল মজিদ মিয়া ১৭০
আবদুল মমিন ১৭১
আবদুল মান্নান ১৭২
আবদুল মালিক ১৭৩
আবদুল মালেক ১৭৪
আবদুল মালেক পাটোয়ারী ১৭৫
আবদুল মুকিত ১৭৬
আবদুল লতিফ ১৭৭
আবদুল লতিফ মজুমদার ১৭৮
আবদুল হাকিম ১৭৯
আবদুল হামিদ খান ১৮০
আবদুস সামাদ ১৮১
আবদুস সালাম ১৮২
আবু তাহের ১৮৩
আবু তাহের মো. সালাহউদ্দীন ১৮৪
আবু মুসলিম ১৮৫
আবুল বশার ১৮৬
আবুল হাশেম ১৮৭
আবুল হাশেম খান ১৮৮
আবুল হাসেম ১৮৯
আবুল হোসেন ১৯০
আমির হোসেন ১৯১
আমির হোসেন ১৯২
আলমগীর সাত্তার ১৯৩
আলিমুল ইসলাম ১৯৪
আলিমুল ইসলাম ১৯৫
আলী আকবর ১৯৬
আলী আকবর আকন ১৯৭
আলী আশরাফ ১৯৮
আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন ১৯৯
আশরাফুল হক ২০০
আসাদ আলী মোল্লা ২০১
আহমেদ হোসেন ২০২
আহমেদুর রহমান ২০৩
আহসান উল্লাহ ২০৪
ইবনে ফজল বদিউজ্জামান ২০৫
ইশতিয়াক হোসেন ২০৬
এ এম রাশেদ চৌধুরী ২০৭
এ এস এম এ খালেক ২০৮
এ কে এম আতিকুল ইসলাম ২০৯
এ কে মাহবুবুল আলম ২১০
এনামুল হক গাজী ২১১
এম সদর উদ্দিন ২১২
এম হামিদুল্লাহ খান ২১৩
এম হারুন-অর-রশিদ ২১৪
ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল ২১৫
কবির আহম্মদ ২১৬
করম আলী হাওলাদার ২১৭
কাজী আকমল আলী ২১৮
কাজী মোরশেদুল আলম ২১৯
কুদ্দুস মোল্লা ২২০
কে এম আবু বাকের ২২১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এম রফিকুল ইসলাম ২২২
খায়রুল বাশার খান ২২৩
গিয়াসউদ্দিন ২২৪
গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ ২২৫
গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া ২২৬
গোলাম দস্তগীর গাজী ২২৭
গোলাম মোস্তফা ২২৮
গোলাম হোসেন মোল্লা ২২৯
চাঁদ মিয়া ২৩০
জাকির হোসেন ২৩১
জামাল কবির ২৩২
জামিলউদ্দীন আহসান ২৩৩
জাহাঙ্গীর হোসেন ২৩৪
ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড ২৩৫
তাজুল ইসলাম ২৩৬
তাজুল ইসলাম ২৩৭
তারামন বিবি ২৩৮
তাহের আহমেদ ২৩৯
তোফায়েল আহমেদ ২৪০
দুদু মিয়া ২৪১
দেলোয়ার হোসেন ২৪২
দেলোয়ার হোসেন ২৪৩
নজরুল ইসলাম ২৪৪
নজরুল ইসলাম ২৪৫
নাসির উদ্দিন ২৪৬
নূরউদ্দীন আহমেদ ২৪৭
নূরুল হক ২৪৮
ফজলুল হক ২৪৯
ফজলুল হক ২৫০
ফারুক আহমদ পাটোয়ারী ২৫১
বজলু মিয়া ২৫২
বশির আহমেদ ২৫৩
বাচ্চু মিয়া ২৫৪
মঙ্গল মিয়া ২৫৫
মনসুর আলী ২৫৬
মনির আহমেদ খান ২৫৭
মনিরুল ইসলাম ২৫৮
মমতাজ উদ্দিন ২৫৯
মমতাজ হাসান ২৬০
মমিনুল হক ভূঁইয়া ২৬১
মাজহারুল হক ২৬২
মালু মিয়া ২৬৩
মাহফুজুর রহমান খান ২৬৪
মাহবুব-উল-আলম ২৬৫
মাহবুবুর রব সাদী ২৬৬
মিজানুর রহমান ২৬৭
মু শামসুল আলম ২৬৮
মুহাম্মদ আইনউদ্দিন ২৬৯
মো. আকবর হোসেন ২৭০
মো. আবদুল আজিজ ২৭১
মো. আবদুল কুদ্দুস ২৭২
মো. আবদুল মতিন ২৭৩
মো. আবদুল মমিন ২৭৪
মো. আবদুল হাকিম ২৭৫
মো. আবদুল্লাহ ২৭৬
মো. আবু তাহের ২৭৭
মো. আলতাফ হোসেন খান ২৭৮
মো. ইব্রাহিম খান ২৭৯
মো. এজাজুল হক খান ২৮০
মো. ওয়ালিউল ইসলাম ২৮১
মো. ওসমান গনি ২৮২
মো. খলিলুর রহমান ২৮৩
মো. গিয়াস উদ্দিন সমসের ২৮৪
মো. জাহাঙ্গীর ওসমান ভূঁইয়া ২৮৫
মো. তবারক উল্লাহ ২৮৬
মো. তৈয়ব আলী ২৮৭
মো. দেলাওয়ার হোসেন ২৮৮
মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া ২৮৯
মো. নাজিম উদ্দিন ২৯০
মো. নূরুল হক ২৯১
মো. নূরুল হক ২৯২
মো. বদরুজ্জামান মিয়া ২৯৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. বিলাল উদ্দিন ২৯৪
মো. মতিউর রহমান ২৯৫
মো. মোজাম্মেল হক ২৯৬
মো. রেজাউল হক ২৯৭
মো. লনি মিয়া দেওয়ান ২৯৮
মো. সদর উদ্দিন আহমেদ ২৯৯
মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার ৩০০
মোফাজ্জল হোসেন ৩০১
মোবারক হুসেন মিয়া ৩০২
মোশাররফ হোসেন ৩০৩
মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ৩০৪
মোহাম্মদ আবদুল মতিন ৩০৫
মোহাম্মদ আব্দুস সালাম ৩০৬
মোহাম্মদ ইব্রাহিম ৩০৭
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম ৩০৮
মোহাম্মদ শরীফ ৩০৯
মোহাম্মদ সিদ্দিক ৩১০
মোহাম্মদ হাফিজ ৩১১
মোহাম্মদ হোসেন ৩১২
মোহাম্মেদ দিদারুল আলম ৩১৩
রবিউল হক ৩১৪
শফিকুন নূর মাওলা ৩১৫
শফিকুর রহমান ৩১৬
শহিদুল হক ভূঁইয়া ৩১৭
শহীদ উল্লাহ ৩১৮
শাখাওয়াত হোসেন ৩১৯
শামসুদ্দীন আহমেদ ৩২০
শামসুল হক ৩২১
শাহ্জামান মজুমদার ৩২২
শেখ দিদার আলী ৩২৩
শেখ সোলায়মান ৩২৪
সাইদ আহমেদ ৩২৫
সাইদুর রহমান ৩২৬
সাইদুল আলম ৩২৭
সাইদুল হক ৩২৮
সাজ্জাদ আলী জহির ৩২৯
সামসুল আলম সিদ্দিকী ৩৩০
সিরাজুল ইসলাম ৩৩১
সিরাজুল হক ৩৩২
সিরাজুল হক ৩৩৩
সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ৩৩৪
সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ ৩৩৫
সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম ৩৩৬
সৈয়দ সদরুজ্জামান ৩৩৭
হাজারীলাল তরফদার ৩৩৮
হাবিবুল আলম ৩৩৯
হামিদুল হক ৩৪০
হারিছ মিয়া ৩৪১
হুমায়ুন কবীর চৌধুরী ৩৪২

পরিশিষ্ট

যাঁদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি বা চিহ্নিত করা যায়নি ৩৪৩
সংকেতের ব্যাখ্যা ৩৪৪
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৩৪৪
গ্রন্থপঞ্জি, পত্রিকা, পোস্টার ৩৪৫
কৃতজ্ঞতা ৩৪৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার ৪০ বছর (২০১১) উপলক্ষে *প্রথম আলো* খেতাব পাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। 'তোমাদের এ ঋণ শোধ হবে না' শিরোনামে প্রথম প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ২৭ মার্চ ২০১১-এ। প্রতিবেদন ছাপানো শেষ হয় ২ জানুয়ারি ২০১৩-তে। এ পর্যন্ত খেতাব পাওয়া ৬১২ জনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

২০১২ সালের এপ্রিলে ৩০০টি প্রতিবেদন নিয়ে *একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা* প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে প্রথমা প্রকাশন। এবার আরও ৩১৬টি প্রতিবেদন নিয়ে প্রকাশিত হলো এর দ্বিতীয় খণ্ড। খেতাব পাওয়া বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে আমরা তথ্য পাইনি বা তাঁদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারিনি। তাঁদের বিষয়ে তথ্য চেয়ে *প্রথম আলোয়* কয়েকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় মাত্র দুজনের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। যাঁদের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা যায়নি, তাঁদের এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিশিষ্টে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হলো। তথ্য পাওয়া গেলে পরবর্তী সংস্করণে তাঁদের বিষয়ে প্রতিবেদন যুক্ত হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের মোট ৬৭৬টি খেতাব দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরকার খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করে। ২০০৪ সালের ১১ মার্চ এ বিষয়ে আরেকটি গেজেট প্রকাশিত হয়। প্রথম গেজেটে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের শুধু নাম ও সৈনিক নম্বর বা মুক্তিযোদ্ধা নম্বর ছিল। কয়েকজন ছাড়া বাকিদের ঠিকানা বা অন্যান্য তথ্য ছিল না। এমনকি সৈনিক নম্বর বা মুক্তিযোদ্ধা নম্বরও ছিল না কয়েকজনের। দ্বিতীয় গেজেটে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার ঠিকানা ছিল। প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাঁদের ঠিকানা বা অন্য কোনো তথ্য ওই গেজেটেও নেই।

১৯৭৩ সালের গেজেটে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ ও গণবাহিনীর যোদ্ধাদের নাম আলাদাভাবে থাকলেও তাতে অনেক অসংগতি ছিল। সেনাবাহিনীর তালিকায় ইপিআর, ইপিআরের তালিকায় সেনাসদস্য এবং একইভাবে গণবাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধার নাম চলে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর তালিকায়।

কাজটি যখন শুরু করি, আমাদের মনে হয়েছিল, খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা তেমন কঠিন হবে না। সব জেলায় এবং অনেক উপজেলায় আছেন *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি। আশা করা গিয়েছিল, তাঁদের মাধ্যমে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। অনেক রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের এগোতে হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এরকম একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম আলোয় খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের শুরুর দিকে এমন একজন মুক্তিযোদ্ধার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশিত ও পরে *একাত্তরের বীরযোদ্ধার* প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যিনি আসলে খেতাব পাননি। এ মুক্তিযোদ্ধার নাম আবদুল আজিজ। *প্রথম আলোয়* খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা শুরু হলে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং জানান, তিনি বীর বিক্রম খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা। তখন তিনি অসুস্থ। স্থানীয় ও ঢাকার কয়েকটি পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে মানবিক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো তিনি আমাদের দেখান। সেসব প্রতিবেদনে তাঁকে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে আমরা বিভ্রান্ত হই এবং তাঁকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়। পরে আরেকজন মুক্তিযোদ্ধার খেতাব নিয়ে সংশয় দেখা দিলে প্রাপ্ত তথ্যগুলো আরও যাচাই-বাছাই করা হয়। তখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আবদুল আজিজ নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা খেতাব পেয়েছিলেন বটে, তবে তিনি পূর্বোক্ত আবদুল আজিজ নন। পরে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আজিজকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি এই খণ্ডে সংকলিত হলো। তাঁর গেজেট (১৯৭৩) নম্বর ৭০। উল্লেখ্য, ভুলবশত যে আবদুল আজিজকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন।

বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত খেতাব পাওয়া চারজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিবেদন *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়নি। তাঁদের মধ্যে শরীফুল হক বীর উত্তম, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী বীর বিক্রম এবং এ এম রাশেদ চৌধুরী বীর প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ও বর্তমানে পলাতক। কুদ্দুস মোল্লা বীর প্রতীকের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে এ সংকলন প্রকাশের ঠিক আগে।

খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তাঁদের নানা ভূমিকার কারণে বিতর্কিত ও সমালোচিত হন। খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ রকম দু-একজনের বিষয়ে *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন প্রকাশের পর অনেক পাঠক এ ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। আমরা সবিনয়ে জানাতে চাই, এ প্রতিবেদনের বিষয় মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁদের ভূমিকা বা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কঠিন শ্রম স্বীকার করে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহের কাজটি করেছেন *প্রথম আলোর* কর্মী বন্ধু রাশেদুর রহমান। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী বরাবরের মতো চমৎকার একটি প্রচ্ছদ এঁকেছেন। বইটির ভেতরের অঙ্গসজ্জা শিল্পী অশোক কর্মকারের। প্রথমা প্রকাশনের কর্মীরা এই বইয়ের কাজ করেছেন আগ্রহের সঙ্গে। এঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।

একাত্তরের বীরযোদ্ধা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারেও সহযোগিতার জন্য এইচএসবিসি (দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড) কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

মতিউর রহমান
১২ মার্চ ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা
(প্রথম খণ্ড)

বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, অগণিত শহীদের রক্ত এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ শুরু হওয়ার পরপরই এ দেশের সব শ্রেণী-পেশার মানুষ মিলিত হয়েছিলাম মুক্তির অভিন্ন মোহনায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে মাত্র নয় মাসের মধ্যে আমরা দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পালন করেছিলেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা। কিন্তু স্বাধীনতার পর তাঁদের সেই দেশপ্রেম, সাহস ও বীরত্বের কথা আমরা যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারিনি। এই বীরদের মুখে বা কাগজে-কলমে স্বীকৃতি দিলেও তাঁদের কথা আমরা মনে রাখিনি। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্ম জানতেই পারেনি তাঁরা কত বড় বীর! দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই উজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস তুলে ধরা ছিল একটা জাতীয় কর্তব্য।

বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগণিত সাধারণ মানুষের অসাধারণ যোদ্ধায় পরিণত হওয়ার রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ও পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই দেশের ডাকে শত্রুর বিরুদ্ধে হাতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। ১৯৭১ সালে তাঁরা সুশৃঙ্খল ও অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, তা অবিশ্বাস্য। অনেক ঘটনা গল্প-কাহিনির চেয়েও রোমাঞ্চকর।

যুদ্ধে বীরত্বের জন্য পৃথিবীতে খেতাব দেওয়ার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মানবসভ্যতার প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই বীরদের সম্মান জানানো হয়ে আসছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা ও সেনাধ্যক্ষদের সাহস ও বীরত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার রাষ্ট্রীয় রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতা ইতিহাসের আধুনিক কালপর্বে জন্ম নেওয়া দেশগুলোতে একটা বহুল প্রচলিত রীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, বিশেষত মিত্রবাহিনীর সাধারণ সেনাসদস্য থেকে শুরু করে সেনাধ্যক্ষদের বীরত্বের জন্য প্রচুর খেতাব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। মোট খেতাব দেওয়া হয় ৬৭৬টি। এই খেতাব ছিল চার স্তরের—বীরশ্রেষ্ঠ ৭, বীর উত্তম ৬৮, বীর বিক্রম ১৭৫ ও বীর প্রতীক ৪২৬। কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো মুক্তিযোদ্ধা একই সঙ্গে দুটি খেতাব পেয়েছেন।

খেতাব পাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগই ১৯৯২ সালের আগ পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম ও তাঁদের বীরত্বের কথা জানতেন দেশের মানুষ। অন্যদের নাম ও বীরত্বের কথা তাঁরা জানতেন না। ১৯৭৩ সালে গেজেটের মাধ্যমে তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তাতে খেতাব পাওয়া বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধার ঠিকানা ছিল না। উল্লেখ ছিল না অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্যের। ১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরকার প্রথম খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদান করে। তথ্যের অভাবে এ অনুষ্ঠানে সব মুক্তিযোদ্ধাকে আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁদের পদক ও সনদও দেওয়া যায়নি। এঁদের মধ্যে কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে সরকার পদক ও সনদ প্রদান করে। কিন্তু কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা তাঁদের পরিবারের হাতে আজ পর্যন্ত পদক ও সনদ দেওয়া সম্ভব হয়নি সঠিক তথ্যের অভাবে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা জানতেই পারেননি যে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য তাঁরা খেতাব পেয়েছেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার পরিবারও তাঁদের স্বজনের খেতাব পাওয়ার বিষয়ে জানতে পারেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গোটা জাতির পরম অর্জন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন বহুমাত্রিক ও ব্যাপক পরিসরে গবেষণা। সে প্রচেষ্টারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস *প্রথম আলোর* বছরব্যাপী প্রতিদিনের এই প্রতিবেদন। সেই উদ্যোগের পরিণতি *একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা* প্রথম খণ্ড। এ বই পাঠকদের মধ্যে সঞ্চার করবে ইতিহাসের সেই উত্তাল দিনগুলোর হৃৎস্পন্দন।

১৯৭৩ সালে খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও বিষয়টি খুব প্রচার পায়নি। ১৯৯২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদানের পর এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ জানতে শুরু করে। দুঃখের বিষয়, খেতাব পাওয়া কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে এখনো প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আমাদের অজানা রয়ে গেছে। আমরা *প্রথম আলোতে* ৩০০ জন খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিছু নতুন তথ্যও যোগ করা গেছে। আবার অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি, পরের সংস্করণে আমরা আরও কিছু তথ্য যোগ করতে পারব; কিছু ত্রুটিও সংশোধন করার সুযোগ পাব। এ বইয়ের কোনো ভুল তথ্যের ব্যাপারে কোনো পাঠক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা উপকৃত হব।

স্বাধীনতার ৪০ বছর উপলক্ষে *প্রথম আলো* কী করতে পারে, কী করবে—এ রকম এক আলোচনায় *প্রথম আলোর* উপসম্পাদক আনিসুল হক এ কাজটি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ২০১১ সালের ২৭ মার্চ *প্রথম আলো* প্রকাশ করতে শুরু করে ধারাবাহিক প্রতিবেদন। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, এ কাজ তেমন কঠিন হবে না। আমাদের এ ধারণা ছিল ভুল। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি সংগ্রহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। ৪০ বছরে অনেক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। অনেক খেতাবধারীকে খুঁজেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যাচ্ছে না। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্বীকৃতির অপেক্ষা না করেই তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন।

আমরা এই সুকঠিন কাজটির দায়িত্ব দিই *প্রথম আলোর* কর্মী বন্ধু রাশেদুর রহমানকে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। এ কাজটি তাঁর গভীর আগ্রহ ও কঠিন পরিশ্রমের ফসল।

এই দুরূহ কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধিদের সহযোগিতার ফলে। তাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। তাঁদের সহযোগিতা ও পাঠানো প্রতিবেদন ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব হতো না।

মুক্তিযুদ্ধ যেমন শোক ও বেদনার, তেমনি বীরত্ব ও গৌরবের। এই ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। খেতাবধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বকাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এসব ব্যক্তিগত আখ্যান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। এর মাধ্যমে আমরা কেবল যুদ্ধের ঘটনাক্রমই জানতে পারব না, ইতিহাসের চমকপ্রদ নানা উপাদানও পাব।

মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে *প্রথম আলোর* সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রথমা প্রকাশনের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আমরা বিভিন্নজনের ১১টি গবেষণাধর্মী বই প্রকাশসহ নানা আয়োজন সম্পন্ন করেছি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে *প্রথম আলো* নিরন্তর কাজ করে যেতে চায়।

এই সংকলনের প্রথম খণ্ডে কোনো বীরশ্রেষ্ঠ অন্তর্ভুক্ত হননি। *প্রথম আলোর* এই উদ্যোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, তাঁদের যুদ্ধগাথা আগে প্রকাশ করা। এ কারণে *প্রথম আলোয়* সাত বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার কারও বীরত্বের কাহিনি এখনো ছাপা হয়নি। পাঠক লক্ষ করবেন, খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা খুবই পরিচিত, তাঁদের কথা কমই ছাপা হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ এবং খেতাব পাওয়া বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনি ছাপা হবে এই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে।

এই খণ্ডে থাকছে ২৯ জন বীর উত্তম, ৮৫ জন বীর বিক্রম ও ১৮৬ জন বীর প্রতীকের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ। এসব বীরত্বগাথা সাজানো হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের বর্ণানুক্রমে।

বইটির কাজের শুরু থেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, উপসম্পাদক আনিসুল হক, সহকারী সম্পাদক অরুণ বসু, গবেষণা ও আর্কাইভ-উপদেষ্টা মুহাম্মদ লুৎফুল হক, প্রথমা প্রকাশনের প্রধান নির্বাহী জাফর আহমদ রাশেদ, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক আখতার হুসেন প্রমুখ। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী চমৎকার একটি প্রচ্ছদ এঁকেছেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটির ভেতরের অঙ্গসজ্জা শিল্পী অশোক কর্মকারের। যাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের নাম এবং যেসব বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে, সেসব বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে বইয়ের শেষে।

আগেই বলেছি, তথ্যের দিক থেকে এ বইয়ে কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অনেকের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের বিবরণের শুরুতে ছবি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু সবার ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধার ছবি নেই। যাঁদের ছবি নেই, তাঁদের ছবির জায়গায় ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর আঁকা 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' পোস্টারটির আংশিক ব্যবহৃত হয়েছে। শুরুতে যেসব তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এর মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে।

এ সংকলনের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য এইচএসবিসি (দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড) কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

মতিউর রহমান
৮ এপ্রিল ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরশ্রেষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ

গ্রাম মহিষখোলা, সদর উপজেলা, নড়াইল।
বাবা মো. আমানত শেখ, মা জিন্নাতুন নেছা খানম।
স্ত্রী তোতা বেগম ও ফজিলাতুন নেছা। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭।

আকস্মিক গোলাগুলির মুখে সতর্ক হয়ে ওঠেন মুক্তিযোদ্ধারা। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন মাত্র চারজন—নূর মোহাম্মদ শেখ, মোস্তফা কামাল (বীর প্রতীক), নান্নু মিয়া (বীর প্রতীক) ও আরেকজন। শত শত গুলি ধেয়ে আসতে থাকে তাঁদের দিকে। তাঁরা বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আক্রমণ করেছে। সাহসের সঙ্গে তাঁরা চারজন আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। এ ঘটনা গোয়ালহাটিতে। ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। গোয়ালহাটি যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার অন্তর্গত। সীমান্তবর্তী এলাকা।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য সুতিপুর প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী এলাকা গোয়ালহাটিতে নিয়োজিত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল পার্টি। এই প্যাট্রোল পার্টির অধিনায়ক ছিলেন নূর মোহাম্মদ শেখ।

AMARBOI.COM

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৫ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের এই স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোলের অবস্থান কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়। খবর পাওয়া মাত্র তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তিন দিক থেকে ছোট ওই প্যাট্রোল পার্টির ওপর আক্রমণ চালায়। জরুরি অবস্থা বুঝতে পেরে নূর মোহাম্মদ শেখ সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন।

কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা ছিল অনেক ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারেন, তাঁরা বেশিক্ষণ পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন না। মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁরা পেছনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। এ সময় নান্নু মিয়া গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আহত নান্নু মিয়াকে কাঁধে নিয়ে নূর মোহাম্মদ শেখ গুলি করতে করতে পেছনে সরে আসছিলেন। তখন হঠাৎ দুই ইঞ্চি মর্টারের গোলার আঘাতে তাঁর ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

বিপর্যয়কর এই অবস্থায় নূর মোহাম্মদ শেখ দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সহযোদ্ধা মোস্তফা কামালকে নির্দেশ দেন, আহত নান্নু মিয়াকে কাঁধে করে নিয়ে পেছনে সরে যেতে। আর তাঁদের পশ্চাদপসরণের সহযোগিতার জন্য কাভারিং ফায়ার দেওয়ার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। মোস্তফা কামাল তাঁকে ফেলে কোনোভাবে পিছু হটতে রাজি ছিলেন না। নূর মোহাম্মদ শেখ জোর করে তাঁদের পেছনে পাঠান। এরপর মর্টার শেলের আঘাতে যন্ত্রণায় কাতর নূর মোহাম্মদ একাই লড়াই করতে করতে শহীদ হন।

নূর মোহাম্মদ শেখ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর উইংয়ের অধীনে। তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ

পৈতৃক বাড়ি নরসিংদী জেলায়। বাবা আবদুস সামাদ, মা মোবারকুন্নেছা। স্ত্রী মিলি রহমান। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৬। শহীদ ২০ আগস্ট ১৯৭১।

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ছিলেন মতিউর রহমান। তাঁর কর্মস্থল ছিল পাকিস্তানের করাচির মশরুর বিমানঘাঁটিতে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে ছুটি নিয়ে ঢাকায় আসেন। ১ মার্চ তাঁর ছুটি শেষ হলেও তিনি পাকিস্তানে যাননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে যান। ৬ মে তিনি করাচি ফিরে যান।

করাচিতে যাওয়ার কিছুদিন পর মতিউর মনে মনে পরিকল্পনা করতে থাকেন কীভাবে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর একটি বিমান ছিনতাই করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া যায়। তাঁর এ পরিকল্পনার কথা তিনি কাউকে বলেননি। এমনকি নিজের স্ত্রীকেও বুঝতে দেননি। স্ত্রীও তাঁর হাবভাব থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। এর পর থেকেই তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

দেশে আসার আগে মতিউর রহমান পাকিস্তানি শিক্ষানবিশ পাইলট রাশেদ মিনহাজকে বিমান উড্ডয়ন শিক্ষা দিতেন। গ্রাউন্ডেড হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন মিনহাজ যখন প্লেন নিয়ে উড়তে যাবেন, তখন তিনি ওই প্লেনে চড়ে সেটি ছিনতাই করবেন। বিমান ঘাঁটির কাছাকাছি সীমান্তের ওপারে আছে ভারতের এক বিমানঘাঁটি। বিমান ছিনতাই করতে পারলে তিনি সেখানে যাবেন।

মতিউর রহমান তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তারিখ নির্ধারণ করেন ২০ আগস্ট, শুক্রবার। সেদিন বেলা ১১টায় মিনহাজের একাই টি ৩৩ বিমান নিয়ে ওড়ার শিডিউল ছিল। আর কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে এ বিমানের যোগাযোগের সাংকেতিক নাম ছিল 'ব্লুবার্ড'। সেদিন নির্ধারিত সময় মিনহাজ বিমান নিয়ে ৪ নম্বর ট্যাক্সি-ট্র্যাক দিয়ে রানওয়েতে ঢোকার জন্য এগিয়ে আসতে থাকেন। এ সময় মতিউরও নিজের গাড়ি চালিয়ে ওই ট্যাক্সি-ট্রাকে রওনা দেন। বিমানটি সেখানে একটি টিলার আড়ালে পৌঁছামাত্র তিনি বিমান থামানোর সংকেত দেন।

তাঁর সংকেতে মিনহাজ বিমান থামান। কারণ, কন্ট্রোল টাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার পরও ফ্লাইট সেফটি অফিসার কোনো বৈমানিককে বিমান থামানোর সংকেত দিলে তিনি বিমান থামাতে বাধ্য থাকেন। মতিউর সেফটি অফিসারের এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ফলে মিনহাজ বিমান থামাতে বাধ্য হন এবং ক্যানোপি (জঙ্গি বিমানের বৈমানিকদের বসার স্থানের ওপরের স্বচ্ছ আবরণ) খুলে কারণ জানতে চান।

মতিউর এ সুযোগে দ্রুতগতিতে বিমানের ককপিটে উঠে পড়েন। এর একটু আগে একটি যুদ্ধবিমান অবতরণ করায় তখন রানওয়ে খালিই ছিল। হকচকিত মিনহাজ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি বিমানটি রানওয়েতে নিয়ে আকাশে ওড়ান। কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানটি দিগন্তে মিলিয়ে যায়। তবে মতিউর বিমানটির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিতে পারেননি। আকাশে ওড়ার পর দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলা অবস্থায় সেটি বিধ্বস্ত হয় এবং তাঁরা দুজনই নিহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ

গ্রাম রহিমগঞ্জ, উপজেলা বাবুগঞ্জ, বরিশাল। বাবা আবদুল মোতালেব হাওলাদার, মা মোছা. সুফিয়া খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ০১। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তাঁর দলের সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাতেই মহানন্দা অতিক্রম করে অবস্থান নেন রেহাইচরে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাকি দুই দলের একটি বালিয়াডাঙ্গায় নদী অতিক্রম করে অবস্থান নেয়। অপর দল কালীনগর ঘাট দিয়ে নদী অতিক্রম করে আক্রমণ চালায়।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সহযোদ্ধাদের নিয়ে যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন, তার অদূরেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখানে আক্রমণ চালান। তবে তাঁর সহযোদ্ধারা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। পাকিস্তানি সেনারা নিজ নিজ প্রতিরক্ষায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে কোনো ব্রেক-থ্রু না হওয়ায় মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কিছুটা মরিয়া ও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি নিজেই ক্রল করে একটি বাংকারের দিকে এগিয়ে যান। ওই বাংকারে ছিল পাকিস্তানিদের এলএমজি পোস্ট। তাঁর লক্ষ্য ছিল গ্রেনেড ছুড়ে ওই বাংকার ধ্বংস করা।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ওই বাংকারের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিন্তু গ্রেনেড ছোড়ার মুহূর্তে কাছাকাছি আরেক বাংকারে থাকা পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে দেখে ফেলে। তারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। একটি গুলি এসে তাঁর কপালে লাগে। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন তিনি।

তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার পর আত্মপ্রত্যয়ী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের সাঁড়াশি আক্রমণ চালান এবং তুমুল যুদ্ধের পর সেদিনই চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের মরদেহ উদ্ধার করে সোনামসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধি চিহ্নিত।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তানের (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) কারাকোরামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনিসহ চারজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে ভারতে যান। পরে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে ৭ নম্বর সেক্টরের মেহেদীপুর সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর আওতাধীন এলাকা ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, কলাবাড়ী, সোবরা, কানসাট ও বারঘরিয়া এলাকা। মেহেদীপুর সাবসেক্টর এলাকায় পাকিস্তানিদের কাছে তিনি মূর্তিমান এক আতঙ্ক ছিলেন।

১৪ নভেম্বর সোনামসজিদ মুক্ত হয়। সেদিন ভোরে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সহযোদ্ধাদের নিয়ে সোনামসজিদে আক্রমণ করেন। পাকিস্তানিরা এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আকস্মিক আক্রমণে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হকচকিত অবস্থা কাটিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। জাহাঙ্গীর সহযোদ্ধাদের নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের পরাস্ত করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ১১ জন নিহত ও পাঁচজন বন্দী হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুন্সী আব্দুর রউফ, বীরশ্রেষ্ঠ

গ্রাম ছালামতপুর, উপজেলা মধুখালী (সাবেক বোয়ালমারী), ফরিদপুর। বাবা মুন্সী মেহেদি হোসেন, মা মুকিদুননেছা। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ০২। শহীদ ১৮ এপ্রিল ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রতিরোধযুদ্ধকালে মুন্সী আব্দুর রউফসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছিলেন বুড়িঘাটে। রাঙামাটি জেলার নান্নেরচরের অন্তর্গত বুড়িঘাট। রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়ক বুড়িঘাট হয়ে চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত। কালুরঘাট থেকে রামগড়ে যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল বুড়িঘাট দিয়ে। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ তখন ছিল না। কালুরঘাটের পতন হলে পাকিস্তানিরা বুড়িঘাট ও রামগড় দখলের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী কমান্ডো ব্যাটালিয়নের একটি দল বুড়িঘাটে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করে। সাতটি স্পিডবোট ও দুটি লঞ্চযোগে তারা সেখানে আসে। সংখ্যায় ছিল দুই কোম্পানির মতো। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ভারী অস্ত্রের মধ্যে ছিল ছয়টি তিন ইঞ্চি মর্টার ও অসংখ্য মেশিনগান।

পাকিস্তানিদের তুলনায় মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কম ছিলেন। তার পরও তাঁরা অসীম মনোবল ও দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শত শত তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা আর মেশিনগানের হাজার হাজার গুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতির সুযোগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দল তীরে নেমে মুক্তিযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। পাকিস্তানিদের অব্যাহত গোলাগুলির মুখে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সেখানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা সবাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়েন। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন কাভারিং ফায়ার। অসীম সাহসী মুন্সী আব্দুর রউফ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেন। দলনেতা খালেকুজ্জামানকে তিনি বলেন, 'স্যার, আপনি সবাইকে নিয়ে পশ্চাদপসরণ করুন। আমি পাকিস্তানিদের মোকাবিলা করছি।'

এরপর মুন্সী আব্দুর রউফ একাই পাকিস্তানিদের মোকাবিলা করতে থাকেন। এই সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধারা নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করেন। রউফের অস্ত্রের নিখুঁত গুলিবর্ষণে পাকিস্তানিদের কয়েকটি স্পিডবোট ডুবে যায়। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

আকস্মিক ক্ষতিতে পাকিস্তানিদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা নিরাপদ দূরত্বে পিছু হটে যায়। পেছনে পাকিস্তানি বাহিনী পুনর্গঠিত হয়ে মুন্সী আব্দুর রউফের অবস্থান লক্ষ্য করে আবারও মর্টারের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। একটা গোলা সরাসরি রউফের দেহে আঘাত করে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর দেহ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মাংসপিণ্ড। পরে সহযোদ্ধারা রউফের দেহের খণ্ডিত অংশ সংগ্রহ ও একত্র করেন। সেখানে একটি টিলার ওপর তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মুন্সী আব্দুর রউফ ইপিআর বাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম সেক্টরের অধীন ১১ নম্বর উইংয়ে কর্মরত ছিলেন। মাঝারি মেশিনগান ডিটাচমেন্টের ১ নম্বর মেশিনগানচালক ছিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. রুহুল আমিন, বীরশ্রেষ্ঠ

গ্রাম বাঘচাপড়া, উপজেলা বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
বাবা মো. আজহার মিয়া পাটোয়ারী, মা জোলেখা খাতুন।
স্ত্রী জাকিয়া বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ০৫। শহীদ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিবাহিনীর পলাশ গানবোটের ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার ছিলেন মো. রুহুল আমিন। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা ৭ ডিসেম্বর ভারত থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বাংলাদেশ অভিমুখে। দুই গানবোটে তাঁরা ছিলেন ৫৬ জন।

১০ ডিসেম্বর সকাল নয়টায় মংলা থেকে শুরু হয় চূড়ান্ত অভিযান। ১১টার দিকে গানবোটগুলো শিপইয়ার্ডের কাছে পৌঁছায়।

এ সময় আকাশে দেখা যায় তিনটি জঙ্গি বিমান। শত্রুবিমান মনে করে মো. রুহুল আমিন সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দেন বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে বিমান প্রতিরোধের। তাঁর সহযোদ্ধারা দ্রুত প্রস্তুত হন। কিন্তু তাদের বহরে থাকা ভারতীয় গানবোট প্যানভেল থেকে জানানো হয় ওগুলো ভারতীয় বিমান।

বিমানগুলো কিছুটা নিচে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরের দিকে যায়। ১০-১১ মিনিট পর হঠাৎ ঘুরে এসে বোমা বর্ষণ করে পদ্মার ওপর। পরক্ষণেই পলাশে।

বোমার আঘাতে মুক্তিবাহিনীর গানবোটে আগুন ধরে যায়। বিপদ বুঝে যাঁরা আগেই পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তাঁরা অক্ষত থাকেন। কিন্তু রুহুল আমিনসহ অনেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গানবোটেই ছিলেন। প্রথম আঘাতেই বোমার স্প্লিন্টার লেগে তাঁর বাঁ হাত ভেঙে যায়। তিনি মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এক সহযোদ্ধা (তাঁর নামও রুহুল আমিন) তাঁকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেন।

আহত রুহুল আমিন আপ্রাণ চেষ্টায় সাঁতার কেটে নদীর পুবপাড়ে পৌঁছান। সেখানে অপেক্ষা করছিল আরেক বিপদ। নদীর পুব তীরে ছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও অনেক রাজাকার। রাজাকাররা তাঁকে আটকের পর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। নদীতীরে পড়ে থাকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মরদেহ। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে নদীতীরের এক স্থানে সমাহিত করেন। তাঁর সমাধি চিহ্নিত ও সংরক্ষিত।

মো. রুহুল আমিন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কয়েক দিন পর মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি মুক্তিবাহিনীর নৌদলে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ

গ্রাম পশ্চিম হাজীপাড়া, উপজেলা দৌলতখান, ভোলা। বাবা হাবিবুর রহমান, মা মালেকা বেগম। স্ত্রী পেয়ারা বেগম। তাঁদের এক সন্তান।
খেতাবের সনদ নম্বর ০৪। শহীদ ১৮ এপ্রিল ১৯৭১।

মোস্তফা কামাল চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ২৭ মার্চ বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ করে আখাউড়ায় (গঙ্গাসাগর ও তাল শহর) প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

তাঁদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে যাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আকস্মিক আক্রমণ না করতে পারে, সে জন্য একাংশকে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানে পাঠানো হয়। এ দলে ছিলেন অসমসাহসী মোস্তফা কামাল। তাঁরা অবস্থান নেন দরুইন গ্রামে। তাঁদের প্রতিরক্ষা ছিল এক পুকুরপাড়ে। কামালের অবস্থান ছিল সর্বডানে। তাঁর কাছে ছিল এলএমজি।

১৬ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট দল আখাউড়ায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের জন্য কুমিল্লা-আখাউড়া রেলপথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। মোস্তফা কামাল ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। পরের দিন (১৭ এপ্রিল) সকালে তাঁদের সব উৎকণ্ঠা আর অপেক্ষার অবসান ঘটে। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ। ক্রমশ তা তীব্রতর হয়। এ সময় বৃষ্টিও শুরু হয়।

১৮ এপ্রিল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বর্ষণমুখর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা দরুইন গ্রামের খুব কাছে পৌঁছে যায়। এর আগে পাকিস্তানি সেনাদের অপর একটি দল অন্য দিক আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভ্রান্ত করে। মোগড়াবাজার ও গঙ্গাসাগরে আক্রমণের মহড়া প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রকৃত আক্রমণ শুরু হয় দুপুর ১২টায়, পশ্চিম দিক দিয়ে।

একদিকে তুমুল বৃষ্টি, অন্যদিকে শাণিত অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। মোস্তফা কামালসহ অল্পসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েন। তাঁদের পক্ষে অবস্থান ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের দুই দিক ঘেরাও করে ফেলেছিল। ফলে তাঁরা সবাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়েন।

এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ অথবা নিশ্চিত জীবন দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন নিখুঁত কাভারিং ফায়ার। স্বেচ্ছায় ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজের দায়িত্ব নেন মোস্তফা কামাল। এরপর তিনি তাঁর এলএমজি দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গুলি শুরু করেন। এ সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধারা পেছনে নিরাপদ স্থানে যান।

কামালের ক্রমাগত গুলিবর্ষণে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। তাদের এগিয়ে আসার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে। মরিয়া পাকিস্তানিরা তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করে সেখানে মেশিনগান দিয়ে গুলি এবং মর্টারের গোলা ছুড়তে থাকে। একপর্যায়ে তারা সফল হয়। তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয় মেশিনগানের গুলি। গুরুতর আহত হন তিনি।

পাকিস্তানি সেনারা তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে। পরে স্থানীয় গ্রামবাসী তাঁর মরদেহ সেখানেই সমাহিত করেন। তাঁর সমাধি চিহ্নিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ

গ্রাম খদ্দখালিশপুর, উপজেলা কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।
বাবা আক্কাস আলী মণ্ডল, মা কায়েদুননেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ০৩।
শহীদ ২৮ অক্টোবর ১৯৭১।

রাতে হামিদুর রহমানসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেতরে আসেন। সমবেত হন এফইউপিতে। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি দলে (কোম্পানি) বিভক্ত। ৬০০ গজ দূরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ।

আনুমানিক বিকেল সাড়ে তিনটা। তারিখ ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সবার আগে চার্লি কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য এগিয়ে যান। দুই উপদলের (প্লাটুন) একটি বাঁ দিক দিয়ে এবং অপরটি ডান দিক দিয়ে। মাঝে থাকে ডেফথ প্লাটুন। এ প্লাটুনে ছিলেন হামিদুর রহমান।

কিন্তু অ্যাসল্ট ফরমেশনে (আক্রমণ শুরু) যাওয়ার আগেই তাঁরা আক্রান্ত হন। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গোলাগুলি শুরু করে। এর ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে ডান-বাঁ, দুই প্লাটুনেরই অগ্রযাত্রা থমকে যায়।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার অ্যান্ড মুভ পদ্ধতিতে সামনে এগোতে থাকেন। বাঁ দিকের মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর অবস্থানের একদম কাছে পৌঁছান। এ সময় তাঁদের দলনেতা ও প্লাটুন হাবিলদার পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে আহত হন।

ডান দিকের মুক্তিযোদ্ধারাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। উঁচু টিলার ওপর থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এইচএমজির প্রায় নিখুঁত গুলিবর্ষণের কারণে তাঁরা এগোতে পারেননি। ওই এইচএমজি পোস্ট ধ্বংসের চেষ্টা করেন তাঁরা, কিন্তু পারেননি। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ওই এইচএমজির গুলিতে হতাহত হন।

এ অবস্থায় ডেফথ প্লাটুন এগিয়ে আসে। প্লাটুনের সুইসাইডাল গ্রুপের ওপর দায়িত্ব পড়ে ওই এইচএমজি পোস্ট ধ্বংস বা নিউট্রালাইজ করার। এ গ্রুপে ছিলেন অসমসাহসী হামিদুর রহমান। তিনি সুইসাইডাল গ্রুপের দুটি এলএমজির কাভারিং ফায়ারের ছত্রচ্ছায়ায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাকিস্তানি এইচএমজি পোস্টের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

ক্রল করে ১০ গজের মধ্যে পৌঁছে তিনি সেখানে হ্যান্ডগ্রেনেড ছোড়েন। তাঁর নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড নিখুঁত নিশানায় পড়ে। এইচএমজি থেকে গুলি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি ওই বাংকারে চড়াও হন। এমন সময় পাশের আরেকটি বাংকারে থাকা পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তাঁর দিকে ছুটে আসে একঝাঁক গুলি। এই গুলির ঝাঁক থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর শরীর প্রায় ঝাঁজরা হয়ে যায়। নিথর ও ঝাঁজরা দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ ঘটনা মৌলভীবাজার জেলার ধলই বিওপিতে। মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন হামিদুর রহমানের মরদেহ উদ্ধার করতে পারেননি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ২ নভেম্বর তাঁরা আবার সেখানে আক্রমণ চালান। ৩ নভেম্বর ধলই মুক্ত হয়। তখন তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করা হয়। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর তাঁর দেহাবশেষ ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনঃসমাহিত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর উত্তম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকরাম আহমেদ, বীর উত্তম

গ্রাম গাছঘাট, উপজেলা দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৩, অ্যাপার্টমেন্ট ৫, বীর উত্তম আকরাম আহমেদ সড়ক [পুরাতন সড়ক ৩৬] গুলশান, ঢাকা। বাবা মেজবাউদ্দীন আহমেদ, মা মাফিয়া খাতুন। স্ত্রী লায়লা আহমেদ। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৫।

সন্ধ্যার পর রাতের আঁধারে ভারতের এক বিমানঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হলো ছোট এক বিমান। বিমান চালাচ্ছেন আকরাম আহমেদ। তাঁর সঙ্গে আছেন শামসুল আলম (বীর উত্তম)। সীমান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকলেন চট্টগ্রামের দিকে। তাঁদের লক্ষ্য, চট্টগ্রামের তেলের ডিপো। প্রায় তিন ঘণ্টা উড্ডয়নের পর পৌঁছালেন সেখানে। বিমান থেকে একের পর এক রকেট আঘাত হানতে থাকল ডিপোতে। সফলতার সঙ্গে ধ্বংস করে দিলেন তেলের ডিপো। তারপর নিরাপদে ফিরে গেলেন নিজেদের বিমানঘাঁটিতে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর মধ্যরাতের। তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ৩ ডিসেম্বর।

এক নম্বর লক্ষ্যস্থলে নির্ভুল আঘাত হানার পরও বিমানে পর্যাপ্ত রকেট মজুদ ছিল। আকরাম আহমেদ এ সময় সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, অক্ষত তেলের ট্যাংকারে আবার আক্রমণ চালাবেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বিমানটি ঘুরিয়ে তেলের ডিপোতে অবশিষ্ট রকেট নিক্ষেপ করেন। দ্বিতীয়বারের আক্রমণও ছিল নিখুঁত ও নির্ভুল। চারদিকে বিভিন্ন তেলের ডিপোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে।

AMARBOI.COM

সফল আক্রমণ শেষে তিনি আবার ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করেন। চট্টগ্রামে আসার পথটা আগে থেকে সুনির্দিষ্ট থাকলেও ফেরার পথটা ছিল অনির্ধারিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। একমাত্র কাঁটাকম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়ের আর কোনো আধুনিক সরঞ্জাম ওই বিমানে ছিল না।

আকরাম আহমেদ ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান উদ্ভিদ রক্ষা (প্ল্যান্ট প্রটেকশন) বিভাগে। তখন উদ্ভিদ রক্ষা বিভাগের নিজস্ব বিমান ছিল, যার সাহায্যে তাঁরা আকাশ থেকে ওষুধ ছিটিয়ে পোকার আক্রমণ থেকে বন রক্ষা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসে ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে যান। সেখানে মেজর খালেদ মোশাররফের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) সঙ্গে দেখা করে স্থলযুদ্ধে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। খালেদ মোশাররফ তাঁকে কিছুদিন আগরতলায়ই অপেক্ষা করতে বলেন। কয়েক মাস পর গঠিত হয় মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং। তখন তাতে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আকরাম আহমদ চট্টগ্রামের অপারেশনের পর সিলেটের আশপাশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১২টির মতো আক্রমণে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার হোসেন, বীর উত্তম

গ্রাম গোপীনাথপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবদুল হামিদ ভূঁইয়া, মা কুলসুমের নেছা।
স্ত্রী ছায়েদা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৮। শহীদ জুলাই ১৯৭১।

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত বুড়িমারীর অবস্থান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

মুক্তিযুদ্ধকালে এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে বা আধিপত্য বিস্তারের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রায়ই সেখানে আক্রমণ করত। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ জুলাই (মতান্তরে ১০ জুলাই) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে আকস্মিক আক্রমণ করে।

সেদিন বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ যুদ্ধে অংশ নেয়। একপর্যায়ে তারা ব্যাপকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চড়াও হয়। প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তাঁদের দখলে থাকা বাংলাদেশ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

আনোয়ার হোসেন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা দলের এলএমজিম্যান। প্রচণ্ড সাহস ও অদম্য মনোবল ছিল তাঁর। বিপর্যয়কর ওই মুহূর্তে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে এলএমজিসহ ক্রল করে তিনি একাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁর ব্রাশফায়ারে হতাহত হয় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা।

এরপর আনোয়ার হোসেন আরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই একঝাঁক গুলি ছুটে আসে তাঁর দিকে। ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর শরীর। শহীদ হন তিনি। এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান মণ্ডলের লেখায়। তিনি লিখেছেন :

'...মুক্ত এলাকা পাটগ্রাম দখল করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাতীবান্ধা থেকে বুড়িমারী আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ইপিআর মোহন মিয়া ও অন্যান্য ইপিআর সদস্যসহ মুক্তিযোদ্ধারা সফলভাবে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন।

'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ তীব্রতর হলে আনোয়ার এলএমজি নিয়ে ক্রল করে শত্রুর অবস্থানের প্রায় কাছে গিয়ে ব্রাশফায়ার করতে থাকলে ১৫-২০ জন শত্রুসেনা নিহত হয়। ঠিক এই অবস্থায় শত্রুবাহিনীর একঝাঁক গুলি বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারের দেহ ঝাঁঝরা করে দেয়।'

আনোয়ার হোসেন ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীন রংপুর উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই যুদ্ধ শেষে পাটগ্রামে তিনি লড়াই করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফতাব আলী, বীর উত্তম ও বীর প্রতীক

গ্রাম ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ, উপজেলা গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বাবা ইদ্রিস আলী, মা জোবেদা খানম।
স্ত্রী তাহেরা খানম। তাঁদের দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৯ ও ৬৩।

কোদালকাঠি কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার অন্তর্গত। সে সময় তারারশিপাড়া, খারুভাজ, চরসাজাই, ভেলামাঝী, শংকর-মাধবপুর এবং দেউয়ারচর নিয়ে ছিল কোদালকাঠি ইউনিয়ন। ইউনিয়নের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ।

এপ্রিলের প্রথমার্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেলটা কোম্পানির একাংশ বিদ্রোহ করে সুবেদার আফতাব আলীর নেতৃত্বে বর্তমান গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থেকে রৌমারীর চরাঞ্চলে অবস্থান নেয়। সেখানে আফতাব আলী তাঁর দলে স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি আগস্টের প্রথমার্ধ পর্যন্ত গোটা রৌমারী এলাকা মুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

৪ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি দল রৌমারী দখলের উদ্দেশ্যে কোদালকাঠিতে আক্রমণ করে। ব্যাপক আর্টিলারি গোলাবর্ষণে মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সুযোগে পাকিস্তানিরা কোদালকাঠি দখল করে নেয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শক্তিতে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েক গুণ। সে জন্য আফতাব আলী তখনই পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ না করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর আরও কয়েকটি দল এসে শক্তি বৃদ্ধি করে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কোদালকাঠিতে অবস্থান নিয়ে রৌমারী দখলের চেষ্টা করতে থাকে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সে প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে থাকেন। দুই-তিন দিন পর পর সেখানে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রৌমারী দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অক্টোবরের প্রথমার্ধে দুই দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা কোদালকাঠি অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর গোটা রৌমারী এলাকা পুরোপুরি মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়।

১৯৭১ সালে তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। তাঁর রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মার্চে তাঁর কোম্পানি ছিল পলাশবাড়ীতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে অবস্থান নেন রৌমারীতে। এপ্রিলের ১৪ বা ১৫ তারিখে তিনি রৌমারী থানা দখল করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের কাছে আফতাব আলী ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। অসংখ্য পাকিস্তান সমর্থককে প্রকাশ্যে গুলি করে শাস্তি দেন। জীবনের তোয়াক্কা না করে একের পর এক পাকিস্তানি সেনাদের বিপর্যস্ত করে দেন। তিনি একবার আহত হন। তাঁর দুই পায়ে চারটি গুলি লাগে। সুস্থ হয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় অদম্য সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। রৌমারী মুক্ত রেখে তিনি কিংবদন্তির যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী

বীর উত্তম ও বীর বিক্রম

গ্রাম উত্তর শ্রীপুর, উপজেলা ফুলগাজী, ফেনী।
বাবা সামসুল হুদা চৌধুরী, মা বুল-এ-আনার বেগম।
স্ত্রী সাবেরা ওয়াহেদ চৌধুরী। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৫ ও ১৩৩।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র বিদেশ থেকে আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরীসহ আটজন বাঙালি নাবিকের যুদ্ধে যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। ফ্রান্সের তুঁল নৌঘাঁটিতে তাঁরা পাকিস্তানের সদ্য কেনা সাবমেরিনে (ম্যানগ্রো) সাবমেরিনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ওয়াহেদ চৌধুরীসহ আটজন বাঙালি নাবিকের অদম্য মনোবল, একাগ্রতা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখে মুক্তিবাহিনীর নৌ উইং অর্থাৎ নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নৌবাহিনী গঠিত হয়। তাঁরা আটজন প্রথমে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশের ভেতরে নৌ-অভিযান পরিচালনার জন্য আরও সহযোদ্ধা (সুইসাইডাল স্কোয়াড) তৈরি করেন।

প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। বিপজ্জনক, স্পর্শকাতর মাইন ও বিস্ফোরকের সঠিক ব্যবহার রপ্ত করতে নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তত তিন বছর সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাঁরা দুই মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তদের নৌ-অভিযানের জন্য পারদর্শী করে তোলেন। এ জন্য তাঁরা দৈনিক প্রায় ১৮ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেন। এরপর দীর্ঘ যাত্রাপথে ঘটে অনেক ঘটনা। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ওয়াহেদ চৌধুরী সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের কাছে পৌঁছান। ১৩ আগস্ট আকাশবাণী বেতারকেন্দ্রে পরিবেশিত হয় একটি গান—'আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম যত গান'। এই গান ছিল সংকেত। এটা শুধু দলনেতাই জানতেন। এরপর তাঁর নির্দেশে সবাই প্রস্তুত হন। গোলাবারুদসহ শহর অতিক্রম করে পরদিন তাঁরা কর্ণফুলী নদীর তীরে পৌঁছান।

১৪ আগস্ট ওয়াহেদ চৌধুরী অপেক্ষায় থাকেন আরেকটি গান শোনার জন্য। গানটি সেদিনই বাজানোর কথা ছিল। কিন্তু বাজানো হয়নি। পরদিন ১৫ আগস্ট সকালে গানটি বাজে—'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি'। তিনি সহযোদ্ধাদের জানান, ওই রাতেই হবে অপারেশন।

এরপর ওয়াহেদ চৌধুরীসহ নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা চরম উৎকণ্ঠায় সময় কাটান। তাঁদের স্নায়ুচাপ বেড়ে যায়। কারণ, ওই রাতই হয়তো তাঁদের জীবনের শেষ রাত। এভাবে ১৫ তারিখের সূর্য বিদায় নেয়। গোপন শিবিরে নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত হন।

বর্ষণমুখর গাঢ় অন্ধকার রাতে ওয়াহেদ চৌধুরী সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওনা হন। রাত আনুমানিক একটায় তাঁর সহযোদ্ধারা পানিতে নেমে সাঁতার কেটে দ্রুত এগিয়ে যান লক্ষ্যের দিকে। তিনিসহ কয়েকজন তীরে থাকেন নিরাপত্তায়। রাত আনুমানিক দুইটা। কানফাটা আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা নগর। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটে চলে। চট্টগ্রাম বন্দরে থাকা পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি শুরু করে। এ অপারেশনের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'। অভিযান সফল হওয়ার পর আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সহযোদ্ধাদের নিয়ে ভারতে ফিরে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল করিম খন্দকার, বীর উত্তম

গ্রাম নতুন ভারেঙ্গা, উপজেলা বেড়া, পাবনা।
বাবা খন্দকার আবদুল লতিফ, মা আরেফা খাতুন।
স্ত্রী ফরিদা খন্দকার। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৮।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আবদুল করিম খন্দকার (এ কে খন্দকার) জুন মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা বহুমাত্রিক। বিশেষত মুক্তিবাহিনীর বিমানবাহিনী গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি মুক্তিবাহিনীর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর নিজ বয়ান থেকে কিছু কথা জানা যাক :

‘২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর আমি নিজেকে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সদস্য হিসেবে মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারগুবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৩ এপ্রিল স্বাধীনতাযুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থার জন্য যেতে পারিনি। ১৫ মে আগরতলায় পৌঁছি। ১৬ মে সকালে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হই। কর্নেল ওসমানীর (আতাউল গনি ওসমানী, পরে জেনারেল) সঙ্গে দেখা হয়।

‘১৯ বা ২০ মে আমরা কয়েকজন দিল্লি যাই ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল বিমান সংগ্রহ করে বিমানবাহিনী গঠন করা। ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। বুঝতে পারলাম, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে তাঁরা আমাদের বিমান দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন না। সময় এলে তাঁরা আমাদের সাহায্য করবেন।

‘তারপর আমরা কলকাতায় এলাম। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। এ সময় আমাকে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিবাহিনীর জন্য রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো, এসব দায়িত্ব আমার ছিল। অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করার দায়িত্বও আমার ছিল।

‘অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হতো। প্রথম মাসে ২-৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভেতরে পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত ১ লাখ ১ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

‘গেরিলা বাহিনীতে স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং যুবকেরা বেশির ভাগ যোগ দিয়েছিল। ট্রেনিং শেষ করার পর প্রত্যেক সেক্টরে কতজন গেরিলা পাঠানো হবে, তা এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণও হেডকোয়ার্টার্স থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

‘গেরিলাযুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ভেতরে গ্রাম এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চলাচল মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।...মুক্তিবাহিনীর এ সাফল্যই বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মূল কারণ।

‘প্রথম দিকে বিমানবাহিনীর সমস্ত পাইলট, টেকনিশিয়ান স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে স্থির হয় একটা এয়ার ইউনিট গঠন করা হবে। ভারতীয় বিমানবাহিনী আমাদের একটা অটার, একটা অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার এবং একটা ডিসি-৩ ডাকোটা বিমান দিয়েছিল।’

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম

গ্রাম ছাতিহাটি, উপজেলা কালিহাতী, টাঙ্গাইল। বর্তমান ঠিকানা ঢাকা। বাবা আবদুল আলী সিদ্দিকী, মা লতিফা সিদ্দিকী। স্ত্রী নাসরীন সিদ্দিকী। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৮।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে টাঙ্গাইলের পতন হলে প্রতিরোধযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে তাঁরা টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত এলাকা সখীপুরে সমবেত হন। এখানে শুরু হয় তাদের পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালে এ বাহিনীরই নাম হয় 'কাদেরিয়া বাহিনী'। আবদুল কাদের সিদ্দিকী বাহিনীর সামরিক প্রধান এবং আনোয়ার-উল-আলম শহীদ বেসামরিক প্রধান ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে আবদুল কাদের সিদ্দিকীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা টাঙ্গাইলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য সরাসরি যুদ্ধ ও অ্যামবুশ করেন। এর মধ্যে ধলাপাড়ার অ্যামবুশ অন্যতম।

ধলাপাড়া টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার অন্তর্গত। ১৬ আগস্ট আবদুল কাদের সিদ্দিকী ধলাপাড়ার কাছাকাছি একটি স্থানে ছিলেন। তিনি খবর পান, তাঁদের তিনটি উপদল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘেরাও করেছে। তাঁদের সাহায্য করার জন্য তিনি সেখানে রওনা হন। এদিকে অবরুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা তখন পিছু হটছিল।

আবদুল কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন মাত্র ১০ জন। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানিরা যে পথ দিয়ে পিছু হটছিল, সে পথে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সেনারা সংখ্যায় ছিল অনেক।

পাকিস্তানি সেনারা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই আসছিল। ৪০ গজের মধ্যে আসামাত্র কাদের সিদ্দিকী এলএমজি দিয়ে প্রথম গুলি শুরু করেন। একই সময় তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্রও গর্জে ওঠে। নিমেষে সামনের কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাকি সেনারা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, জীবন বাঁচানোর জন্য দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে থাকে।

এ দৃশ্য কাদের সিদ্দিকীকে উত্তেজিত করে তোলে। তিনি শোয়া অবস্থা থেকে উঠে পড়েন। দাঁড়িয়ে এলএমজি দিয়ে পলায়নপর পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকেন। তাঁর সহযোদ্ধারাও উঠে দাঁড়িয়ে গুলি করতে শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা গুলি করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে।

এ সময় হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া গুলি ছুটে আসে আবদুল কাদের সিদ্দিকীর দিকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন তিনি। যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো হয়। সেদিন তাঁদের হাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৪০ জন হতাহত হয়।

আবদুল কাদের সিদ্দিকী ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। সামরিক প্রশিক্ষণও ছিল তাঁর। স্কুলে পড়াকালে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে সেনাবাহিনীতে কিছুদিন চাকরি করেন। ১৯৬৭ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার শিক্ষাজীবনে ফিরে যান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল লতিফ মণ্ডল, বীর উত্তম

গ্রাম চরেরহাট, ইউনিয়ন পবনাপুর, উপজেলা পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। বাবা তোরাপ আলী, মা বালি বেগম। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮। গেজেটে নাম আবদুল লতিফ। শহীদ ৩ নভেম্বর ১৯৭১।

নভেম্বর মাস। আবদুল লতিফসহ মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র কাঁধে এগিয়ে যেতে থাকেন তাদের লক্ষ্যস্থল অভিমুখে। নিঃশব্দে সমবেত হন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের অদূরে। লক্ষ্য, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে সমূলে তাদের উচ্ছেদ করা।

পাকিস্তানি ঘাঁটির তিন দিকে ছিল নদী। সে কারণে আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন সুবিধাজনক অবস্থায়। মূল আক্রমণকারী দলের মুক্তিযোদ্ধাদের একপর্যায়ে নদী অতিক্রম করতে হয়। আবদুল লতিফ ছিলেন মূল আক্রমণে।

নদীর ঘাটপাড়ে ছিল পাকিস্তানিদের কয়েকটি বাংকার। আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা নদী অতিক্রম করে ওই সব বাংকার লক্ষ্য করে অসংখ্য গ্রেনেড ছোড়েন। পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কারণ, ঘাট এলাকা হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এই আক্রমণ ছিল তাদের জন্য কল্পনাতীত। এ জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

তীব্র আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনারা নদীর তীরের অবস্থান ছেড়ে পেছনে গিয়ে ত্বরিত সমবেত হয়। সেখানে ছিল পাকা গুদামঘর। তারা দ্রুত গুদামের ছাদে উঠে মেশিনগান ও এলএমজি স্থাপন করে। নল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে। তখন ভোর আনুমানিক পাঁচটা।

AMARBOI.COM

আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের প্রচণ্ড গোলাগুলি উপেক্ষা করে নদীর পাড়ে উঠে পড়েন। সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণ করেন। একপর্যায়ে দুঃসাহসী আবদুল লতিফ গুদামঘরের কাছে যান। ছাদ লক্ষ্য করে কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। হতাহত হয় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। এ সময় পাকিস্তানিদের গুলিতে শহীদ হন তিনি। তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মুক্ত হয় বিরাট এলাকা। তবে এ বিজয় আবদুল লতিফ দেখে যেতে পারেননি। পরে সহযোদ্ধারা তাঁকে সেখানেই সমাহিত করেন। এ ঘটনা ঘটে সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাটে। ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বরে।

এর আগে ২৪ অক্টোবর আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার ও পাকিস্তানিদের তাড়া খেয়ে তাঁদের পিছে হটে যেতে হয়েছিল। পাকিস্তানিরা তাঁর অনেক আহত সহযোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্রের আশপাশ থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করে।

আবদুল লতিফ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে জেড ফোর্সের অধীনে বাহাদুরাবাদ ঘাট, রাধানগর, ছোটখেলসহ আরও কয়েক স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সালেক চৌধুরী, বীর উত্তম

গ্রাম হাতুরপাড়া, উপজেলা দোহার, ঢাকা।
বাবা আবদুল রহিম চৌধুরী, মা সায়মা খানম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২। মৃত্যু ১৯৭২।

আবদুস সালেক চৌধুরী নির্ধারিত সময়ে সংকেত দেওয়ামাত্র গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। ঠিক তখনই মুক্তিযোদ্ধারা চরম এক সংকটের মুখোমুখি হন। শেষ হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ। এ ঘটনা নয়নপুরে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে।

নয়নপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। সালদা নদী রেলস্টেশনের কাছে। ১৯৭১ সালে সালদা নদী, নয়নপুরসহ আশপাশের গোটা এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানি সেনারা তাদের এই প্রতিরক্ষা অবস্থান আরও মজবুত করে। ঠিক এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায়। ফলে বেধে যায় ভয়াবহ যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন আবদুস সালেক চৌধুরী। এ যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় মুক্তিযোদ্ধা উইং কমান্ডার (অব.) কামালউদ্দিন আহমেদের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, 'আমরা প্রায় প্রতিরাতে সালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ডিফেন্স পজিশনে রেইড দিতাম। তারা (পাকিস্তানি) থাকত সুদৃঢ় ব্যাংকারে এবং উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। প্রতিটি রেইডেই কমবেশি ক্যাজুয়ালিটি হতো। একদিন মেজর সালেক, ক্যাপ্টেন গাফফার ও আমি চিন্তা করলাম ওদেরকে ঘেরাও করে সারেন্ডার করানো যায় কি না। এটা ছিল বড় রকমের আক্রমণের পরিকল্পনা।

'ঠিক ভোর পাঁচটায় ইন্ডিয়ান আর্মির আর্টিলারি সাপোর্ট নিয়ে মেজর সালেক ও ক্যাপ্টেন গাফফার শত্রুর রিয়ার দিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। গোলাগুলির প্রচণ্ডতায় আমি নিশ্চিত ছিলাম, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোম্পানি সারেন্ডার করতে বাধ্য হবে। আমি আমার ভান্ডারের সব গোলাবারুদ উজাড় করে দিলাম শত্রুর ওপর। এ ব্যাপারটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। কারণ, আমার ও শত্রু অবস্থানের মধ্যে কোনো ব্যারিয়ার ছিল না। ঠিক তখনই মেজর সালেক ও ক্যাপ্টেন গাফফারের এলাকা থেকে গুলির আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। এটা ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম সরাসরি আক্রমণ।'

আবদুস সালেক চৌধুরী ১৯৭১ সালে চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মার্চ মাসে ঢাকায় ছিলেন। ২২ এপ্রিল পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মেজর খালেদ মোশাররফের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) অধীনে কুমিল্লা অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। পরে সেক্টর গঠিত হলে দুই নম্বর সেক্টরের সালদা নদী সাবসেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। অক্টোবর মাসে মেজর খালেদ মোশাররফ আহত হলে নিয়মিত মুক্তিবাহিনী কে ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু তালেব, বীর উত্তম

গ্রাম কালুয়া, উপজেলা কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
বাবা কছিম উদ্দিন শেখ, মা রাশেদান বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৬। শহীদ আগস্ট ১৯৭১।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। ভারত থেকে তাঁরা বাংলাদেশে এসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে থাকেন। তাঁদের তৎপরতা বাড়তে থাকলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সীমান্তসংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। এ ক্যাম্পগুলো ছিল সীমান্ত চৌকির অতিরিক্ত। পাকিস্তানি সেনাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেওয়া।

মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে এসে সাতক্ষীরায় বেশ কয়েকটি অপারেশন করার পর পাকিস্তানি সেনারা সাতক্ষীরাতেও বিভিন্ন স্থানে এ রকম ক্যাম্প স্থাপন করে। একটি ক্যাম্প ছিল লক্ষ্মীপুরে। পাকিস্তানি সেনারা ওই অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থান করে সীমান্ত এলাকায় টহলদলের মাধ্যমে পাহারা দিত। ফলে, ভারত থেকে ওই এলাকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করা আবার সীমিত হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

লক্ষ্মীপুর ছিল মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন এলাকা। এ জন্য ৮ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে সিদ্ধান্ত হলো সেখানে আকস্মিক আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাদের তাড়িয়ে দেওয়ার। আকস্মিক আক্রমণ চালানোর আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লক্ষ্মীপুর ক্যাম্প সম্পর্কে রেকি করা হলো। ক্যাম্পটির প্রতিরক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী। তবে কিছুটা দুর্বলতাও আছে। মুক্তিযোদ্ধারা রেকি করে জানতে পারলেন, ক্যাম্পের সামনের দিক অর্থাৎ ভারতমুখী দিক বেশ মজবুত প্রতিরক্ষার আওতায়। পেছন দিকের প্রতিরক্ষা যথেষ্ট কম।

সিদ্ধান্ত হলো, আক্রমণস্থলের অদূরে পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হবেন। একদল সামনে থেকে, একদল পেছন থেকে আক্রমণ করবে। বাকিরা কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সামনে থেকে আক্রমণের দলে থাকলেন আবু তালেব। তাঁরা আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখবেন। সেই সুযোগে অপর দল পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প তছনছ করে দেবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আবু তালেব ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি ক্যাম্পে সামনে থেকে আক্রমণ চালান। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারাও সজাগ ছিল। তারাও পাল্টা আক্রমণ করে। নিমেষে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। আবু তালেব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ একঝাঁক গুলি ছুটে আসে তাঁর দিকে। একসঙ্গে কয়েকটি গুলি লাগে তাঁর শরীরে। এতেও তিনি দমে যাননি। গুলিবিদ্ধ হয়েও কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে ঢলে পড়েন মাটিতে। নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

আবু তালেব চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সাতক্ষীরায়। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে লড়াই করেন ৮ নম্বর সেক্টরের হাকিমপুর সাবসেক্টরে। খুলনার বৈকালী, সাতক্ষীরার ভোমরাসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু তাহের, বীর উত্তম

গ্রাম কাজলা, উপজেলা পূর্বধলা, নেত্রকোনা। বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ, মা আশরাফুন নেছা। স্ত্রী লুৎফা তাহের। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৯। সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড, ২১ জুলাই ১৯৭৬।

আবু তাহের কামালপুরের উত্তরে বর্ডার লাইনে তেঁতুলগাছের কাছে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। সকালের দিকে যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রভাগ থেকে একজন উপদলনেতা তাঁকে জানান, তাঁরা পাকিস্তানি দুর্গের প্রায় ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। বিজয় প্রায় হাতের মুঠোয় ভেবে এ সময় তাহের দ্রুত সামনে যান।

আনুমানিক সকাল নয়টা। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একটি শেল পড়ে আবু তাহেরের ঠিক সামনে। শেলের বড় এক স্প্লিন্টার লাগে তাঁর পায়ে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন-চারজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আশপাশে ছিলেন আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা দ্রুত এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বরের। কামালপুর জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযোদ্ধারা আবু তাহেরের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মূল প্রতিরক্ষায় ঢুকে পড়েন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা মাইন ও গুলির আঘাতে হতাহত হন। শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে তাঁর একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু একটু চামড়ার সঙ্গে ঝুলে ছিল। পরে তাঁকে ভারতের গৌহাটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আবু তাহের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটালিয়নে (স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ) চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুলাই মাসে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি ভারতে যান।

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর তাহেরের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ১১ নম্বর সেক্টরের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর একের পর এক আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা তটস্থ হয়ে পড়ে।

এখন আবু তাহেরের নিজের বয়ানে (১৯৭৩) মুক্তিযুদ্ধকালের কিছু কথা শোনা যাক। 'মুক্তিবাহিনীর প্রধানের নির্দেশে আগস্টের ১২ তারিখে আমি মেঘালয়ে পৌঁছাই। ওই এলাকার মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডে আগে থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কামালপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের মস্ত ঘাঁটি। সিদ্ধান্ত নিলাম কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণের।

'১৫ আগস্ট আমি ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করি। আমাদের অস্ত্র বলতে ছিল এলএমজি, রাইফেল এবং কিছু স্টেনগান। আক্রমণ দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়। আমাদের আক্রমণে ১৫-১৬ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

'১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে আমি একটা জিনিস দেখে বারবার অবাক হয়েছি। প্রত্যয় আর দৃঢ়তায় সকালের সূর্যের মতো হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচিত হতে না পেরে অতৃপ্তির ব্যথা নিয়ে ফিরে গেছে। তারপর যুবশিবিরে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন, কখন জীবন দেওয়ার ডাক আসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু মঈন মো. আশফাকুস সামাদ

বীর উত্তম

গ্রাম সতেরো দরিয়া, উপজেলা করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ। বাবা আ ম আজিমুস সামাদ, মা সাদেকা সামাদ। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮। গেজেটে তাঁর নাম আবু মঈন মো. সামাদ। শহীদ ১৯ অক্টোবর ১৯৭১।

গভীর রাত। মুক্তিযোদ্ধারা নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত। একটি দলের নেতৃত্বে আবু মঈন মো. আশফাকুস সামাদ। তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। কিন্তু যাওয়ার পথে তাঁরা নিজেরাই আক্রান্ত হলেন পাকিস্তানি সেনাদের হাতে। এ ঘটনা রায়গঞ্জে ঘটে ১৯৭১ সালের ১৯ অক্টোবর মধ্যরাতে। তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২০ অক্টোবর।

রায়গঞ্জ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার অন্তর্গত। এই ঘটনার বিবরণ আছে মুসা সাদিকের লেখায়। তিনি লিখেছেন: 'লে. সামাদ আর লে. আবদুল্লাহ ২৫ মাইল রেঞ্জের ওয়্যারলেস হাতে দুই গ্রুপ কমান্ডো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন পাকিস্তানিদের শক্ত ঘাঁটি দখলের জন্য। সবার হাতে একটা করে স্টেন আর কিছু গ্রেনেড। রায়গঞ্জে অবস্থিত ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে লক্ষ্য করে দুই গ্রুপ দুই দিক থেকে যাত্রা করে।

'জাঙ্গল শু পায়ে, চাদর গায়ে জড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাত নয়টায় নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েন। সোয়া ঘণ্টা যাত্রার পর রায়গঞ্জ ব্রিজের সন্নিকটে পৌঁছে লে. সামাদ সহসা দেখলেন তাঁর গ্রুপের সবাই ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ট্র্যাপে পড়ে গেছেন। তিনি বুঝলেন ভুল রেকি হয়েছে। রায়গঞ্জ ব্রিজের নিচে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এলএমজি বাঙ্কার রয়েছে এ খবর তিনি পাননি।

'শুরু হয়ে গেল ক্রস ফায়ারিং। সেই সঙ্গে পাকিস্তানি সেনারা তাদের ওপর আর্টিলারি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার চালাতে লাগল। বীর সামাদ বললেন, "কেউ এক ইঞ্চি পিছু হটবে না। মরলে সবাই মরব। বাঁচলে একসঙ্গেই বাঁচব।" শুরু হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন-মৃত্যুর লড়াই।

'নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে থেকে মুহুর্মুহু মর্টার শেল ও বুলেটের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ এতটুকু দমেনি। নিজের শেষ বুলেটটি শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করে নিজে শহীদ হয়েছেন। আমাদের ১৫-২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেদিন ২৫ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে যে অসম সাহস ও বীরত্ব নিয়ে লড়াই করেছে, পৃথিবীর যেকোনো বীরত্বব্যঞ্জক লড়াইয়ের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে।'

শহীদ আবু মঈন আশফাকুস সামাদ ও অন্যান্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে পরে উদ্ধার করে সমাহিত করা হয় পার্শ্ববর্তী জয়মনিরহাট মসজিদের পাশে।

আবু মঈন আশফাকুস সামাদ ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে পড়তেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার পর তিনি প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ এন এম নূরুজ্জামান, বীর উত্তম

গ্রাম সায়দাবাদ, উপজেলা রায়পুরা, নরসিংদী। বাবা আবু আহমেদ, মা লুৎফুন নেছা। স্ত্রী দীল আফরোজ জামান। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০। মৃত্যু ১৯৯৩।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ঢাকা থেকে অসংখ্য বাঙালি ইপিআর-আনসার-পুলিশ নরসিংদী জেলায় যান। এ এন এম নূরুজ্জামান নরসিংদীতে তাঁদের একাংশকে সংগঠিত করে কয়েক স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করেন। এসব যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন।

১৪-১৫ এপ্রিল নরসিংদীর পতন হয়। এরপর তিনি ভারতে যান। মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠার পর ৩ নম্বর সেক্টরের সহকারী সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পান এ এন এম নূরুজ্জামান।

সেক্টর কমান্ডার মেজর কে এম সফিউল্লাহ (বীর উত্তম, পরে সেনাপ্রধান ও মেজর জেনারেল) আগস্ট মাসে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য একটি ব্রিগেড গঠনের দায়িত্ব পান। তখন এ এন এম নূরুজ্জামান ৩ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পান। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সাহসের সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন।

তিন নম্বর সেক্টরের আওতাধীন এলাকা ছিল হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর জেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ এলাকা। এ এন এম নূরুজ্জামানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় ৩ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য অপারেশন করেন। তাঁর সার্বিক নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সরাসরি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে আখাউড়ার যুদ্ধ অন্যতম।

আখাউড়ার বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তি ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে সেখানে আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে এ এন এম নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে তিন নম্বর সেক্টরের একদল মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন।

নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের একদল (১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) মুক্তিযোদ্ধা আখাউড়ার উত্তর দিকে ব্লকিং পজিশন তৈরি করেন। এর ফলে সীমান্তসংলগ্ন সড়ক ও রেলপথ পাকিস্তানিদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। এস ফোর্সের আরেক দল (দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) মুক্তিযোদ্ধা একই দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করেন।

এ এন এম নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৩ নম্বর সেক্টরের একদল মুক্তিযোদ্ধা আগরতলা এয়ারফিল্ডের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ চালান। ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত আখাউড়ায় ভয়াবহ যুদ্ধ চলে। দুপুরে আখাউড়া মুক্ত হয়।

এ এন এম নূরুজ্জামান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত হিসেবে অনেকের সঙ্গে তাঁকেও আটক করা হয়। ১৯৬৯ সালে বেকসুর খালাস পান। কিন্তু তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

১৯৭১ সালে তিনি ব্যবসা করতেন। ২৫ মার্চ ঢাকায় ছিলেন। ২৭ মার্চ ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জে এম আমিনুল হক, বীর উত্তম

গ্রাম বাঁশবাড়িয়া, উপজেলা টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
বাবা নূরুল হক, মা ফাতেমা জোহরা। স্ত্রী মরিয়ম হক।
তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩। মৃত্যু ২০১১।

ঘণ্টাখানেক আগে সংঘটিত হয়েছে ভয়াবহ যুদ্ধ। যুদ্ধের দামামা থেমে গেলেও দুই পক্ষ থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে গোলা বর্ষিত হচ্ছে। গোটা যুদ্ধক্ষেত্র মহাশ্মশান। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ। কোনো জ্যান্ত মানুষ নেই। পাখিরাও পালিয়েছে।

এ জে এম আমিনুল হক মুক্তিবাহিনীর কমান্ডো প্লাটুনের কয়েকজনকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর অধীন মুক্তিযোদ্ধা দলের বেশির ভাগ আহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দলের একটি উপদলের দলনেতা (আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম) নিখোঁজ। তিনি জীবিত না মৃত, কেউ জানেন না। মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করার পর চারদিকে পাকিস্তানি সেনারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা খুঁজছে জীবিত ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে গুলি। মাঝেমধ্যে এসে পড়ছে বোমা। এ জে এম আমিনুল হক এতে বিচলিত হলেন না। খুঁজতে থাকলেন উপদলনেতাকে।

তখন আনুমানিক সকাল সোয়া আটটা। এ সময় এ জে এম আমিনুল হক শালবনের ভেতর থেকে দেখতে পেলেন তাঁকে। একটা গর্তের ভেতর চিত হয়ে পড়ে আছেন তিনি।

আমিনুল হক সহযোদ্ধাদের বললেন তাঁকে উদ্ধার করে আনতে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ইতস্তত ভাব। কারণ, সেদিক দিয়ে গুলি ছুটে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি একাই ক্রল করে রওনা হলেন উপ-দলনেতার উদ্দেশে। তখন তাঁর অনুগামী হলেন কয়েকজন সহযোদ্ধা।

এ ঘটনা নকশী বিওপিতে ঘটে ১৯৭১ সালের ৩ আগস্ট। সেদিন মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নকশী বিওপির পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন এ জে এম আমিনুল হক। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূল আক্রমণকারী ছিল ব্রাভো ও ডেলটা কোম্পানি। যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী। নকশী বিওপির অবস্থান শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায়।

সেদিনকার সেই বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে ওই যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ২৬ জন শহীদ এবং অনেকে আহত হন। নকশী বিওপির যুদ্ধে এ জে এম আমিনুল হকের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা সফল না হলেও পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বেশ সফলতা অর্জন করেন।

এ জে এম আমিনুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের অধীনে কর্মরত ছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে পালিয়ে তাতে যোগ দেন। পরে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী নূরুজ্জামান, বীর উত্তম

গ্রাম চাটদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
বাবা কাজী সাদরুলওলা, মা রতুবুন্নেছা। স্ত্রী সুলতানা সারওয়াত আরা জামান। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ০৫। মৃত্যু ২০১১।

কাজী নূরুজ্জামান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় যান। সেখানে ৪ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া বিদ্রোহী বাহিনীগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী বাহিনীগুলোকে একটি কমান্ড চ্যানেলে এনে সমন্বিতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি দায়িত্ব পান মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে। মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ায় তিনি নানা ভূমিকা পালন করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে কাজী নূরুজ্জামানকে ৭ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। এই সেক্টরের আওতায় ছিল গোটা রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা এবং দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার অংশবিশেষ। উত্তরবঙ্গের অর্ধেকের বেশি এলাকা নিয়ে ছিল এই সেক্টর। এর অধীনে সাবসেক্টর ছিল নয়টি।

কাজী নূরুজ্জামান ৭ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পাওয়ার পর শাহপুর গড়সহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে শাহপুর গড়ের যুদ্ধে রণাঙ্গনে উপস্থিত থেকে তিনি নিজেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি মুক্তিবাহিনীর একটি দল নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৩ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুদ্ধ হয়।

AMARBOI.COM

একটি যুদ্ধের বর্ণনা শোনা যাক কাজী নূরুজ্জামানের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন: 'আমরা খঞ্জনপুর ও সাপাহার দখলের পরিকল্পনা করি। আক্রমণ করার আগে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের ১২০ জন মুক্তিযোদ্ধা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে খঞ্জনপুর ও সাপাহার আক্রমণ করবে। দুদিন পর অপারেশন শুরু হলো। রাতে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করলেন, ভোর রাত থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। সূর্য উঠতে উঠতে দেখি আঘাতপ্রাপ্ত ছেলেরা ফিরে আসছে। কিছুক্ষণ পর মুক্তিযোদ্ধাদের দলনায়ক ইদ্রিসকেও খুঁড়িয়ে আসতে দেখলাম।

'জানতে পারলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের যাওয়ার পথে ছিল অসংখ্য অ্যান্টিপারসোনাল মাইন। মুক্তিযোদ্ধারা মাইনে বাধাপ্রাপ্ত হন। এ সময় পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা আর অগ্রসর হতে পারেননি।

'ইদ্রিস বলে, অগ্রসর হওয়ার সময় একটি মাইনে তার পায়ের চাপ লাগে। কিন্তু মাইন পুরোপুরি ফাটেনি। তাকে কেবল কয়েক গজ ছিটকে দিয়েছে। অ্যান্টিমাইনে মুক্তিযোদ্ধারা এত বেশি আহত হয়েছিলেন যে আমাদের ফার্স্ট এইডের ওষুধ ও ব্যান্ডেজ যা ছিল তা শেষ হয়ে যায়। আমাদের এই অপারেশন সফল হয়নি। কারণ, শত্রুপক্ষ আমাদের পরিকল্পনা জেনে ফেলেছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ, বীর উত্তম

গ্রাম রূপগঞ্জ (কাজীবাড়ি), উপজেলা রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা ঢাকা। বাবা কাজী মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, মা রজ্জব বানু। স্ত্রী সাইদা আক্তার। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০২।

১৯৭১ সালে কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ (কে এম সফিউল্লাহ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। ২৮ মার্চ তিনি বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টর এবং পরে এস ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চান্দুরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নিজের বয়ানে (১৯৭৫) মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনা জানা যাক :

'২৭ মার্চ বিকেলের দিকে আমাদের একজন ড্রাইভার ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।...সন্ধ্যার দিকে আরও কিছু লোক ঢাকা থেকে আসে। তাঁদের মুখে শুনতে পাই ঢাকাতে বেশ হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এর আগে ড্রাইভার ছাড়া আর কারও কাছে কিছু শুনতে পাইনি।

'২৮ মার্চ ১০টার সময় উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন নিয়ে আমি ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করি। জয়দেবপুর থেকে বের হওয়ার পর সকল গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়ন করি। সাথে সাথে সমস্ত জোয়ানের মাঝে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হয়। আমার কনভয় জয়দেবপুর থেকে বের হবার সাথে সাথে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে এবং "জয় বাংলা" স্লোগান দিয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

'টাঙ্গাইলে জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হই। ভাবনাও কম ছিল না। মনে মনে চিন্তা করতে থাকি, আমি যা করতে চলেছি সে কাজে আমি শুধু একা, না আরও কেউ আছে? কারণ আমি জানি, আমি যা করতে চলেছি তা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র সাজা। অন্যদিকে জনতার উৎফুল্লতা দেখে মনে উৎসাহের সৃষ্টি হতো।

'২৯ মার্চ বিকেলে জেলা (ময়মনসিংহ) অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সমস্ত অফিসার, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএদেরকে নিয়ে এক বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকে কীভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে তার পরিকল্পনা নিই।

'৩০ মার্চ ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনযোগে নরসিংদী রওনা দিই। আসার পূর্বে আমি জনগণকে আশ্বাস দিলাম যে, আমি আমার ব্যাটালিয়ন নিয়ে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে যাচ্ছি। আমার হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করি কিশোরগঞ্জ। আর আমার লোকজন বিভিন্ন গন্তব্যে অগ্রসর হয়।'

কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ আর পেছনে তাকাননি। ৩ নম্বর সেক্টর এলাকায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর সার্বিক নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সরাসরি যুদ্ধও সংঘটিত হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম

গ্রাম মোশাররফগঞ্জ, উপজেলা ইসলামপুর, জামালপুর। বাবা মোশাররফ হোসেন, মা জামিলা খাতুন। স্ত্রী সালমা খালেদ। তাঁদের তিন মেয়ে।। খেতাবের সনদ নম্বর ০৭। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানে নিহত।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই খালেদ মোশাররফ ঢাকা-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার ইপিআর সেনা, পুলিশ-আনসারসহ ছাত্র-যুবক ও সাধারণ জনতাকে সংগঠিত করেন। তাঁর দলে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে বিরাট এক বাহিনী গড়েন। এ বাহিনীর অধীন মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও এর আশপাশের এলাকায় শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলে।

প্রতিরোধযুদ্ধকালে খালেদ মোশাররফ অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অধীন মিশ্র বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হয়ে তিনি বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা বাহিনী (ক্র্যাক প্লাটুন) গড়ে তোলেন। ক্র্যাক প্লাটুন ঢাকা মহানগরের প্রাণকেন্দ্রে একের পর এক অপারেশন করে পাকিস্তানি সেনাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে তোলে।

এর মধ্যে (জুন মাসে) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। তখন মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খালেদ মোশাররফকে ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। পরে (সেপ্টেম্বর) তিনি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি দুই দায়িত্বই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

সামরিক ও অবস্থানগত দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে ২ নম্বর সেক্টরের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর আওতায় ছিল ঢাকা মহানগর, অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এবং কুমিল্লা সেনানিবাস।

খালেদ মোশাররফের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় ২ নম্বর সেক্টরের নিয়মিত বাহিনী ও স্বল্প প্রশিক্ষণ পাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য অপারেশন করেন। তাঁর সার্বিক নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি সরাসরি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। এর মধ্যে সালদা নদীর যুদ্ধ অন্যতম। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত সালদা নদী। মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল কসবায় প্রথাগত (কনভেনশনাল) আক্রমণ চালায়। কসবার বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। পাকিস্তানি সেনাদের সব প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল সুরক্ষিত ও মজবুত বাংকার।

খালেদ মোশাররফ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে (সালদা নদী রণক্ষেত্রে) উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রণাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতির ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। সেদিন গোটা কসবা এলাকায় ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তার পরও সালদা নদী এলাকা দখল করা সম্ভব হয়নি। তবে কসবার বিরাট এলাকা স্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে খালেদ মোশাররফ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জন দত্ত, বীর উত্তম

গ্রাম মিরাশি, উপজেলা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা, বাসা-৪৯, সড়ক-২, পুরাতন ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা। বাবা উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, মা লাবণ্য প্রভা দত্ত। স্ত্রী মনীষা দত্ত। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৪।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে ৪ নম্বর সেক্টর ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক এলাকা। এই সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দত্ত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরাট অংশ নিয়ে ছিল এই সেক্টর। অধীন এলাকাগুলো হলো সিলেট জেলার কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর, দিরাই, শাল্লা উপজেলা এবং মৌলভীবাজার জেলা।

৪ নম্বর সেক্টর এলাকায় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে চিত্তরঞ্জন দত্ত নিজেই নেতৃত্ব দেন। সেক্টর গঠিত হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন দত্তের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম দিকের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে সুপরিকল্পিতভাবে অনেকগুলো অপারেশন করেন। চিত্তরঞ্জন দত্তের একটি ভাষ্য আছে *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ, দলিলপত্র, দশম খণ্ডে*। বয়ানে তাঁর সেক্টরের অনেক যুদ্ধের বর্ণনা আছে। একটি যুদ্ধের কথা শোনা যাক সেই বয়ান থেকে :

'...খাওয়া-দাওয়া করে গ্রাম থেকে দুজন গাইড নিয়ে চললাম হিমুর উদ্দেশে। সারা রাত নদী-খাল-বিল পার হয়ে পৌঁছলাম আটগ্রাম বলে একটি গ্রামে। সেখান থেকে হিমুর দূরত্ব দুই মাইল। আটগ্রামে পৌঁছলাম ভোর চারটায়। গ্রামের পাশে নদী পার হতে হবে। ওপারে সবাই পৌঁছলাম। সকাল হতে চলেছে। দেখলাম হিমু পর্যন্ত পুরো মাঠ খোলা। চিন্তা করলাম দিনের বেলা এই খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না।

'যা-ই হোক আমরা সবাই আবার নদী পার হয়ে আটগ্রামে ফিরে এলাম। বেলা সাড়ে আটটা হবে। পাকিস্তানিদের দিক থেকে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। একই সঙ্গে মেশিনগান ও এসএমজির গুলিবর্ষণ। কিছু করার নেই, একেবারে শত্রুর মুখে পড়ে গেছি। আটগ্রাম ছোট গ্রাম। বৃষ্টির মতো গোলাগুলি হচ্ছিল। চিন্তা করলাম যদি আটগ্রামে থাকি সবাই মারা যাব। তাই সবাইকে বললাম, যে যেভাবে পারে পেছনে যেতে (পৃষ্ঠা : ৩৪৭-৪৮)।'

পরে সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। চিত্তরঞ্জন দত্ত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেন। তাঁর প্রেরণায় মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন।

চিত্তরঞ্জন দত্ত চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফ্রন্টিয়ার ফোর্সে। ১৯৭১ সালে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল মেজর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজারে প্রতিরোধযুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে তিনি ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম

গ্রাম বাগবাড়ি, উপজেলা গাবতলী, বগুড়া। বাবা এম মনসুর রহমান, মা জাহানারা খাতুন। স্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৩।

জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন। এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ওই রাতেই তিনি বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

২৭ ও ২৮ মার্চ তিনি চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এ ঘোষণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন মুক্তিযোদ্ধাসহ সবার মনে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

জিয়াউর রহমান প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ১ নম্বর সেক্টর, পরে ১১ নম্বর সেক্টর এলাকার অধিনায়ক এবং পরবর্তীকালে জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সার্বিক নেতৃত্ব ও পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলোর মধ্যে রয়েছে কামালপুর, ছাতক, ধলই বিওপি ও রাধানগরের যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি সিলেট এলাকায় ছিলেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টায় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া (পাকিস্তানি) জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে যাওয়ার পথে রাস্তায় ছিল বেশ কিছু ব্যারিকেড। আগ্রাবাদে একটি বড় ব্যারিকেডের কারণে তাঁর ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ে। এ সময় পেছন থেকে ছুটে আসে একটি ডজ গাড়ি। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী ওই গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে যান জিয়াউর রহমানের কাছে। হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে যান রাস্তার পাশে। তিনি জিয়াকে জানান, পশ্চিমারা গোলাগুলি শুরু করেছে। শহরের বহু লোক হতাহত। তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন, 'জিয়া ভাই, এখন কী করবেন?' খালেকুজ্জামানের কথা শুনে জিয়া বলে ওঠেন, 'উই রিভোল্ট।'

জিয়াউর রহমান ফিরে যান ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে পৌঁছেই সঙ্গে থাকা পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা ও নৌসেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। হকচকিত পাকিস্তানি সেনাদের সবাই আত্মসমর্পণ করে। এরপর তিনি একাই একটি গাড়ি নিয়ে ছুটে যান কমান্ডিং অফিসার জানজুয়ার বাড়িতে।

কলবেলের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে আসেন জানজুয়া। দরজায় জিয়াউর রহমানকে দেখে চমকে ওঠেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ততক্ষণে জিয়া বন্দরে বন্দী থাকার কথা। জানজুয়াকে আটক করে ষোলশহরে নিয়ে যান জিয়া।

এরপর জিয়া টেলিফোনে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। তাঁদের কাউকে না পেয়ে তিনি ফোন করেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। সবাইকে ফোন করে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা জানাতে বলেন অপারেটরকে। অপারেটর সানন্দে তাঁর নির্দেশ পালনে রাজি হন। এভাবে শুরু হয়ে যায় তাঁর মুক্তিযুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসির উদ্দিন, বীর উত্তম

গ্রাম মোহাম্মদপুর, ইউনিয়ন রামরাইল, উপজেলা সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা লাল মিয়া, মা আম্বিয়া খাতুন। স্ত্রী সুফিয়া খাতুন। তাঁর এক মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬। শহীদ ৪ আগস্ট ১৯৭১।

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার অন্তর্গত নকশী বিওপি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষাব্যূহ। ৩ আগস্ট শেষ রাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ৪ আগস্ট) মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করেন। তখন সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর দলে ছিলেন নাসির উদ্দিন। তিনি শহীদ হন এই যুদ্ধে।

ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মদ চৌধুরীর (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) ভাষ্যে আছে এই যুদ্ধের বর্ণনা। তিনি বলেন :

'সুষ্ঠুভাবেই মুক্তিযোদ্ধারা অ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে এফইউপিতে পৌঁছান। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি রাত তিনটা ৪৫ মিনিটে আর্টিলারি ফায়ার শুরু করার সংকেত দিই। সঙ্গে সঙ্গে আর্টিলারি গর্জে ওঠে। একই সময় পাকিস্তানি আর্টিলারির কামান ও মর্টার থেকেও গোলাবর্ষণ শুরু হয়। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একবার মাটিতে শুয়ে পড়া, আবার উঠে দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

মুক্তিযোদ্ধারা (নাসির উদ্দিনসহ) এক্সটেনডেড ফরমেশন করে সামনে এগিয়ে যান।

আমার বাঁয়ে হাবিলদার নাসির (নাসির উদ্দিন) অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে এগোতে থাকেন। আমি নিজে নায়েক সিরাজকে (সিরাজুল হক, বীর প্রতীক, এই যুদ্ধে শহীদ) নিয়ে ডানে পাকিস্তানি বাংকার লক্ষ্য করে এগোতে থাকি। আমাদের মনোবল দেখে শত্রুরা তখন পলায়নরত। আমি সঙ্গে সঙ্গে চার্জ বলে হুংকার দিই।

'মুক্তিযোদ্ধারা (নাসির উদ্দিনসহ) সঙিন (অস্ত্র) উঁচু করে রীতিমতো দৌড়াতে থাকেন। নায়েব সুবেদার মুসলিম এ সময় উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য ঘন ঘন "জয় বাংলা-নারায়ে তাকবির" ধ্বনি করলে মুক্তিযোদ্ধারা "জয় বাংলা-ইয়া আলি" স্লোগান দিয়ে যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলেন।

'নাসিরসহ মুক্তিযোদ্ধারা যখন শত্রুশিবিরের মাত্র ১০০ গজের মধ্যে, ঠিক তখনই শত্রুদের নিক্ষিপ্ত একটি আর্টিলারির শেলভো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়ে তাঁদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন মাটিতে ঢলে পড়েন। এর মধ্যে হাবিলদার নাসিরও ছিলেন। আমার ডান পায়েও স্প্লিন্টার লাগে। এ সময় আমাদের কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। অন্যরা এগিয়ে যান। দেখতে পেলাম, আমাদের গুটিকতক মুক্তিযোদ্ধা পলায়নরত শত্রুদের মারছেন। কেউ কেউ মাইনফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্রটা যেন তখন মহাশ্মশান।'

নাসির উদ্দিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরে। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। ১৯৭১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ছুটিতে বাড়ি আসেন। প্রতিরোধযুদ্ধকালে আশুগঞ্জের যুদ্ধে অংশ নেন। পরে ভারতে যাওয়ার পর তাঁকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলায়েত হোসেন, বীর উত্তম

গ্রাম গাছুয়া, উপজেলা সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। বাবা মাজেদ মিয়া, মা বিবি মরিয়ম। স্ত্রী তফসিলা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩১।
শহীদ ১৪ নভেম্বর ১৯৭১।

প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যেতে থাকল। বেলায়েত হোসেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন। ভীতসন্ত্রস্ত সেনারা তখন পেছন ফিরে গুলি করতে করতে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। বেলায়েত হোসেন দমে গেলেন না। তাঁর ইচ্ছা দু-একজন শত্রুসেনাকে জীবিত ধরার। সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগোতে থাকলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। শত্রুসেনাদের ছোড়া একটি গুলি এসে লাগল তাঁর মাথায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। কিছুক্ষণ পর নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা ঘটে সালদা নদীতে ১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর।

সালদা নদী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। ১৪ নভেম্বর। তখন বেলা একটার মতো হবে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল সালদা নদী পুনর্দখলের জন্য মনোয়ারা গ্রামের পশ্চিম দিকে গোডাউন এলাকা হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। ওই এলাকায় বেলায়েত হোসেন ছিলেন তাঁর দল নিয়ে। অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের ওপর তিনি আক্রমণ চালান। প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তারা পালাতে থাকে। তখন বেলায়েত হোসেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে তাদের ধাওয়া করেন।

২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) ১৯৭৪-৭৫ সালে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেলায়েত হোসেন সম্পর্কে বলেছেন, '...সুবেদার বেলায়েত একটি দল নিয়ে পাক সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গুদামঘর এলাকায় আক্রমণ চালায়। পাক সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু একজন পাকসেনা আড়াল থেকে সুবেদার বেলায়েতকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তার মাথায় গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই সে শাহাদাতবরণ করে। তার মতো বীর সৈনিকের শহীদ হওয়ায় আমরা সবাই মর্মাহত হয়ে পড়ি। বেলায়েতের কীর্তি এবং বিক্রমের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সালদা নদী এলাকা দখল করা একটি দুঃসাহসী পরিকল্পনা ছিল।'

বেলায়েত হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। মার্চ মাসের শুরু থেকে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদ্রোহ করে তাতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের সালদা নদী সাবসেক্টরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী, বীর উত্তম

গ্রাম হবখালী, সদর, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা মহুয়া অ্যাপার্টমেন্ট, ১৬৭ পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা। বাবা জেড আহমেদ, মা ওয়াজেদা আহমেদ। স্ত্রী সৈয়দা রোকেয়া সিদ্দিকী। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৭। পরিচিত কমল সিদ্দিকী নামে।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সে সময় একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন নড়াইল জেলায়। তাঁদের নেতৃত্বে মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী (কমল সিদ্দিকী)। তিনি খবর পেলেন, ভাটিয়াপাড়া ওয়্যারলেস স্টেশনের ডিজেল শেষ হওয়ার পথে। ঈদের দিন পাকিস্তানি সেনারা নড়াইল থেকে সেখানে ডিজেল নিয়ে যাবে।

গোপালগঞ্জ জেলা সদর থেকে উত্তরে মধুমতী নদীর তীরে ভাটিয়াপাড়া। নদীর ওপারে নড়াইল জেলা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পে ছিল সেনা, মিলিশিয়া ও পুলিশের সমন্বয়ে ৪০ জনের একটি দল।

তখন ওই ওয়্যারলেস স্টেশনের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা ছিল জেনারেটরের মাধ্যমে। জেনারেটর চালানোর জন্য প্রয়োজন হতো ডিজেলের। পাকিস্তানি সেনারা কিছুদিন পর পর ডিজেল আনত ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ বা নড়াইল থেকে।

মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী সিদ্ধান্ত নিলেন, পাকিস্তানি সেনারা যখন ডিজেল নিয়ে যাবে, তখন আক্রমণ করবেন। নড়াইল থেকে তারা আসবে সড়কপথে। পথে ছোট নবগঙ্গা নদী পার হয়ে তারপর মধুমতী নদী। এই নদী পার হতে হবে গানবোটে।

মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঈদের আগের রাতে অবস্থান নিলেন নবগঙ্গার পাড়ে। ভোর হয় হয়, এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছয়টি জিপ আসছে। তিনি সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন, তাঁর সংকেতের আগে কেউ যেন গুলি না ছোড়েন। কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা উত্তেজনায় আগেই গুলি করে বসলেন। পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত জিপ থামিয়ে আড়ালে পজিশন নিয়ে আক্রমণ শুরু করল। নিমেষে শান্ত এলাকা পরিণত হলো রণক্ষেত্রে। যুদ্ধ চলতে থাকল।

পাকিস্তানি সেনারা সবাই অবস্থান নিয়েছে জিপের আড়ালে। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণে তাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। এ অবস্থায় মাসরুর-উল-হক যুদ্ধকৌশল পাল্টালেন। এরপর তাঁরা গুলি করতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাদের মাথা দেখে। এই কৌশলে বেশ কাজ হলো। তাঁদের হাতে একের পর এক পাকিস্তানি সেনা নিহত বা আহত হতে থাকল। এভাবে যুদ্ধ চলল দেড়-দুই ঘণ্টা। তারপর পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল।

মাসরুর-উল-হক সিদ্দিকী ১৯৭১ সালে ওয়াপদার (বর্তমানে পানি উন্নয়ন বোর্ড) সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। সেখানে তিন মাস বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ে প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থাকেন। এরপর পুনরায় যোগ দেন সশস্ত্র যুদ্ধে।

১৮ বা ১৯ ডিসেম্বর ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর চোখে গুলি লাগে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ভাটিয়াপাড়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা তখন আত্মসমর্পণ করেনি। সেদিন যুদ্ধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুবুর রহমান, বীর উত্তম

ঈদগাহ বস্তি, দিনাজপুর। বাবা এ এম তাছিরউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, মা জরিনা খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৩। শহীদ ২৬ নভেম্বর ১৯৭১।

ভোর হয় হয়, এ সময় সেখানে গোলাগুলির শব্দ। নিমেষে শান্ত এলাকা পরিণত হলো রণক্ষেত্রে। গোটা এলাকা প্রচণ্ড গোলাগুলিতে প্রকম্পিত। গোলাগুলির শব্দ শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক মাহবুবুর রহমান দ্রুত উঠে পড়েছেন। তিনি বিচলিত হলেন না। যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। তাঁর দলের ওপর আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যভাগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান সম্মুখ প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল কানাইঘাটে। এর অগ্রবর্তী এলাকা জকিগঞ্জ, আটগ্রাম ও চারগ্রাম তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। আটগ্রাম-চরখাই-সিলেট অক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য কানাইঘাট দখলে রাখা ছিল যেকোনো পক্ষের জন্য অপরিহার্য। সেখানে প্রতিরক্ষায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানি ও পশ্চিম পাকিস্তানি স্কাউটস দলের একটি প্লাটুন এবং কিছুসংখ্যক রাজাকার। এ ছাড়া কাছাকাছি ছিল তাদের একটি আর্টিলারি ব্যাটারি।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে সিলেট অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ১৫ নভেম্বর তারা প্রথমে চারগ্রাম এবং পরে জকিগঞ্জ দখল করে। এরপর আবার চারগ্রামে ফিরে গিয়ে পুনঃসংগঠিত হয়ে কানাইঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সুরমা নদীর উত্তর তীর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে কানাইঘাটের দুই মাইল দূরে গৌরীপুরে পৌঁছান। সেখানে তাঁরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল (আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি) সুরমা নদীর উত্তর তীরে এবং অপর দল (চার্লি ও ডেল্টা কোম্পানি) দক্ষিণ তীরে অবস্থান নেয়।

২৬ নভেম্বর ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের মূল ডিফেন্সিভ পজিশন ছেড়ে পূর্ণ শক্তিতে অগ্রসর হয়ে আকস্মিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। এতে তাঁদের আলফা কোম্পানি নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়। এই কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন মাহবুবুর রহমান। ওই অবস্থায় পাল্টা আক্রমণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা-ই করতে থাকেন। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গুলি এসে লাগে তাঁর শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহীদ হন। এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হন।

মাহবুবুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফ্রন্টিয়ার ফোর্সে। ১৯৭১ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৯ মার্চ সেনানিবাস থেকে পালিয়ে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার পর তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি দিয়ে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানির অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জামালপুর জেলার কামালপুরসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর শওকত আলী, বীর উত্তম

এমভিআই আহমেদস হাউস, জগন্নাথ মন্দির, বিবিরবাজার, কুমিল্লা। বাবা মীর মাহবুব আলী। স্ত্রী তাহমিনা শওকত। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৬। মৃত্যু ২০১১।

মীর শওকত আলী প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর আগস্ট মাস থেকে ৫ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সেক্টরের আওতাধীন ছিল সিলেটের উত্তরাংশের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের (তখন মহকুমা) সদর, ছাতক, দোয়ারাবাজার ও জামালগঞ্জ উপজেলা (তখন থানা)। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় ৫ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য অপারেশন করেন। তাঁর সার্বিক নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি গেরিলা ও সরাসরি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। এর মধ্যে গোবিন্দগঞ্জের সরাসরি যুদ্ধ একটি।

মীর শওকত আলীর বয়ানে (১৯৭৪) মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনা জানা যাক: 'প্রথমে আমি মেজর জিয়াউর রহমানের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) সঙ্গে ১ নম্বর সেক্টরে তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে কাজ করি। ৩০ মার্চের পর তিনি আমার সঙ্গে আর ছিলেন না। সীমান্তের ওপারে গিয়েছিলেন। কাজেই তখন থেকে মুক্তিবাহিনীর পুরো কমান্ড আমার হাতে এসে পড়ে।

'২ মে বিকেলে আমরা সীমান্তের ওপারে যাই। কিছুদিন পর জেনারেল (তখন কর্নেল) ওসমানী আমাকে ডেকে বললেন, সিলেটে এলাকায় সেক্টর খোলা হয়নি। ওই এলাকায় অনেক ইপিআর, স্বেচ্ছাসেবক ও সেনা বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। তিনি নির্দেশ দিলেন আমাকে অবিলম্বে শিলং যেতে এবং ওখানে থেকে যুদ্ধ সংগঠন করতে।

'সেখানে গিয়ে দেখি, আমাদের লোকজন খুব বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। না ছিল রসদপত্র, না ছিল কোনো যুদ্ধ সংগঠন। পরে আমাকে ৫ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। এলাকাটি ছিল বেশ দুর্গম। আমি আমার এলাকা পাঁচটি সাবসেক্টরে ভাগ করি।

'আমাদের রণকৌশল যা হওয়া উচিত, তা-ই ছিল। গেরিলা রণকৌশলকে আমরা প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। যুদ্ধের নিয়ম হলো, কোনো বড় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর পর তার সঙ্গে চিরাচরিত যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করলে হারতে হবে। এ স্থলে চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করে গেরিলাযুদ্ধ করতে হবে।

'এ পদ্ধতিতে আমরা শত্রুর (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) ওপর আক্রমণ করে পালিয়ে যেতাম। অর্থাৎ রোজ এ পদ্ধতিতে আঘাত করে তাদের শক্তি কমিয়ে দেওয়া। এতে শত্রুর অনেক ক্ষতি হতো। আমাদের তেমন কিছুই হতো না।

৩ ডিসেম্বর আমরা টেংরাটিলা দখল করলাম। তারপর ছাতক ও সুনামগঞ্জ। এরপর আমরা সিলেটের দিকে ধাবিত হলাম। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হলো।'

মীর শওকত আলী ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। তাঁর পদবি ছিল মেজর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহবুবুর রহমান, বীর উত্তম

গ্রাম বানাবাড়িয়া, উপজেলা বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। বাবা মুস্তাফিজুর রহমান, মা লুৎফুননাহার। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২০। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান হত্যা ঘটনার পর নিহত।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মিয়াবাজার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে। গেরিলা অপারেশন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ওই এলাকা দিয়ে চলাচল করতে হয়। কিন্তু পাকিস্তানি ওই ক্যাম্পের কারণে তাঁদের বেশ অসুবিধা হতে থাকল। তাঁরা কয়েকবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অ্যামবুশে পড়ল। এতে তাঁদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলো।

মিয়াবাজার মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের নির্ভয়পুর সাবসেক্টরের আওতাধীন এলাকা। আগস্ট মাসে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স থেকে সেখানে নির্দেশ এল অবিলম্বে মিয়াবাজার থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী উচ্ছেদের।

নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে মুক্তিবাহিনীর একটি দলের দলনেতা মেহবুবুর রহমান। তাঁর ওপরই দায়িত্ব পড়ল পাকিস্তানি সেনাদের মিয়াবাজার থেকে উচ্ছেদ করার। দায়িত্ব পেয়েই তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন।

কয়েক দিন পর মেহবুবুর রহমান তাঁর দল নিয়ে রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেন। ভোর রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে। কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হলো কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। আহত হলো অনেক। এই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে মিয়াবাজারের অবস্থান পরিত্যাগ করে তারা কুমিল্লায় চলে গেল।

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে খবর এল, পাকিস্তানি সেনারা মিয়াবাজারে আবার ক্যাম্প স্থাপন করেছে। তখন নির্ভয়পুর সাবসেক্টরের অধিনায়ক মেহবুবুর রহমান। তিনি বুঝতে পারলেন, পুনরায় ক্যাম্প স্থাপন করে পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তা চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেহবুব সিদ্ধান্ত নিলেন, পাকিস্তানি সেনাদের এই পরিকল্পনা যেকোনো মূল্যে নস্যাৎ করতে হবে।

১৭ অক্টোবর রাত আনুমানিক ১১টা। সহযোদ্ধাদের নিয়ে মেহবুব আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে। প্রায় দেড় ঘণ্টা যুদ্ধ চলল। আক্রমণে নিহত হলো দুজন পাকিস্তানি সেনা। আহত হলো পাঁচ-ছয়জন। তিন দিন পর ২০ অক্টোবর। মেহবুবুর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে আবার আক্রমণ চালালেন মিয়াবাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আরেকটি ঘাঁটিতে। তখন আনুমানিক ভোর চারটা। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল পাকিস্তানি সেনারা। দুই ঘণ্টার যুদ্ধে নিহত হলো ২১ জন পাকিস্তানি সেনা। আহত হলো আরও বেশি।

মেহবুবুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে তিনি ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আজিজুর রহমান, বীর উত্তম

গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি বি-১৫৫, লেন-২২, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা সরাফত আলী, মা মহিবুন নেছা। স্ত্রী সেলিনা আজিজ। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেয় শেরপুর-সাদিপুরে। তারা এখানে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিরোধযুদ্ধ করে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন মো. আজিজুর রহমান।

৮ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ সিলেট শহরে, একাংশ খাদিমনগরে এবং আরেকটি অংশ আম্বরখানা ও ওয়্যারলেস স্টেশনে ছিলেন। সেদিন রাতেই তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন।

সিলেটের খাদিমনগরে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। আম্বরখানায় সারা রাত যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ তখন ছিল সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে। তারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। পাকিস্তানি সেনা সংখ্যায় ছিল বিপুল। সে তুলনায় মুক্তিযোদ্ধা ছিল অনেক কম। রাত তিনটার দিকে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। দক্ষিণ তীরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারাও ব্যাপক গোলাবর্ষণের মুখে পড়েন।

চার ঘণ্টা যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনারা সিলেট শহর দখল করে নেয়। কিন্তু সেতুর দক্ষিণ প্রান্তে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি এলএমজি পোস্ট। ওই স্থান তখনো মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা বিরামহীনভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এতে এলএমজিম্যান শহীদ হন। তখন মো. আজিজুর রহমান নিজেই এলএমজি দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁর সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা অনেকক্ষণ নদী পারাপারে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে অনিবার্য অবস্থা নেমে আসে।

এ সময় মো. আজিজুর রহমান জানতে পারেন, তাঁর ডান দিকের আরআর চালনাকারী দল অবস্থান ছেড়ে চলে গেছে। তখন তিনি দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখতে পান, আরআরটি একটি জিপে পড়ে আছে। চালকও উধাও। এ অবস্থায় তিনি নিজেই ওই গাড়ি চালিয়ে তাঁর কমান্ড পোস্টে যেতে উদ্যত হন। তখনই পাকিস্তানি সেনারা সরাসরি জিপের ওপর গোলাবর্ষণ করে। জিপটি নদীর ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তিনি আহত হন।

আহত আজিজুর রহমান এরপর পেছনে যান। সেখানে তাঁর দেখা হয় পশ্চাদপসরণরত কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত। পরে ওই সহযোদ্ধারা পালিয়ে যান। তিনি এতে বিচলিত হলেন না।

মো. আজিজুর চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর তিনি ৩ নম্বর সেক্টরের আশ্রমবাড়ি/বাঘাইছড়ি সাবসেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। পরে এস ফোর্সের ব্রিগেড মেজর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নুরুল আমিন, বীর উত্তম

গ্রাম পাশাকোট, উপজেলা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বাবা বাদশা মিয়া, মা আপ্রাবের নেছা। স্ত্রী দেলোয়ারা আক্তার। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫।

রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বড় এক ঘাঁটিতে। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। আকাশ রক্তিম হয়ে উঠল। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে মো. নুরুল আমিন। যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলির মধ্যেই সহযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন ঘাঁটির প্রায় ভেতরে। তাঁর সাহস দেখে পাকিস্তানি সেনারা তখন হতভম্ব। সেখানে মুখোমুখি যুদ্ধ চলতে থাকল। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হলেন মো. নুরুল আমিন। কিন্তু মনোবল হারালেন না। ১৯৭১ সালের ১৭ জুলাই দুর্গাপুরে এ ঘটনা ঘটে।

দুর্গাপুর কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত। মে মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে। এই ঘাঁটির কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা কমে যায়। ১৬ জুলাই মধ্যরাতে (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ১৭ জুলাই) মো. নুরুল আমিন একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সেখানে আক্রমণ চালান। সংখ্যায় তাঁরা অনেক হলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ছিলেন কম। বেশির ভাগ কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবক। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে তাঁদের অনেকে আহত হলে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ছিল বেশ সুরক্ষিত। চারদিকে বাংকার। তারা সেই বাংকারে অবস্থান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে তাদের তেমন ক্ষতি না হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু মো. নুরুল আমিন দমে যাননি। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটির প্রায় ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন শুরু হয় মুখোমুখি যুদ্ধ। মুখোমুখি যুদ্ধে তাঁর দলের অনেকে শহীদ ও আহত হন। তবু তাঁরা পিছু না হটে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি নিজেও আহত হন। তাঁর পেটে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়। ওই অবস্থাতেও তিনি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে পড়লে পরে সহযোদ্ধারা তাঁকে পাঠিয়ে দেন নিরাপদ স্থানে।

দুর্গাপুরে সকাল পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বেয়নেট যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি দখল করতে না পারলেও তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

মো. নুরুল আমিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মার্চ মাসে তাঁর কোম্পানিকে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে মোতায়েন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সুবেদার আলতাফ আলীর (বীর উত্তম, বীর প্রতীক) নেতৃত্বে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। রৌমারী এলাকায় অবস্থান নিয়ে অনেক যুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে পলাশবাড়ী, কাঁটাখালী সেতু, রাজীবপুর, কুড়িগ্রাম ও উলিপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. শাহজাহান ওমর, বীর উত্তম

গ্রাম রাজাপুর, উপজেলা রাজাপুর, ঝালকাঠি। বর্তমান ঠিকানা ৫৪ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা। আবদুল হামিদ, মা লালমন বেগম। স্ত্রী মেহজাবিন ফারজানা ওমর। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। সনদ নম্বর ১৯।

১৯৭১ সালের ১২ নভেম্বর। রাতে মো. শাহজাহান ওমরসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা নৌকাযোগে রওনা হন চাচৈরের উদ্দেশে। জায়গাটির অবস্থান ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায়। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তিনি তাঁদের সার্বিক নেতৃত্বে। ভোরে সবার আগে তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ পৌঁছান চাচৈরের কাছে। পৌঁছেই তিনি খবর পান যে ওই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এসেছে। তারা কয়েকটি বাড়িতে আগুন দিয়ে আশপাশেই অবস্থান নিয়েছে।

শাহজাহান ওমর সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা সবার অস্ত্র। থেমে থেমে সারা দিন ধরে যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। সন্ধ্যার পর পাকিস্তানি সেনারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে যায়। কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে একজন (আউয়াল) শহীদ ও দু-তিনজন আহত হন।

পরদিন ১৪ নভেম্বর সকালে বরিশাল ও ঝালকাঠি থেকে নতুন সেনা এসে যোগ দেয় চাচৈরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আগের দলটির সঙ্গে। মো. শাহজাহান ওমর এতে বিচলিত হননি, মনোবলও হারাননি। সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁকে দেখে উজ্জীবিত হন অন্য সব সহযোদ্ধা।

ওমর পুরোভাগে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা বিপুল শক্তি নিয়েও তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। ১৪ নভেম্বরও সারা দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। শেষের দিকে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে থাকে। খাল পার হতে গিয়ে আরও কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রাণ হারায়।

সন্ধ্যার পর রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সেনারা একেবারে পালিয়ে যায়। কয়েকজন মূল দলের সঙ্গে পালাতে না পেরে লুকিয়ে ছিল একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের খুঁজে বের করার পর আটক করে। এই যুদ্ধের সংবাদ তখন আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সেনাকর্মকর্তা মো. শাহজাহান ওমর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শিয়ালকোটে কর্মরত ছিলেন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে যান এবং যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাবসেক্টরের বরিশাল বেইজের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি বরিশাল এলাকায় একের পর এক পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের দিশেহারা করে তোলেন। চাচৈর যুদ্ধের কয়েক দিন পর রাজাপুরের যুদ্ধে তিনি আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাহার উল্লাহ, বীর উত্তম

গ্রাম ভালুকা, উপজেলা মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
বাবা আলী আজম, মা খায়রুননেছা। স্ত্রী দেল আফরোজ।
তাঁদের এক ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫০। মৃত্যু ২০০৮।

রাতের অন্ধকারে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মোজাহার উল্লাহ উপস্থিত হলেন নদীর তীরে। বর্ষণমুখর রাত। গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। মোজাহার উল্লাহ সহযোদ্ধাদের প্রস্তুত করে নামিয়ে দিলেন পানিতে। তিনিসহ কয়েকজন নদীর তীরে থাকলেন সহযোদ্ধাদের নিরাপত্তায়। মধ্যরাতে পানি তোলপাড় করে বিকট শব্দে নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে পড়ল। একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকল মাইন। জাহাজগুলো বাজাতে থাকল সাইরেন। এ ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম বন্দরে ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট। তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ১৬ আগস্ট।

নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন মোট ৬১ জন। তিনটি দলে বিভক্ত। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মোজাহার উল্লাহ। ভারত থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা চট্টগ্রামে পৌঁছান। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল ২০ কেজি ওজনের বোঝা। লিমপেট মাইন, ফিনস, গ্রেনেড, বিস্ফোরক, শুকনা খাবারসহ অন্যান্য সামগ্রী। অর্ধেক পথ তাঁরা হেঁটে যান। তিনটি দলের মধ্যে একটি দল চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। তারা সীতাকুণ্ডে আটকা পড়ে। মোজাহার উল্লাহ তাঁর দল নিয়ে নির্ধারিত সময়ে চট্টগ্রামে পৌঁছান।

AMARBOI.COM

১৫ আগস্ট রাতে নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের গোপন শিবির থেকে বেরিয়ে কর্ণফুলী নদীর তীরে বন্দরের অপর পাড়ে সমবেত হন। শেষ মুহূর্তে তিনজন নৌ-মুক্তিযোদ্ধা অপারেশনে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭। আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (বীর উত্তম-বীর বিক্রম), মোজাহার উল্লাহ, শাহ আলম (বীর উত্তম) এবং খোরশেদ আলম (বীর প্রতীক) নদীর তীরে বিভিন্ন স্থানে পাহারায় থাকেন।

নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা পানিতে নেমে সাঁতরে নির্দিষ্ট টার্গেটে (জাহাজ, বার্জ প্রভৃতি) সফলতার সঙ্গে লিমপেট মাইন লাগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যান। আধা ঘণ্টা পর থেকে মাইনগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকে। সেদিন তাঁদের অপারেশনে প্রায় ১০টি টার্গেট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস বা নিমজ্জিত হয়। এর মধ্যে ছিল এমভি আল আব্বাস, এমভি হরমুজ জাহাজ, মৎস্য বন্দরে নোঙর করে রাখা বার্জ ওরিয়েন্ট, নৌবাহিনীর দুটি গানবোট ও একটি পন্টুন। এ ছাড়া ছিল ছোট-বড় আরও কয়েকটি বার্জ।

মোজাহার উল্লাহ ১৯৭১ সালে বিমা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। মার্চ মাসে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। চট্টগ্রামের প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার পর যোগ দেন মুক্তিবাহিনীর নৌ উইংয়ে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁর বাবাকে আটক করে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ আবদুর রব, বীর উত্তম

গ্রাম কুর্শা-খাগাউড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
বাবা মনোয়ার আলী, মা রাশিদা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ০১। মৃত্যু ১৪ নভেম্বর ১৯৭৫।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে ১৯৭০ সালে অবসর নেওয়ার পর মোহাম্মদ আবদুর রব (এম এ রব) রাজনীতিতে যুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় বৃহত্তর সিলেট জেলায় প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রতিরোধযুদ্ধকালে এম এ রবের ভূমিকার বর্ণনা পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জন দত্তের (বীর উত্তম) ১৯৭৩ সালের বয়ানে। তিনি বলেন, '২৭ মার্চ আমার বাড়িতে (হবিগঞ্জ) কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে বলল, "দাদা, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।" আমি বললাম, আমিও তাই চাই।...আমি তাদের বললাম, কর্নেল রব যদি আমাকে বলেন, তাহলে আমি এই মুহূর্তেই প্রস্তুত।

'সেদিনই বেলা প্রায় দুইটায় কর্নেল রব আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখলাম, কামরার ভেতরে বসে আছে আনসার-মুজাহিদসহ সামরিক বাহিনীর কয়েকজন। বাইরে খোলা জায়গায় অনেক ভিড়। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ১৫০ জনের মতো লোক তৈরি। কয়েকটি বাস-ট্রাক এক পাশে।

'ঘরে ঢুকতেই জেনারেল [কর্নেল] রব আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বললেন, "আজই পাঁচটায় যে লোকবল আছে, তাঁদের নিয়ে সিলেটকে মুক্ত করার জন্য যাত্রা করব।" তিনি যুদ্ধ পরিচালনার ভার আমাকে দিলেন।...আমি, মানিক চৌধুরী ও কর্নেল রব একই গাড়িতে বসেছিলাম। সেদিন আমাদের গন্তব্য ছিল রশীদপুর চা-বাগান। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত প্রায় ১১টা বেজেছিল।'

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, শেরপুর-সাদিপুর ও সিলেটসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তখন প্রতিরোধযুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে এম এ রব সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও পরিচালনাতেই বেশির ভাগ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় (৪ ও ১০ এপ্রিল) হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় প্রতিরোধযুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠক আয়োজনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। এরপর মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন কর্নেল এম এ জি ওসমানী (পরে জেনারেল)। তাঁর অধীনে চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পান এম এ রব। তিনি পূর্বাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর সদর দপ্তর ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়।

১৪ ডিসেম্বর এম এ জি ওসমানী ও তিনি হেলিকপ্টারযোগে সিলেটে যুদ্ধ এলাকা পরিদর্শনকালে ফেঞ্চুগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল ওই হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি করে। তখন তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তাঁর পায়ে গুলি লাগে। পরে আগরতলায় তাঁর চিকিৎসা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, বীর উত্তম

গ্রাম কামালপুর, উপজেলা চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা মো. নাজিবুল্লাহ, মা শামসুন নাহার।
স্ত্রী মাহফুজা মঞ্জুর। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ০৮। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে সংঘটিত সেনা অভ্যুত্থানের পর নিহত।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৮ নম্বর সেক্টর ছিল যুদ্ধবহুল গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। এর আওতাধীন এলাকা ছিল বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা এবং ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ। ১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট থেকে এই সেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুরের নেতৃত্বে। দুই-তিনটি যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে খুলনা জেলার শিরোমণির যুদ্ধ অন্যতম। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করলেও খুলনায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা সেদিন আত্মসমর্পণ করেনি। ১৬ ডিসেম্বর রাতে সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে মুক্তিযুদ্ধকালে ওয়ার করসপনডেন্ট মুসা সাদিকের লেখায়। তিনি লিখেছেন : '...যশোর-খুলনার প্রবেশদ্বার শিরোমণিতে ট্যাংক নিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুখোমুখি হন মঞ্জুর (মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর) ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১০৭ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার হায়াৎ খান।

'মিসরের বুকে রোমেল-মন্টগোমারীর সেই বিশ্বখ্যাত আল-আমিন ট্যাংক ব্যাটলের কথা বহুবার পড়েছি। চাক্ষুষ দেখলাম শিরোমণির ট্যাংক ব্যাটল। সেই বিভীষিকাময় রাতে কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকসহ আমি ছিলাম শিরোমণিতে।

'রাত যত বাড়ছিল, যুদ্ধের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গোলার আঘাতে গাছপালাও ভেঙে পড়তে থাকে। ক্যাজুয়ালিটির পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এই দীর্ঘ রক্তাক্ত মরণযুদ্ধের সমাপ্তি টানার জন্য মঞ্জুর নিজের ওপর রিস্ক নিলেন।

'চারদিকে কামানের গোলা, ট্যাংকের গর্জন। তার মধ্যে দিয়ে এসএলআর উঁচিয়ে একজনের হাত সবার আগে উঁচু হয়ে ছুটছে। সেটি কমান্ডো মেজর মঞ্জুরের।

'হায়াৎ খানের কামানের গোলা, ট্যাংকের গর্জন আর মর্টার শেলিংয়ের ট্যাংক বূহ্যের মধ্যে বজ্রের কড়কড়ে আওয়াজে উল্কার বেগে ঢুকে গেলেন মঞ্জুর তাঁর সুইসাইডাল স্কোয়াড নিয়ে। পাকিস্তানি কর্নেল ব্রিগেডিয়ারদের বিস্ময় ঘোর কাটতে না-কাটতে চোখের নিমেষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল হায়াৎ খানের ডিফেন্স।

'চোখে না দেখলে এটা কীভাবে সম্ভব হলো কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। সে জন্যই বোধ হয় ভারতের দেরাদুন আর্মি একাডেমি ও ব্রিটিশ স্যান্ডহার্টস আর্মি একাডেমিসহ অন্যান্য দেশের আর্মি একাডেমিতে ট্যাংক ব্যাটল অব শিরোমণির ওপর একটা চ্যাপ্টারই পড়ানো হয়।'

মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। জুলাই মাসে সেখান থেকে কয়েকজনসহ পালিয়ে ভারতে আসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার, বীর উত্তম

জন্ম বগুড়া। বাবা এম এইচ শাহ। স্ত্রী শিরিন বাশার। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সবাই বিদেশে বসবাস করেন। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৯। ১৯৭৭ সালে প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত।

মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার জুন মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর ৬ নম্বর সেক্টরে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বৃহত্তর রংপুর ও বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে ছিল এ সেক্টর। এর অধীনে অসংখ্য যুদ্ধ হয়। এই সেক্টরের বেশ কয়েকটি সাবসেক্টর ছিল এবং এগুলোর অবস্থান ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ডে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তা দখল করতে পারেনি।

খাদেমুল বাশারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় ৬ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসংখ্য অপারেশন করেন। এর মধ্যে নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংঘটিত ভুরুঙ্গামারীর যুদ্ধ একটি। ৬ নম্বর সেক্টরে গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আখতারুজ্জামান মণ্ডল। তিনি একটি দলের দলনেতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর বইয়ে খাদেমুল বাশারের কথা আছে। তিনি লিখেছেন,

'সেক্টর কমান্ডার এম কে বাশার ৬ নম্বর সেক্টরের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অবিচল আস্থা অর্জন করেছিলেন।...রোজা শুরু হওয়ার আগের দিন দুপুরের পর তিনি আমাদের ঘাঁটিতে এলেন। ভুরুঙ্গামারীর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর আক্রমণ অভিযান পরিকল্পনার জন্য সন্ধ্যার কিছু আগেই সাবসেক্টর অফিসে ক্যাপ্টেন নওয়াজিশসহ আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

'সেক্টর কমান্ডারের পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী রোজার আগের রাতে ভুরুঙ্গামারীর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। রাত নয়টায় অভিযানে অংশগ্রহণকারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আবেগময় বক্তৃতা করলেন। "জয় বাংলা, বাংলার জয়" এবং "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি" গানটি টেপ রেকর্ডারে বাজিয়ে শোনানো হলো।

'অভিযানে অংশগ্রহণকারী দেড় শ মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি হাত মেলালেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আদর করলেন।...অপারেশন থেকে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এক মুহূর্তও স্থির হয়ে বসে থাকেননি। যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন সময় তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ অসাধারণ কৃতিত্বের প্রমাণ আমরা পেয়েছি।'

মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে রাডার স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে। পদবি ছিল উইং কমান্ডার। ১৯৭১-এর মে মাসের শুরুতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে পালিয়ে ভারতে যান এবং যুদ্ধে যোগ দেন।

তিনি স্থলযুদ্ধে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁকে মুক্তিবাহিনীর ৬ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম

গ্রাম নাওড়া, উপজেলা শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
বাবা আশরাফউল্লাহ, মা রহিমা বেগম।
স্ত্রী রুবি ইসলাম। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১১।

চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের অবদান অসামান্য। তাঁর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় বাঙালি ইপিআর সেনারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

এখন জানা যাক রফিকুল ইসলামের নিজ বয়ানে কিছু কথা: '২৫ মার্চ ১৯৭১, বৃহস্পতিবার। অন্যান্য দিনের মতো সকাল সাতটায় অফিসে গেলাম। সেখানে পৌঁছেই দেখি পাকিস্তানি মেজর ইকবাল বসে আছেন।...সেদিন বেলা দুইটায় ইপিআর সদর দপ্তর ত্যাগ না করা পর্যন্ত মেজর ইকবাল আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করল।

'চারটা ৩০ মিনিটের দিকে ডা. জাফর আমার বাসায় এলেন।...রাত আটটার দিকে তিনি ঢাকার কোনো সংবাদ এসেছে কি না জানার জন্য আওয়ামী লীগ অফিসে গেলেন। (রাতের খাবার) খাওয়া শুরু করেছি, এ সময় একজন আওয়ামী লীগ কর্মীসহ তিনি ফিরে এলেন। (ডা. জাফর বলেন) "মনে হচ্ছে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে করাচি গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সেনারা ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।"...আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম।

'সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে থাকলে নিশ্চয় ভয়ানক কিছু ঘটাবে। ...২৫ মার্চ সন্ধ্যায় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম ইপিআরের দুটি ওয়্যারলেস সেটই ঢাকার পিলখানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না। এমন কোনো দিন ঘটেনি। সন্দেহ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল।

'এ সময় নিজের ভেতর থেকে আমি যেন এক অলৌকিক সাহস অনুভব করলাম। মনে হলো, আমার ভেতর থেকে কে যেন আমাকে বলছে নিজের জীবন ও অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য পশুশক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।..."হয় স্বাধীনতা অর্জন, না হয় ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু"—এ ধরনের এক চরম সিদ্ধান্ত নিলাম। ডা. জাফরকে বললাম, আমাদের জনগণকে মুক্ত করার জন্য আমি আমার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করব।

'রাত আটটা ৪৫ মিনিট। আমি শেষবারের মতো আমার সারসন রোডের বাসভবন ত্যাগ করলাম। ওয়্যারলেস কলোনির দিকে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল।...ক্যাপ্টেন হায়াতের রুমের সামনে জিপ থামালাম। সাবধানে তার কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। খুব আস্তে দরজা নক করলাম। বন্ধুসুলভ গলায় বললাম, "হ্যালো হায়াত, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?" আমার গলার স্বর চিনতে পেরে সে আলো জ্বালাল। আমি দরজা খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।...আমি স্টেনগান তাঁর বুকে ধরে বললাম, "আমি দুঃখিত হায়াত, তোমাকে গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে।" সে তার পিস্তল বের করে ধরলে ড্রাইভার কালাম (বাঙালি) দ্রুত এগিয়ে আসে। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রথম কাজ সমাধা হলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিয়াকত আলী খান, বীর উত্তম

আমলাপাড়া, সরাই রোড, বাগেরহাট পৌরসভা। বর্তমান ঠিকানা উত্তরা, ঢাকা। বাবা আতাহার আলী খান, মা আজিজা খাতুন। স্ত্রী নাজমা আনোয়ার বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৩।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ গৌরীপুরের যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর সেখানে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গৌরীপুর সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার (তখন থানা) অন্তর্গত। কানাইঘাটে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক অবস্থান। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল তাদের ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট।

জকিগঞ্জ, আটগ্রাম, চারগ্রাম দখলের পর মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকেন সিলেট অভিমুখে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলে ছিলেন লিয়াকত আলী খান। ২৫ নভেম্বর তাঁরা কানাইঘাট থানা সদরের দুই মাইল অদূরে গৌরীপুরে পৌছান। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি দলে বিভক্ত। কানাইঘাটে আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁরা গৌরীপুরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন।

২৬ নভেম্বর ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিতে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে (আলফা কোম্পানি) আক্রমণ করে। এ রকম অবস্থায় পাল্টা আক্রমণ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরও তাঁদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। আক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা দলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান (বীর উত্তম) একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শাহাদাতবরণ করেন। এ অবস্থায় লিয়াকত আলী খান যুদ্ধক্ষেত্রে অধিনায়কের দায়িত্ব পান।

এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মদের (বীর বিক্রম, পরে মেজর) ভাষ্যে। তিনি বলেন, 'ভোরে পাকিস্তানি ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আমাদের "এ" কোম্পানির পজিশনের ওপর আক্রমণ করে। "এ" কোম্পানি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়।'

'এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের একজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেনসহ ১০০ জন সৈন্য নিহত হয়। আমাদের পক্ষে ক্যাপ্টেন মাহবুবসহ ১০-১১ জন শহীদ এবং প্রায় ২০ জন আহত হন। ক্যাপ্টেন মাহবুব শহীদ হওয়ার পর তদস্থলে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী ওই কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত হন। তিনি সাবেক পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিলেন। এ ধরনের পদাতিক যুদ্ধে তাঁর কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। একটু পরে তিনি শত্রুর বুলেটে আহত হন। আহত অবস্থায়ই তিনি অনেকক্ষণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।'

লিয়াকত আলী খান ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের শেষে বাবার অসুস্থতার কথা বলে বাংলাদেশে আসেন। কয়েক দিন পর ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কিছুদিন পর তাঁকে নিয়মিত বাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

লিয়াকত আলী খানকে ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। পরে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করেন। এরপর বাংলাদেশ বিমানে বৈমানিক হিসেবে চাকরি নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীফুল হক, বীর উত্তম

পৈতৃক ঠিকানা ৪২২ মালিবাগ, ঢাকা। বাবা শামসুল চৌধুরী। স্ত্রী ফৌজিয়া চৌধুরী। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। বর্তমানে পলাতক।

দিলকুশা চা-বাগান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি ছিল এখানে। এর অবস্থান ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে চার মাইল দূরে। এ এলাকা ছিল মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাবসেক্টরের অধীনে।

জুলাই-আগস্ট মাসের একদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সার্বিক নেতৃত্ব দেন শরীফুল হক। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রতিটি দল ছিল ১২ জনের। প্রত্যেক দলে ছিল দুটি এলএমজিসহ অন্যান্য অস্ত্র। তিনটি উপদল কাট অফ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

পরিকল্পনামতো মুক্তিযোদ্ধারা কুকিতল থেকে রাতে রওনা দেন। রাত দুইটায় লাঠিটিলায় পৌছান। ভোর পাঁচটার দিকে দিলকুশা চা-বাগানের পাকিস্তানি ঘাঁটির ৫০ গজ দূরে অবস্থান নেন। নির্দিষ্ট সময় শুরু হয় আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধাদের একেক দল একেক স্থানে অবস্থান নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে।

কথা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সব দল নির্দিষ্ট এলাকা দখলের পর সংকেত পাওয়ামাত্র গোলাগুলি বন্ধ করবে। কিন্তু দুটি দল গুলি বন্ধ করতে দেরি করে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের এক দল অপর দলকে পাকিস্তানি সেনা মনে করে গোলাগুলি অব্যাহত রাখে। নিজেদের গুলিতে তাঁরা নিজেরাই কয়েকজন আহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল বিপর্যয় এড়াতে পেছনে হটে যায়। এ ঘটনায় শরীফুল হক মুক্তিযোদ্ধাদের ভর্ৎসনা করেন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এর জন্য তাঁকেই দোষারোপ করে। ফলে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আরও ভুল-বোঝাবুঝি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এ দুর্বল মুহূর্তে পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ চালায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি উপদল পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ে মধ্যে পড়ে। কয়েকজন ঘেরাও থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হলেও বাকিরা শহীদ হন। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও প্রায় ১৩ জন আহত হন। তাঁরা ফিরে যান শিবিরে। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দুদিন পর শরীফুল হক সহযোদ্ধাদের নিয়ে আবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই ঘাঁটিতে যান। প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে তাঁর হাতের আঙুলে গোলার স্প্লিন্টার লাগে। মধ্যমা, তর্জনী ও অনামিকা উড়ে যায়। তাঁর সঙ্গে থাকা পথপ্রদর্শক শহীদ হন। আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। এ দিনও ব্যর্থ হয় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ।

শরীফুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১-এ পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। বর্তমানে পলাতক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল আলম, বীর উত্তম

গ্রাম পাতিলাপাড়া, উপজেলা বাউফল, পটুয়াখালী। বর্তমান ঠিকানা ট্রেলিস গার্ডেন, ৩৩ সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ, বারিধারা, ঢাকা। বাবা আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, মা শামসুন নাহার বেগম। স্ত্রী শামীম আলম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬১।

শামসুল আলম ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে। চাকরি করতেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোনোভাবেই তা সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সুযোগ এল শেষ পর্যন্ত জুন মাসের দিকে। এই সময় তিনি কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে করাচিতে আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে কৌশলে চলে আসেন ঢাকায়। কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হলো না। ঢাকায় আসামাত্র তাঁকে আটক করা হয়।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালে আটক বন্দীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। শামসুল আলম এর আওতায় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পান। এর কয়েক দিন পর তিনি ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

তখন ভারতে সবে শুরু হয়েছে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং গঠনের প্রক্রিয়া। সেখানে যাওয়ার পর শামসুল আলমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিমান উইংয়ে।

তিনি অপারেশন করেন চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে। ভারতের কমলপুর থেকে তিনি ও আকরাম আহমেদ অটার বিমান নিয়ে যাত্রা শুরু করেন চট্টগ্রামের উদ্দেশে। এই বিমানে কাঁটা কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়ের আর কোনো আধুনিক সরঞ্জাম ছিল না। এ জন্য তাঁদের বলা হয়েছিল, চট্টগ্রাম অপারেশনে যাওয়ার সময় তাঁরা যেন তেলিয়ামুড়ার ওপর দিয়ে উড়ে যান এবং সেখানে উপস্থিত হলে বিমানের দৃশ্যমান বাতিগুলো যেন তাঁরা কয়েকবার জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে দেন। তখন প্রত্যুত্তরে নিচ থেকে মশালবাতি জ্বালানো হবে। এতে বোঝা যাবে, বিমানটি সঠিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। পথচ্যুতি ঘটলে তাঁরা সঠিক পথ নির্ধারণ করে নিতে পারবেন।

AMARBOI.COM

শামসুল আলম ও আকরাম আহমেদ চট্টগ্রামের উপকূল রেখা বরাবর উড়ে যথাসময়ে পৌঁছান ইস্টার্ন রিফাইনারির তেলের আধারগুলোর কাছে। আক্রমণের নির্ধারিত সময় ছিল মধ্যরাত। ঠিক রাত ১২টা এক মিনিটে গর্জে ওঠে তাঁদের বিমানে থাকা রকেটগুলো। প্রথম দুটি রকেট তেলের ডিপোতে নির্ভুল নিশানায় আঘাত হানে। মোট চারবার তাঁরা সেখানে আক্রমণ চালান। সফল এই আক্রমণে ইস্টার্ন রিফাইনারির চারদিকের তেলের ডিপোগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

সিদ্ধান্ত ছিল, শামসুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে একবারই আক্রমণ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, প্রথম আক্রমণে মূল লক্ষ্যস্থলে রকেট নির্ভুল নিশানায় আঘাত হানলেও বেশ কয়েকটি তেলের ডিপো তখনো অক্ষত। তাঁদের কাছে মজুত আছে বেশ কয়েকটি রকেট। তখন তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধা সিদ্ধান্ত নেন পুনরায় আক্রমণের। পরের আক্রমণ ছিল তখনো যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, ততক্ষণে নিচ থেকে শুরু হয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবর্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাহউদ্দিন আহমেদ, বীর উত্তম

গ্রাম দাসাদী, সদর উপজেলা, চাঁদপুর।
বাবা সাইদউদ্দিন আহমেদ, মা আলপুমান নেছা।
স্ত্রী সালমা আহমেদ। তাঁদের দুই মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৭। মৃত্যু ১৯৯৫।

৪ নভেম্বর সকালে চাঁদপুরে মেঘনা নদীর পাশে ছদ্মবেশে রেকি করছিলেন সালাহউদ্দিন আহমেদ। অক্টোবরের শেষে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা চাঁদপুর বন্দর এলাকায় কয়েকটি অপারেশন করেন। ফলে তখন জাহাজ চাঁদপুর বন্দরে না ভিড়ে দূরে বিভিন্ন স্থানে নোঙর করত। সেদিন সালাহউদ্দিন আহমেদ খবর পান এখলাসপুরের কাছে এমভি সামিসহ দুটি জাহাজ নোঙর করে আছে। খবর পেয়ে তিনি গোপন শিবিরে ফিরে যান। দুটি লিমপেট মাইন, একটি স্টেনগানসহ সহযোদ্ধা শাহজাহান কবির (বীর প্রতীক) ও সেলিমউল্লাহ খানকে নিয়ে একটি নৌকাযোগে এখলাসপুরে রওনা হন। গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন জাহাজ দুটি সেখানে ভেড়েনি। অদূরে জহিরাবাদ এলাকায় নোঙর করেছে।

তাঁরা এরপর মেঘনা নদীর তীরে থাকা একটি ছইযুক্ত পালতোলা বড় নৌকায় জোরপূর্বক উঠে পড়েন। মাঝিদের দিকে স্টেনগান তাক করে সাবধান করে দেন, তাঁরা যেন টুঁ শব্দ বা কোনো ছলচাতুরী না করে। তাঁদের নির্দেশে মাঝিরা জাহাজের দিকে রওনা দেয়।

নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা কাছাকাছি গিয়ে দেখেন জাহাজের ডেকে তিন-চারজন পাকিস্তানি সেনা অস্ত্র হাতে পাহারায় নিযুক্ত। বাকিরা গল্পগুজব করছে। তখন আনুমানিক দুপুর একটা। দুঃসাহসী সালাহউদ্দিন আহমেদ আর দেরি না করে শাহজাহান কবিরকে নিয়ে নৌকার পেছন দিয়ে পানিতে নেমে পড়েন। তাঁদের বুকে গামছা দিয়ে বাঁধা লিমপেট মাইন। অপর সহযোদ্ধা সেলিম অস্ত্র হাতে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য নৌকায় থাকেন।

সালাহউদ্দিন ও শাহজাহান প্রহরারত পাকিস্তানিদের সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে জাহাজের কাছে যান। সফলতার সঙ্গেই জাহাজের গায়ে মাইন লাগান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইন বিস্ফোরিত হয়। পাকিস্তানি সেনা, তাদের সহযোগী এবং নাবিক-লস্কররা ছোটাছুটি শুরু করে। জাহাজের সাইরেন বাজতে থাকে। মেঘনা নদীতে তখন অনেক জেলে মাছ ধরছিল। তাঁরা দ্রুত নৌকার পাল তুলে ভাটির দিকে পালিয়ে যায়। নৌকাশূন্য হয়ে পড়ে মেঘনা নদী। ক্ষতিগ্রস্ত এমভি সামি অতল পানির নিচে হারিয়ে যায়।

সালাহউদ্দিন আহমেদ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে সেপাই হিসেবে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেক্টরের অধীন হালিশহরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। কয়েকটি প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নিয়ে নিজ গ্রামে যান। এপ্রিল মাসের শেষে ভারতে যান। ভারতের হাতিমারা যুবক্যাম্পে তিনি কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌকমান্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্য অপারেশন জ্যাকপটসহ এমভি লোরেম, সোবহান, গফুর, লিলি আক্রমণ প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতান মাহমুদ, বীর উত্তম

দাগনভূঞা, ফেনী। বর্তমান ঠিকানা বাসা ১০, সড়ক ৫০, গুলশান ২, ঢাকা। বাবা নূরুল হুদা, মা আক্কুরের নেছা। স্ত্রী ফেরদৌস আরা মাহমুদ। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬০।

সুলতান মাহমুদ ১৯৭১ সালে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মৌরীপুর বিমানঘাঁটিতে। এর অবস্থান করাচিতে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি মে মাসে সেখান থেকে শ্রীলঙ্কা, ঢাকা হয়ে ভারতে যান। ভারতে যাওয়ার পথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে আটকের চেষ্টায় তাড়া করে। এ অবস্থায় দাউদকান্দি ফেরিঘাটের কাছে তিনি সাঁতরে মেঘনা নদী পার হন। অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতে পৌঁছান।

তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরে। পরে ১ নম্বর সেক্টরে। বেশ কয়েকটি অপারেশনে তিনি সাহসের সঙ্গে অংশ নেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামের মদুনাঘাট বিদ্যুৎ সাবস্টেশন ধ্বংসের অপারেশন উল্লেখযোগ্য।

মদুনাঘাট বিদ্যুৎ স্টেশনটির অবস্থান চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কের হালদা নদীর পশ্চিম পাশে। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল। সাবস্টেশনের চারদিকের বাংকারে ছিল তাদের অবস্থান। অক্টোবর মাসের শেষে একদিন সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অতর্কিতে আক্রমণ করেন। তাঁদের আক্রমণে সাবস্টেশনটি ধ্বংস হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে সুলতান মাহমুদ আহত ও তাঁর এক সহযোদ্ধা শহীদ হন। সেদিন তিনি যথেষ্ট রণকৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

AMARBOI.COM

এরপর তিনি আর স্থলযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। কয়েক দিন পর সুলতান মাহমুদকে বিমান উইংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের মাধ্যমে প্রথম যে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়, এর একটির দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় গোদনাইল অপারেশন। এ অপারেশনে তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন বদরুল আলম (বীর উত্তম)। তাঁরা একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের সাহায্যে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেলের ডিপোতে আক্রমণ চালান। তাঁরা হেলিকপ্টার থেকে ১৪টি রকেট নিক্ষেপ করে ইএসএসওর দুটি তেলের ডিপো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন। আরও কয়েকটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুলতান মাহমুদ পরে সিলেট, কুলাউড়া, কুমিল্লা, ভৈরব, শমশেরনগরসহ আরও কয়েকটি জায়গায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে আক্রমণে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি ও শাহাবউদ্দীন আহমেদ (বীর উত্তম) একদিন হেলিকপ্টারে চেপে সিলেট শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বিমানবন্দরে অবতরণ করা মাত্র তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়েন। হেলিকপ্টারে কয়েকটি গুলি লাগে। সুলতান মাহমুদ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে হেলিকপ্টারটি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

সুলতান মাহমুদ স্বাধীনতার পর ধাপে ধাপে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত হন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন আহমেদ চৌধুরী, বীর উত্তম

চরখাই, আদিনাবাদ, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ১৪২, লেন ৪, ইস্টার্ন রোড, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা আবদুস সোবহান চৌধুরী, মা জাহানারা বেগম চৌধুরী। স্ত্রী নিঘাত হারুন। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে কর্ণফুলী নদীর তীরে কালুরঘাট। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় এখানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন কয়েকটি দলে বিভক্ত। নদীর পশ্চিম ও পূর্ব তীরের একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন হারুন আহমেদ চৌধুরী।

চট্টগ্রাম শহর দখলের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড় দল অগ্রসর হয় কালুরঘাট অভিমুখে। ১১ এপ্রিল সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর্টিলারি, মর্টার ও নৌবাহিনীর গান ফায়ারের সাপোর্ট নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি আক্রমণ ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত, ব্যাপক ও সুবিন্যস্ত। সম্মুখভাগে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। আক্রমণের তীব্রতায় তাঁরা পেছনে কালুরঘাট সেতুতে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো খবর দিতে পারেননি।

এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয় সেতুর দিকে। হারুন আহমেদ চৌধুরী তাঁর দল নিয়ে ছিলেন সেতু এলাকায়। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের শিকার হন। একদম কাছাকাছি দূরত্বে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

হারুন আহমেদ চৌধুরী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেতুর পশ্চিম প্রান্তে ডান দিকে ছিলেন। এ সময় তিনি প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁর একেবারে সামনে পাকিস্তানি সেনারা দৃশ্যমান হয়। ভয়াবহ এক পরিস্থিতি।

মুক্তিযোদ্ধা সেখানে মাত্র ৩৫ জন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনা কমপক্ষে ১০০ জন। হারুন আহমেদ চৌধুরী বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে থাকলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না। পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একটি গুলি এসে লাগল তাঁর পেটে। সেতুর ওপর তিনি লুটিয়ে পড়েন।

হারুন আহমেদ চৌধুরী সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বেঁচে যান। গোলাগুলির মধ্যেই তাঁর দুই সহযোদ্ধা—লেফটেন্যান্ট এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান (বীর বিক্রম, পরে মেজর এবং ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ও দণ্ডিত) ও মুক্তিযোদ্ধা হাশমি মোস্তফা (তখন ছাত্র, পরে মেজর) তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী প্রেষণে ইপিআরে ছিলেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টরের অধীন ১৭ নম্বর উইংয়ের (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) সহ-উইং কমান্ডার হিসেবে। এর অবস্থান ছিল কাপ্তাইয়ে। ২৫ মার্চ রাতেই ১৭ উইংয়ে কর্মরত বাঙালি ইপিআর সদস্যরা তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে কালুরঘাটে সমবেত হন।

কালুরঘাট যুদ্ধে আহত হারুন আহমেদ চৌধুরীকে প্রথমে পটিয়ায়, পরে কক্সবাজার জেলার উখিয়াতে নেওয়া হয়। এর পর তিনি মিয়ানমারে যান। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ১ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালদার মো. আবদুল গাফফার, বীর উত্তম

গ্রাম আরাজি-সাজিয়ারা, উপজেলা ডুমুরিয়া, খুলনা। বর্তমান ঠিকানা ওয়ালসো টাওয়ার, বাংলামোটর,.ঢাকা। বাবা মোহাম্মদ কায়কোবাদ, মা রহিমা খাতুন। স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭। গেজেটে নাম এম এ গাফফার হালদার।

মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল একযোগে আক্রমণ চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন হালদার মো. আবদুল গাফফার (এম এ গাফফার হালদার)। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করছেন। পাকিস্তানি সেনারা প্রায় দিশাহারা। বিজয় প্রায় হাতের মুঠোয়। এ সময় হলো বিপর্যয়।

অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) সালদা নদী রেলস্টেশন দখল করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল ৭ অক্টোবর সালদা নদী ও এর আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা নয়নপুর থেকে সালদা নদী রেলস্টেশনে আশ্রয় নেয়। হালদার মো. আবদুল গাফফার তাঁর দল নিয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। তখন মেজর সালেক চৌধুরীর (বীর উত্তম) নেতৃত্বাধীন দলের গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেলে তাঁরা পেছনে সরে যেতে বাধ্য হন। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সেদিনের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর মেজর খালেদ মোশাররফ সালদা নদী দখলের দায়িত্ব অর্পণ করেন আবদুল গাফফারের ওপর। ৮ অক্টোবর তিনি তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আবার আক্রমণ চালান। সারা দিন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

পরদিন ৯ অক্টোবর আবদুল গাফফার যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করে নতুন পরিকল্পনা নেন। তাঁর এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়। প্রথমে এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দুটি দল সালদা নদী রেলস্টেশনে আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি শিকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সালদা নদী রেলস্টেশন মুক্তিযোদ্ধারা দখল করেন। পরবর্তী সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও ওই রেলস্টেশন পুনর্দখল করতে পারেনি।

হালদার মো. আবদুল গাফফার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ২৫ মার্চ তিনি অবস্থান করছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ২৭ মার্চ তাঁরা বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। মন্দভাগ সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে কে ফোর্সের অধীন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে বিলোনিয়া, ফেনী ও চট্টগ্রামের নাজিরহাট এলাকায় যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর বিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলি আহমদ, বীর বিক্রম

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা বাসা ১০২, পার্ক রোড, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা আমানত ছাফা, মা বদরুননেছা। স্ত্রী মমতাজ বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১।

প্রতিরোধযুদ্ধকালে অলি আহমদের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে দুই ভাগে ছিলেন। সামনে ও পেছনে ছিল তাঁদের প্রতিরক্ষা। অলি আহমদ জানতেন, পাকিস্তানি সেনারা সাধারণত আক্রমণ করে ভোরে, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, সেই সুযোগে। এ জন্য তিনি সহযোদ্ধাদের ভোর থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত বিশেষভাবে সজাগ ও যুদ্ধাবস্থায় রাখতেন।

২০ এপ্রিল সূর্য ওঠার আগে সহযোদ্ধা নায়েক ফয়েজ আহমদকে নিয়ে তিনি প্রতিরক্ষা তদারক করছিলেন। দেখতে দেখতে সামনে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান—সেখানে প্রতিরক্ষায় ছিলেন দুজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা নেই। এটি ছিল অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দলের প্রতিরক্ষার সবচেয়ে সামনের অবস্থান—ফরোয়ার্ড পোস্ট পজিশন। তিনি বিপদের গন্ধ পান। সব সহযোদ্ধাকে তিনি স্ট্যান্ড টু পজিশনে পুনর্বিন্যাস করেন। এই পজিশনকে সামরিক ভাষায় বলা হয় যুদ্ধাবস্থা।

এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই অলি আহমদ ফাঁকা রাস্তায় দেখতে পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি জিপ ও ট্রাকবহর। জিপ সামনে। ২০০ গজ দূরে থেমে শুরু করে ব্যাপক গোলাগুলি। এই আশঙ্কাতেই ছিলেন তিনি। এ জন্য সহযোদ্ধাদের আগেই প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে দ্রুত প্রত্যুত্তর পায় পাকিস্তানি সেনারা। অলি আহমদের ৫০ গজ দূরে মেশিনগান নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন দু-তিনজন সহযোদ্ধা। তাঁর নির্দেশে তাঁরা পাকিস্তানি বহরের একদম পেছনের গাড়ি লক্ষ করে গুলি ছোড়েন।

পাঁচ গজের মধ্যে এলএমজি নিয়ে পজিশনে ছিলেন তাঁর আরেক সহযোদ্ধা। তিনি তাঁকে বলেন জিপ লক্ষ্য করে গুলি করতে। গজ বিশেক দূরে ছিল মর্টার দল। তারা মাঝের ট্রাক লক্ষ্য করে মর্টারের গোলাবর্ষণ করে। তিনি নিজে আরআর দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আঘাত হানেন।

এ সময় অলি আহমদের নির্দেশে গর্জে ওঠে মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র। রাস্তার দুই ধার ছিল উন্মুক্ত। তারা পালাতেও পারেনি। বেশির ভাগ মারা পড়ে বা আহত হয়। খবর পেয়ে আরও পাকিস্তানি সেনা সেখানে আসে এবং যুদ্ধে যোগ দেয়। রাত ১০টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে।

অলি আহমদ ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনিস মোল্লা, বীর বিক্রম

গ্রাম খায়েরঘাটচড়া, ইউনিয়ন দাউদখালী, উপজেলা মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর। বাবা তছিমউদ্দিন মোল্লা, মা মজিতন নেছা। স্ত্রী আছিয়া বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০১। মৃত্যু ১৯৯৩।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে একদল মুক্তিযোদ্ধা রাতে সমবেত হন রায়গঞ্জে। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আনিস মোল্লা। তাঁরা রায়গঞ্জে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের একযোগে আক্রমণ করেন। তাঁদের অস্ত্রের গুলি ও নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডের আঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের এ আক্রমণ ছিল ভুরুঙ্গামারীতে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতির অংশ। কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ ও ভুরুঙ্গামারী। এ ঘটনার কয়েক দিন পর ১১ নভেম্বর রাতে তাঁরা ভুরুঙ্গামারীর এক দিক খোলা রেখে তিন দিক দিয়ে একযোগে আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে তাঁদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সেনারাও ছিল। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

১২ নভেম্বর সকাল আনুমানিক আটটায় মিত্রবাহিনীর বিমান ভুরুঙ্গামারীর পাশে পাটেশ্বরী রেলস্টেশনের পাকিস্তানি প্রতিরক্ষায় বিমান হামলা চালায়। ধ্বংস হয়ে যায় পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেলস্টেশন। হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। জীবিত ও আহত সেনারা পালিয়ে যায় ভুরুঙ্গামারী সদরে। তখন আনিস মোল্লার দলসহ মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দল ভুরুঙ্গামারীর পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়ে একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। ১৩ নভেম্বর সারা দিন যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যার পর রাতেও দুই পক্ষে গোলাগুলি চলে। শেষ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে গোলাগুলি স্তিমিত হয়ে যায়। ১৪ নভেম্বর ভোর হওয়ামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভুরুঙ্গামারীতে ঢুকে পড়েন।

AMARBOI.COM

আনিস মোল্লা চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রংপুর ইপিআর উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৬ এপ্রিল তিস্তা সেতুর যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়।

১২ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানি সেনারা আবার তিস্তা সেতুতে উপস্থিত হয়। ভারী অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে গোলা বর্ষণ করে। আনিস মোল্লা ও তাঁর সহযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ভারী অস্ত্রের গোলাগুলির মুখে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি। তারা পিছু হটে টগাইরহাট ও রাজারহাটে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সেনারা তিস্তা সেতু ও লালমনিরহাট দখল করে।

২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা তিস্তা ও লালমনিরহাট থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি করতে করতে কুড়িগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। তখন আনিস মোল্লা সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দেন। তবে বেশিক্ষণ তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের আটকে রাখতে পারেননি। কুড়িগ্রামের পতন হলে তাঁরা ভুরুঙ্গামারীতে আশ্রয় নেন। পরে ভারতে যান। ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফসার আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম জালাগারি, ইউনিয়ন মহদিপুর, উপজেলা পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা। বাবা কবেজ আলী। মা আছিয়া বেওয়া। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৫। শহীদ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১। গেজেটে শহীদ লেখা হয়নি।

সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজের পাশে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর, আফসার আলীসহ এক দল মুক্তিযোদ্ধা এই প্রতিরক্ষার মুখোমুখি হন। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি দলে বিভক্ত। তিনি ছিলেন 'ডি' দলে। আর এই দলটি ছিল একদম সামনে। পাকিস্তানিদের নাকের ডগায় পরিখা (ট্রেঞ্চ) খনন করে তাঁরা অবস্থান নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদেরই লোক ভেবে পাকিস্তানি সেনারা নির্বিকার থাকে। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের পোশাক ও হেলমেট ছিল পাকিস্তানিদের মতোই। এ ছাড়া পেছনে ও বাঁ দিকে খাদিমনগরে তখন যুদ্ধ চলছিল। এত তাড়াতাড়ি মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে উপস্থিত হবেন, পাকিস্তানিরা কল্পনাও করেনি। তারা কেউ কেউ চিৎকার করে পরিচয় জানতে চায়। আফসার আলীরা জবাব না দিয়ে নীরব থাকেন।

এ সময় সেখানে সামনের রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি গানবাহী পিকআপ ও দুটি জিপের কনভয় থামে। সেটা দেখে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের আর নিবৃত্ত করতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করেন। একটি জিপে আগুন ধরে যায়। তখন পাকিস্তানি সেনারা সম্বিৎহীন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছোটাছুটি করে। এ সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা মেশিনগান, হালকা মেশিনগানসহ অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু করেন।

এতে তাৎক্ষণিকভাবে ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। একটু পর পাকিস্তানিরাও পাল্টা আক্রমণ করে। নিমেষে সেখানে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা সর্বশক্তি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আফসার আলীরা বিপুল বিক্রমে পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তিনি অসাধারণ সাহসের পরিচয় দেন। মুখোমুখি যুদ্ধের একপর্যায়ে একঝাঁক গুলি ছুটে আসে তাঁর দিকে। কয়েকটি গুলি লাগে তাঁর দেহে। শহীদ হন তিনি।

সেদিন যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আফসার আলীসহ ২০ জন শহীদ ও ২১ থেকে ২২ জন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৭০ জন নিহত ও অসংখ্য আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের কাছে পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে কিছু আত্মসমর্পণ এবং বাকিরা শহরের দিকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে শহীদ আফসার আলীর মরদেহ সহযোদ্ধারা সমাহিত করেন শাহজালাল মাজারসংলগ্ন এলাকায়। তাঁর সমাধি চিহ্নিত।

আফসার আলী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে জেড ফোর্সের অধীনে ধলই বিওপি, আটগ্রাম, কানাইঘাটের গৌরীপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রব চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম নোয়াখোলা, উপজেলা চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা আকরাম উদ্দিন চৌধুরী, মা আকরামজান বানু।
স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁর তিন মেয়ে ও তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৩। শহীদ ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ২১ নভেম্বর ফেনী জেলার অন্তর্গত বেলুনিয়ার বেশির ভাগ এলাকা মুক্ত হয়। তারপর আবদুর রব চৌধুরীসহ মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হন ফেনী অভিমুখে। তাঁরা প্রথমে বিলুনিয়ার মুখবরাবর বান্দুয়া-পাঠাননগরে অবস্থান নিয়ে ওই এলাকা অবরোধ করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল মিত্রবাহিনীর জাঠ ও মারাঠা রেজিমেন্টের সেনারা।

পাঠাননগর-বান্দুয়া ছিল সীমান্ত এলাকা। মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল সীমান্তে ট্যাংকসহ অন্যান্য ভারী সামরিক যানবাহনের সরব চলাচল ও সেনাসমাবেশের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিস্মিত করা, যাতে তারা হকচকিত হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মিত্রবাহিনীর জাঠ রেজিমেন্টের সেনারা পশ্চিম সীমান্ত ও মারাঠা রেজিমেন্টের সেনারা পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে।

কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনীর অবস্থান বুঝে ফেলে। তারা দ্রুতগতিতে ফেনীর উত্তরে বিলুনিয়ার মুখবরাবর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করে। এ ছাড়া ছাগলনাইয়া-ফেনীর মাঝামাঝি ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত আরেক প্রতিরক্ষা। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান।

পাকিস্তানি সেনারা ওই এলাকায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। দুই পক্ষে গুলি-পাল্টাগুলি এবং থেমে থেমে কয়েক দিন যুদ্ধ চলে। কখনো পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধা বা মিত্রবাহিনীর অবস্থানে ঝটিকা আক্রমণ চালায় আবার কখনো মুক্তিযোদ্ধা বা মিত্রবাহিনীর সেনারা। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ ও ৫ ডিসেম্বর ওই এলাকায় প্রচণ্ড পাল্টাপাল্টি যুদ্ধ হয়।

আবদুর রব চৌধুরী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি উপদলের দলনেতা। ৫ ডিসেম্বর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালান। তখন সেখানে দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ চলাবস্থায় হঠাৎ তিনি গুলিবিদ্ধ হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া একঝাঁক (ব্রাশফায়ার) গুলির পাঁচটি গুলি লাগে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ।

আহত হয়েও আবদুর রব চৌধুরী দমে যাননি। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সহযোদ্ধারা অনুরোধ করা সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাননি। কিন্তু একসময় অধিক রক্তক্ষরণে তিনি নেতিয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত নিয়ে চলেন চিকিৎসকের কাছে। কিন্তু পথেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

আবদুর রব চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইএমই কোরে চাকরি করতেন। তাঁর ইউনিটের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। পদবি ছিল নায়েক। মার্চ মাসে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে গিয়ে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল আজিজ, বীর বিক্রম

গ্রাম মাঝকান্দি, উপজেলা রাজৈর, মাদারীপুর।
বাবা খলিল মোল্লা, মা আমিরুন নেছা।
স্ত্রী মোরশেদা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭০।

১৯৭১ সালের নভেম্বরে কানাইঘাট দখল করার পর আবদুল আজিজ ও তাঁর সহযোদ্ধারা রওনা হন সিলেট শহর অভিমুখে। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি দলে (কোম্পানি) বিভক্ত। তাঁদের দলনেতা ছিলেন ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ (বীর বিক্রম, পরে মেজর)।

যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী আবদুল আজিজসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট পদ্ধতিতে এগিয়ে যান। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তারা কানাইঘাট থেকে সিলেট অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মাঝেমধ্যে একটু বিশ্রাম নিয়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর একটি চা-বাগানে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক রাতের বেলা একটি টহলদলকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গতিবিধির খোঁজখবর নিতে পাঠান। খোঁজখবর পাওয়ার পর তাঁর নির্দেশে আবদুল আজিজ ও তাঁর সহযোদ্ধারা সকালবেলা সামনে অগ্রসর হন। পথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা কতক্ষণ অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যায় তাঁরা এমসি কলেজ অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করেন। পরদিন ভোর চারটার সময় এমসি কলেজের কাছে টিলার ওপর অবস্থান নেন। অদূরেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ও ঘাঁটি।

একটু পর সকাল হয়। মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পান, পাকিস্তানি সেনারা তাদের ডিফেন্সের মধ্যে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি সম্পর্কে তারা তেমন সজাগ ছিল না। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দলও সেখানে এসে অবস্থান নেয়।

এদিকে অনেক পাকিস্তানি সেনা একসঙ্গে দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের অধিনায়ক নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। তাঁর নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের আক্রমণ শুরু করেন। ছয়টা মেশিনগান তিন দিক থেকে ফায়ার শুরু করে। এতে পাকিস্তানি সেনাদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে।

এরপর সেখানে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আবদুল আজিজ ও তাঁর সহযোদ্ধারা ১৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে ১৭ ডিসেম্বর বেলা ১১টা পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটানা যুদ্ধ করেন। তারপর পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে।

আবদুল আজিজ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ৩০ মার্চ আক্রান্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। কামালপুর যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল করিম, বীর বিক্রম

গাছবাড়িয়া, উপজেলা চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। বাবা আমদু মিয়া, মা বিলকিস খাতুন। স্ত্রী মঞ্জুমান করিম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে পশ্চিম দিকে ২০ কিলোমিটার দূরে আশুগঞ্জ। মেঘনা নদীর তীরে। নদীর অপর তীরে ভৈরব বাজার। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় আক্রমণ করেন সেখানে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলে ছিলেন আবদুল করিম।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর সরাইল দখলের পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে এগিয়ে যেতে থাকে আশুগঞ্জ অভিমুখে। ৮ ডিসেম্বর তাঁরা একই সঙ্গে আশুগঞ্জের পূর্ব দিকে আজবপুর ও দুর্গাপুরের কাছে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারে, পাকিস্তানি সেনারা আশুগঞ্জ থেকে সরে গেছে।

৯ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রগামী একটি দল হঠাৎ আশুগঞ্জে দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফাঁদে পড়ে। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫০ গজের মধ্যে পৌঁছামাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করে। মিত্রবাহিনীর ওই দল এ ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কারণ, তাদের বলা হয়েছিল, আশুগঞ্জ শত্রুমুক্ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মিত্রবাহিনীর চারটি ট্যাংক ধ্বংস ও ১২০ জন সেনা শহীদ হন।

মিত্রবাহিনীর এই দলের অক্ষত পাঁচটি ট্যাংক পদাতিক সেনাদের পশ্চাদপসরণের সুবিধার্থে নিজেদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। কারণ, তারা শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ফেলে পশ্চাদপসরণে মোটেও আগ্রহী ছিল না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিজেদের সাময়িক সাফল্যে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে নিজেদের সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে বেরিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

এ সময় মিত্রবাহিনীর সাহায্যে এগোনোর নির্দেশ পেয়ে মুক্তিবাহিনী দ্রুত দুর্গাপুর গ্রামে অবস্থান নেয়। মিত্রবাহিনীর আক্রান্ত সেনারা পিছু হটে সেখানে আসছিলেন। পেছনে তাঁদের ধাওয়া করছিল পাকিস্তানি সেনারা। আবদুল করিমসহ মুক্তিযোদ্ধারা দেখলেন, হাজারের ওপরে পাকিস্তানি সেনা লাইন ধরে সামনে ছুটে আসছে। ওরা অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। মেশিনগান, এলএমজি, রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্রের একটানা গুলিবর্ষণের শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা দুর্গাপুর। পাকিস্তানি সেনারা এ ধরনের প্রতিরোধ আশা করেনি। হতভম্ব পাকিস্তানি সেনাদের অনেকে জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে।

তারপর সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আবদুল করিম তাঁর দল নিয়ে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আবদুল করিম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল খালেক, বীর বিক্রম

গ্রাম চাঁপাল, উপজেলা গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
বাবা কামির উদ্দীন মণ্ডল, মা গোলজান বিবি।
স্ত্রী যাসুরা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬২।

সাবেক সিম্যান আবদুল খালেক ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে বাবার ইচ্ছায় স্বেচ্ছা অবসর নেন। এখন জানা যাক তাঁর নিজ জবানিতে (লিখিত) কিছু কথা :

'১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শেষে একদিন তৎকালীন ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বীর বিক্রম, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) আমাকে ডেকে বললেন, "তোমাকে একটি অপারেশনে যেতে হবে।" ৩ সেপ্টেম্বর লালগোলা থেকে আখরিগঞ্জ যাই। সেখানে আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যোগ দেন।

'আমরা বাংলাদেশের ভেতরে এসে আদিবাসী পল্লির এক বাড়িতে আশ্রয় নিই। রেকির তথ্য পাওয়ার পর রাতে (৫ সেপ্টেম্বর) অপারেশন করার জন্য বের হই। যাওয়া ও ফেরত আসার একমাত্র পথের এক স্থানে ছিল রাজাকার ক্যাম্প। রাজাকাররা যাতে পাল্টা আক্রমণ করতে না পারে, সে জন্য ওই বাড়ির অদূরে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে পাহারায় রেখে যাই।

সেই রাতে বৃষ্টি হয়। মেঘ সরে যাওয়ার পর চাঁদের আলোয় দূরের অনেক কিছু দেখা যাচ্ছিল। রাজাকাররা সেখানে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে ফেলে এবং গুলি শুরু করে। এর আগেই অবশ্য আমরা প্রেমতলি হাসপাতাল পার হয়ে সেতুর কাছে পৌঁছাই। রাজাকাররা গুলি শুরুর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রেমতলি ক্যাম্প থেকে দুটি গাড়ির একটি কলেজের সামনে, অপরটি ইব্রাহিম শাহর বাড়ির কাছে অবস্থান নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাদের কাছাকাছি আরও দুটি অবস্থান থেকেও গুলি শুরু হয়।

'চারদিক থেকে ফায়ার শুরু হওয়ার পর আমি সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখানেই অ্যামবুশ করি; যদি পাকিস্তানি গাড়ি আসে, এ আশায়। কারণ, আমরা বিল ও নদী পার হতে পারিনি। পার না হয়ে সরাসরি আক্রমণ করাও সম্ভব ছিল না। প্রায় তিন ঘন্টা অপেক্ষা করি। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা আসেনি।

'এরপর আমরা পেছনে রওনা দিই। চেয়ারম্যান বাড়ির দক্ষিণে পুকুরপাড়ে যাওয়া মাত্র রাজাকাররা আমাদের দেখে ফেলে এবং গুলি শুরু করে। আমি সহযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণ চালাতে বলি। রাজাকাররা ছিল দালানবাড়ির ছাদে। পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আমরা সুবিধা করতে পারছিলাম না।

'এ অবস্থায় আমি ছাদে গ্রেনেড চার্জ করার কথা ভাবি। কিন্তু কেউ তা করতে রাজি না হওয়ায় আমি নিজেই তা করার সিদ্ধান্ত নিই। জয়নাল নামে একজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে আমি রওনা হই। তিনি আমার বেশ পেছনে ছিলেন এবং একপর্যায়ে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন। এ সময় আরও কিছু ঘটনা ঘটে এবং জয়নাল হঠাৎ তাঁর এসএলআর দিয়ে গুলি করেন। তখন রাজাকাররা পাল্টা গুলি চালায়। একটি গুলি আমার বুকে লাগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল জব্বার পাটোয়ারী, বীর বিক্রম

গ্রাম চৌমুখা, উপজেলা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। বাবা আবদুর রহমান পাটোয়ারী। স্ত্রী আফিয়া খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও তিনি মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫। মৃত্যু ২০০০।

মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে। একটি দলের নেতৃত্বে আবদুল জব্বার পাটোয়ারী। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে থাকলেন। তাঁদের নিখুঁত গোলাবর্ষণে পাকিস্তানি সেনারা দিশাহারা হয়ে অবস্থান ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে এল বিরাট এক এলাকা। এ ঘটনা সালদা নদী রেলস্টেশনে। ১৯৭১ সালের ৯ অক্টোবর।

মুক্তিযুদ্ধকালে সালদা নদী এলাকায় কয়েক দিন পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হতো। সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে অনেকবার যুদ্ধ হয়। সালদা নদী রেলস্টেশন নানা কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ স্টেশনের ওপর দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেটের রেল যোগাযোগ। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে এই স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে।

সালদা নদী ছিল মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন এলাকা। সেক্টর অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে সালদা নদী রেলস্টেশন দখলের পরিকল্পনা করেন। তাঁর নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল সেখানে আক্রমণ করে।

৮ অক্টোবর সকাল সাড়ে ছয়টায় মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ শুরু করেন। তাঁদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থান ছেড়ে পিছু হটতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাদের নয়নপুরে অবস্থানরত দল পিছু হটে সালদা রেলস্টেশনে আশ্রয় নেয়। এ সময় মুক্তিবাহিনীর মেজর সালেক চৌধুরীর (বীর উত্তম) দলের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়। সেদিন আবদুল জব্বার পাটোয়ারী তাঁর দল নিয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁরা সালদা রেলস্টেশন দখল করতে ব্যর্থ হন।

পরদিন ৯ অক্টোবর আবার সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। এই যুদ্ধে আবদুল জব্বার পাটোয়ারী অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেন। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি শিকার করে সালদা রেলস্টেশন ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। রেলস্টেশন মুক্তিযোদ্ধারা দখল করেন। পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রেলস্টেশন পুনর্দখলের জন্য আক্রমণ চালিয়েও তা আর দখল করতে পারেনি।

আবদুল জব্বার পাটোয়ারী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ২৭ বালুচ রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। মার্চ মাসে তিনি ছুটিতে বাড়ি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরে। পরে তাঁকে ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধ করেন ফেনী, নাজিরহাট ও হাটহাজারী এলাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম

গ্রাম সিদ্ধেশ্বরী, মুরাদনগর, কুমিল্লা। বাবা আলতাফ আলী, মা জোলেখা বেগম। স্ত্রী সোনাভান বিবি। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭৯। শহীদ অক্টোবর ১৯৭১।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চৌদ্দগ্রামের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এ সড়কের কিছু অংশ সীমান্তের খুব কাছ ঘেঁষা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ সড়কে নিয়মিত টহল দিত। চৌদ্দগ্রাম-মিয়াবাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে টহলদলের ওপর বা ওই সব ক্যাম্পে আক্রমণ চালাতেন।

এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আবদুল মান্নানসহ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সীমান্ত অতিক্রম করে চৌদ্দগ্রামে অবস্থান নেয়। তাদের লক্ষ্য, পাকিস্তানি সেনাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করা। চৌদ্দগ্রামে পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান, পাকিস্তানি সেনাদের একটি টহলদল কুমিল্লা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে ফেনীর দিকে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদল যখন ফিরে আসবে, তখন তাঁরা তাদের আক্রমণ করবেন। এরপর আবদুল মান্নানসহ মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত অবস্থান নেন ওই সড়কের সদর উপজেলার অন্তর্গত হাড়তখোলায় (১৯৭১ সালে চৌদ্দগ্রামের অন্তর্গত)।

AMARBOI.COM

মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগের কাছে হালকা অস্ত্র—স্টেনগান, রাইফেল ও কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড। ভারী অস্ত্র বলতে একটি এলএমজি ও দু-তিনটি এসএমজি। তাই সম্বল করে তাঁরা সেখানে অপেক্ষায় থাকেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলের জন্য। তারপর সময় গড়াতে থাকে। একসময় সেখানে উপস্থিত হয় পাকিস্তানি সেনাদের টহলদল। আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোদ্ধারা অতর্কিতে আক্রমণ করেন। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত। তবে নিমেষেই তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

পাকিস্তানি সেনারা সংখ্যায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি। অস্ত্রশস্ত্রও ছিল অত্যাধুনিক। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। এ রকম পরিস্থিতিতে সম্মুখযুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোদ্ধারা এতে বিচলিত হননি। সাহসের সঙ্গে আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তাঁদের নির্ভুল গুলিবর্ষণে হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা।

এই সম্মুখযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হন। পাকিস্তানি সেনারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিহত ও আহত সেনাদের নিয়ে কুমিল্লায় পালিয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধের একপর্যায়ে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন আবদুল মান্নান। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করার আগেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

আবদুল মান্নান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। তিনি প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ শেষে ভারতে যান। ফিরে এসে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরে। কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম

গ্রাম নোয়াগাঁও, ইউনিয়ন শ্যামগ্রাম, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা আবদুল লতিফ, মা রাবেয়া খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৬ ।
শহীদ ৬ অক্টোবর ১৯৭১।

রাতে আবদুল মান্নানসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রওনা হলেন তাদের লক্ষ্যস্থল অভিমুখে।

সবার আগে একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর পেছনে দলনেতা ও আবদুল মান্নান। তাঁদের পেছনে সহযোদ্ধারা। তাঁদের কাছে ভারী অস্ত্র মাত্র দুটি। একটি আরএল (রকেট লঞ্চার) ও একটি এলএমজি। অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এসএমজি, স্টেনগান, রাইফেল এবং কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেড।

সেদিন তাঁরা মদুনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রে (সাবস্টেশন) আক্রমণ করেন। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত মদুনাঘাট। সাবস্টেশনের অবস্থান চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের উত্তর পাশে এবং হালদা নদীর পশ্চিম পাশে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ছিল পাকিস্তানি সেনা ও কিছু রাজাকার। সব মিলিয়ে তাদের সংখ্যা ৩০-৩৫ জন। সাবস্টেশনের চারদিকে ছিল বাংকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক অবস্থান ছিল মদুনাঘাটের অদূরেই। এর আগে তাঁরা বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকায় রেকি করেন। নির্ধারিত দিন মধ্যরাতে তাঁরা কেন্দ্রের ৫০-৬০ গজ দূরে অবস্থান নেন। রাত যখন তিনটা, তখন তাঁরা আরএল দিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়েকটি রকেট ছোড়েন। নির্ভুল নিশানায় সেগুলো আঘাত হানে। তিনটি ট্রান্সফরমারে আগুন ধরে যায়।

পাকিস্তানি সেনারা সজাগই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা পাল্টা আক্রমণ চালায়। চারদিকের বাংকার থেকে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারাও জোর আক্রমণ চালায়। গুলির খই ফোটে বিদ্যুৎকেন্দ্রে। আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করে চলেন।

তুমুল যুদ্ধের একপর্যায়ে আবদুল মান্নান হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর বুকে কয়েকটি গুলি লাগে। শহীদ হন তিনি। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তিনি শহীদ ও দলনেতা সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম)-সহ তিন-চারজন আহত হন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৬ অক্টোবরের।

মদুনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংসের অপারেশন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিরাট এক সাফল্য। এই অপারেশনের খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রসহ বিদেশি বেতার ও সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচার পায়। অবশ্য এই সাফল্য ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আবদুল মান্নান শহীদ হন।

সহযোদ্ধারা আবদুল মান্নানের মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও সমাহিত করতে পারেননি। স্থানীয় গ্রামবাসী মরদেহ ওই গ্রামেই সমাহিত করেন।

আবদুল মান্নান পুলিশে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রামে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে যুদ্ধ করেন ১ নম্বর সেক্টরের ঋষিমুখ সাবসেক্টরে। বিভিন্ন জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বেশির ভাগ যুদ্ধ বা অপারেশনেই তিনি পুরোভাগে থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম মুছাপুর, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। বাবা মোহাম্মদ সুকানী, মা সাহেরা খাতুন। স্ত্রী খতিজা বেগম। তাঁদের ছয় ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫৬। মৃত্যু ১৯৮৭।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বারবার আক্রমণ করেও মুক্ত ভূখণ্ড দখল করতে ব্যর্থ হলো। তারা বারবার আক্রমণ করছে একটি কারণে। আর তা হলো ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জাতীয় দিবসের আগেই মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকা দখল করে সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যায়।

১৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবার আক্রমণ চালায়। আবদুল হকসহ নতুন মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন, সেখানেই পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করে। ফলে সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২১, ২৪ ও ২৬ সেপ্টেম্বর আবার সেখানে আক্রমণ করে। এর মধ্যে ২১ ও ২৪ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ ছিল ভয়াবহ। বহুসংখ্যক গানবোট, স্টিমার ও লঞ্চ নিয়ে তারা সোনাভরি নদীর মোহনা হয়ে অগ্রসর হয়। ব্যাপক ফায়ার সাপোর্টের সাহায্য নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে উঠে পড়ার চেষ্টা করে। আবদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এ ঘটনা কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে। ১৯৭১ সালে রৌমারী থানা (বর্তমানে উপজেলা) মুক্ত ছিল।

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদের (বীব বিক্রম, পরে মেজর) ১৯৭৩ সালের বয়ানে। তিনি বলেন, '...১৬ সেপ্টেম্বর "সি" (চার্লি) কোম্পানি ও "এ" (আলফা) কোম্পানির একটি প্লাটুন লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে রৌমারীর চরের কোদালকাঠিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়। ২১ সেপ্টেম্বর শত্রুর দুই কোম্পানি সেনা মর্টারের সাহায্যে চরকোদাল আক্রমণ করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৩৫ জন নিহত হয়। আমাদের পক্ষে পাঁচজন আহত হয়।

'২৪ সেপ্টেম্বর সকালবেলা শত্রুপক্ষ পুনরায় এক ব্যাটালিয়ন সেনা নিয়ে কোদালকাঠি আক্রমণ করে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এবারেও তাঁদের ব্যর্থ করে দেয়। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রায় ৭০ জন নিহত হয়। আমাদের ১৫ জন আহত হয়। কোদালকাঠি যুদ্ধে...ল্যান্স নায়েক আবদুল হক প্রমুখ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং সাহসিকতার জন্য বীর বিক্রম পদকপ্রাপ্ত হন।'

আবদুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। ৩০ মার্চ তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বৃহত্তর সিলেটের ধলই, এমসি কলেজসহ আরও কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম শাহপুর, উপজেলা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ। বাবা সোনা মিয়া, মা আফসান বিবি। স্ত্রী সুকেরা খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮২।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। আবদুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন সীমান্তে। তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কসবা প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত কসবা।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই আক্রমণ ছিল ভিন্ন ধরনের। প্রায় এক ব্যাটালিয়ন শক্তির মুক্তিযোদ্ধা প্রথমে সমবেত হন কসবাসংলগ্ন লাতুমুড়ার সামনে। তাঁরা সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গোলাগুলি ও ছোটখাটো যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই কর্মকাণ্ড ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ধোঁকা দেওয়া এবং মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

মুক্তিযোদ্ধারা সফলতার সঙ্গেই পাকিস্তানিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এরপর পাকিস্তানিরা সেদিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নেয়। এর মধ্যে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে আবদুল হকসহ মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ (দুই কোম্পানি) রাতের অন্ধকারে আলাদা স্থানে অবস্থান নেয়।

২২ অক্টোবর ভোরে আগের স্থানে সমবেত হওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান থেকে প্রথম আক্রমণ পরিচালিত হয়। পাকিস্তানিরা সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ শুরু করে। এই সুযোগে নতুন স্থানে সমবেত আবদুল হকরা পেছন দিক থেকে ঝোড়োগতির আক্রমণ চালান। বিস্মিত পাকিস্তানিরা এমন আক্রমণ আশা করেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিরোধে তারা ব্যর্থ হয়।

পরে পাকিস্তানিরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুখোমুখি যুদ্ধ চলতে থাকে। আবদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তাঁদের সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা পিছু হটতে শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আরও চড়াও হন।

দুই পক্ষে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া গুলিতে আহত হন আবদুল হক। তবু তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে ফিল্ড চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান। পরে তাঁর চিকিৎসা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে।

সেদিন প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পালিয়ে যায়। সে যুদ্ধে ২৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৮ জন আহত হয়।

আবদুল হক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৭১ সালে কৃষিকাজসহ নানা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলে প্রতিরোধযুদ্ধরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। প্রশিক্ষণশেষে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর নবগঠিত নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যুক্ত করা হয়। ২ নম্বর সেক্টরে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হালিম, বীর বিক্রম

গ্রাম তরপুরচণ্ডী, সদর উপজেলা, চাঁদপুর।
বাবা আলী হোসেন মিয়াজি, মা ফয়জুন্নেছা। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৬। শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

তীব্র শীত, অন্ধকার ও কুয়াশা উপেক্ষা করে একদল মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে চলেছেন। একটি উপদলের নেতৃত্বে আবদুল হালিম। নির্ধারিত সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে শুরু হয় গোলাবর্ষণ। গোলা আসে পেছন থেকে। ভারতীয় গোলন্দাজ ব্যাটারি সীমান্ত থেকে কামানের গোলাবর্ষণ করে।

গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর আবদুল হালিম এবং তাঁর সহযোদ্ধারা আবার এগিয়ে যান। তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি দখল করা। গোলাবর্ষণে পাকিস্তানি সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত। এ সুযোগে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানিদের ওপর।

নিমেষে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় মেশিনগান, এলএমজি আর রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলি। আবদুল হালিমসহ অন্যান্য দলের মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁদের সবার বীরত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরে। হতোদ্যম পাকিস্তানিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে এগিয়ে যান মূল ঘাঁটি অভিমুখে। পাকিস্তানি সেনারা মজবুত বাংকার ও নিরাপদ প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর তুমুল গুলিবর্ষণ করে। এতে বিচলিত হননি আবদুল হালিম। সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঢুকে পড়েন মূল প্রতিরক্ষার ভেতর। সকালের মধ্যে তাঁরা আরও কিছু এলাকা দখল করে ফেলেন।

এরপর হঠাৎ যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত তাদের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে সমবেত হয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানিদের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন ছিল বেশ নিরাপদ। সেখান থেকে পুনরায় সংগঠিত পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক গোলাগুলি শুরু করে। এ আক্রমণ ছিল বেশ জোরালো। গুলি ও বোমার আঘাতে শহীদ ও আহত হন আবদুল হালিমের দলের কয়েকজনসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা।

আবদুল হালিম ও তাঁর সহযোদ্ধারা এতে মনোবল হারাননি। দমেও যাননি। সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেন। তুমুল যুদ্ধের একপর্যায়ে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া একঝাঁক গুলির দু-তিনটি লাগে তাঁর বুকে। নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২২-২৩ নভেম্বরের। ঘটেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত চন্দ্রপুর-লাতুমুড়ায়। সেদিন যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হালিমসহ প্রায় ২২ জন শহীদ হন। পরে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে চন্দ্রপুরের অদূরে সমাহিত করা হয়।

আবদুল হালিম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর প্রথমে দুই নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে তাঁকে কে ফোর্সের অধীন নবগঠিত নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সাত্তার, বীর বিক্রম

গ্রাম তালুককানাই, উপজেলা মদন, নেত্রকোনা।
বাবা মো. আবদুল বারী, মা আছিয়া খাতুন।
স্ত্রী মহিমা খাতুন। নিঃসন্তান। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৭।
শহীদ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার অন্তর্গত যাদবপুর-রাজাপুর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই এলাকায় নিয়মিত টহল দিত। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, ভারত থেকে যাতে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারেন।

২১ সেপ্টেম্বর আবদুস সাত্তারসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলকে অ্যামবুশ করার জন্য সুবিধাজনক একটি স্থানে অবস্থান নেন। জায়গাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। আশপাশে বাড়িঘর বা মানুষজন ছিল না।

মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার প্রায় শেষ পর্যায়ে সেখানে হাজির হয় সেনা টহলদল। তারা ফাঁদের মধ্যে আসামাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র গর্জে ওঠে। পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল। তারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়।

শান্ত এলাকা নিমেষে পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। গোলাগুলিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পাকিস্তানি সেনারা অস্ত্রশস্ত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। প্রথম দিকে তারা ব্যাপক গোলাগুলি করে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা বিচলিত না হয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ ছাড়া তাঁদের অবস্থান ও প্রস্তুতি ছিল যথেষ্ট ভালো।

পাকিস্তানি সেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই কোণঠাসা ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। গুলির আঘাতে একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তিন-চারজন সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। বাকিরা আহত। এরপর পাকিস্তানিরা পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু সে পথও ছিল প্রায় রুদ্ধ। এ অবস্থায় তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করে।

অন্যদিকে সাফল্য ও জয়ের নেশা পেয়ে বসে আবদুস সাত্তার ও তাঁর কয়েক সহযোদ্ধার মধ্যে। প্রবল গোলাগুলির মধ্যে তাঁরা নিরাপদ স্থান থেকে বেরিয়ে ক্রল করে এগিয়ে যান পাকিস্তানি সেনাদের দিকে। বিপুল বিক্রমে চড়াও হন শত্রুর ওপর। তাঁদের অস্ত্রের গুলিতে হতাহত হয় আরও কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা।

এ সময় হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন অদম্য সাহসী ও বিক্রমী যোদ্ধা আবদুস সাত্তার। পাকিস্তানিদের এলএমজির বুলেট বিদীর্ণ করে দেয় তাঁর দেহ। লুটিয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলের প্রায় সবাই নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আবদুস সাত্তারসহ দুজন শহীদ ও তিন-চারজন আহত হন। যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা আবদুস সাত্তারকে সমাহিত করেন শার্শা উপজেলার অন্তর্গত কাশীপুরে।

আবদুস সাত্তার ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর সেক্টরে। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধ শেষে তিনি ভারতে যান। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিদুর রহমান, বীর বিক্রম

গ্রাম সলিমাবাদ, উপজেলা নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
বাবা শফিকুর রহমান, মা আনোয়ারা বেগম।
স্ত্রী হামিদা রহমান। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩২। মৃত্যু ২০১০।

গোপন ক্যাম্প থেকে সহযোদ্ধা নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে আবিদুর রহমান বেরিয়ে পড়লেন। আবছা আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে পৌছালেন নদীর পাড়ে। অবস্থান নিলেন সারিবদ্ধ দোকানের পেছনে। অদূরে নৌবন্দর। সেখানে তীব্র আলো। সেই আলোর কিছুটা তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেও পড়েছে। আলো-আঁধারির মধ্যে তাঁরা দ্রুত অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। এ সময় ঘটল এক বিপত্তি। দলনেতা আবিদুর রহমান কৌশলে সেই বাধা উপেক্ষা করে অপারেশন সফল করলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ১৬ আগস্ট) নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দরের এ ঘটনা ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোরা দেশের বিভিন্ন নৌবন্দরে একযোগে অপারেশন চালিয়ে গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই অপারেশনের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'।

নির্ধারিত দিন আবিদুর রহমানের নেতৃত্বে ২০ জন নৌ-কমান্ডো গোপন ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দরের অপর পাড়ে অবস্থান নেন। ১৫ জন নদীতে নেমে অপারেশন করেন। দলনেতা আবিদুর রহমানসহ পাঁচজন থাকেন স্থলভাগের নিরাপত্তায়।

১৫ জনের দলটি তিনজন করে পাঁচটি দলে বিভক্ত ছিল। তিনটি দল পানিতে নামার পর সেখানে হঠাৎ এক অস্ত্রধারী রাজাকার এসে হাজির হয়। নৌ-কমান্ডোরা তাকে গুলি করে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু কৌশলগত কারণে তখন তা করা সম্ভব ছিল না। কারণ কাছাকাছিই পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। এদিকে ওই রাজাকার সেখান থেকে আর সরছিল না। এ অবস্থায় দলনায়ক আবিদুর রহমান ওই রাজাকারকে নিঃশব্দে আটক করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ছুরি হাতে একাই ক্রল করে ওই রাজাকারের কাছে গিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপর। আবিদুর রহমান রাজাকারের রাইফেলটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বন্দী করেন। এরপর নৌ-কমান্ডোদের বাকি দুটি দল পানিতে নামে।

যে তিনটি দল আগে পানিতে নেমেছিল তাঁরা যে যাঁর টার্গেটে (জাহাজ, পন্টুন বা টাগ) মাইন লাগান। পরের দুটি দলও নির্দিষ্ট টার্গেটে মাইন লাগাতে সক্ষম হয়। তারপর তাঁরা দ্রুত ফিরে আসেন আগের স্থানে। একটু পর শুরু হয় বিস্ফোরণ। বন্দরের সমুদয় জলরাশি ও দুই পাড় কেঁপে পর পর ১৫টি মাইন বিস্ফোরিত হয়।

আবিদুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে ফ্রান্সের তুলন নৌঘাঁটিতে সাবমেরিনার হিসেবে প্রশিক্ষণে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও ১২ জন বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁদের মধ্যে আবিদুর রহমানসহ আটজন ৩১ মার্চ তুলন থেকে পালিয়ে যান। কয়েক দিন পর ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। আবিদুর রহমান ১৬ আগস্টের পর আরও কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাবো ফেরিঘাট, সিদ্ধিরগঞ্জে খাদ্যগুদামে আক্রমণ, রসদবাহী জাহাজ 'তুরাগে' আক্রমণ প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু বকর সিদ্দিকী, বীর বিক্রম

গ্রাম দেলুয়াকান্দি, ইউনিয়ন, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
বাবা মনসুর আলী, মা বেগম সোনাভান।
স্ত্রী সাহানা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬০। শহীদ ১২ এপ্রিল ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র-শিক্ষকসহ পুলিশ, আনসার ও ইপিআর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল। এই দলে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিকী। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাডেট কলেজের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ (বীর প্রতীক)।

মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে ঈশ্বরদীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সফলভাবে অ্যামবুশ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল পাবনা থেকে সেখানে এলে তাঁরা আক্রমণ চালান। তখন সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলে কর্মকর্তা ও সেনা ছিল প্রায় ৬০ জন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে মেজর আসলামসহ ৪০ জন হতাহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়।

কয়েক দিন পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বিরাট দল ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখে আসতে থাকে। পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তারা বাধার সম্মুখীন হয়। তবে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ১১ এপ্রিল ভোরে তারা রাজশাহীর চারঘাটে উপস্থিত হয় এবং সেখানে প্রতিরক্ষা নিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

আবু বকর সিদ্দিকীর দলের ওপর দায়িত্ব ছিল, চারঘাটের প্রধান সড়কে বাজারসংলগ্ন জায়গায় ডিলেইং পজিশন সৃষ্টি করে পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দেওয়া, যাতে করে পাকিস্তানি সেনারা সামনে অগ্রসর হতে না পারে। ১২ এপ্রিল ভোরে তাদের অবস্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একাংশ উপস্থিত হলে তিনি তাদের ওপর আক্রমণ চালান। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত সেনারা কিছু সময় যুদ্ধের পর পশ্চাদপসরণ করে। পরে নতুন শক্তি নিয়ে আবার অগ্রসর হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করেন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দলও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। দিনভর যুদ্ধ চলে। বিকেলের পর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দলের অবস্থান থেকে গুলিবর্ষণ ক্রমে কমে যায়। একপর্যায়ে আবু বকর সিদ্দিকীর দলের অবস্থানেও একই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় গোলাগুলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তখন প্রতিরক্ষা অবস্থানে তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা একজন মাত্র সহযোদ্ধা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

আবু বকর সিদ্দিকী এতে ভীতসন্ত্রস্ত বা বিচলিত হননি। বীরত্বের সঙ্গে একাই পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। কিন্তু এটা ছিল অসম যুদ্ধ। একপর্যায়ে তাঁর গুলি শেষ হয়ে যায়। তখন পাকিস্তানি সেনারা তাঁর বাংকার ঘিরে ফেলে খুব কাছ থেকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন তিনি। সেনারা তাঁকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাঁর মরদেহ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

আবু বকর সিদ্দিকী ১৯৭১ সালে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে শিক্ষকতা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ যুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম,

বীর বিক্রম

গ্রাম চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা বাসা ১৫৪, লেন ৪, ইস্টার্ন রোড, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা মোহাম্মদ ইদ্রিস, মা চেমন আরা বেগম। স্ত্রী সৈয়দা ইসমাত নাসিম। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০২।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে ১৩-১৪ এপ্রিল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (এ এস এম নাসিম) তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে আশুগঞ্জে (রিয়ার) প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। তখন পর্যন্ত আশুগঞ্জ মুক্ত ছিল। দখলের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৩ এপ্রিল সড়কপথে পার্শ্ববর্তী ভৈরবে উপস্থিত হয়। পরদিন হেলিকপ্টার থেকে কমান্ডো ব্যাটালিয়নের প্রায় এক কোম্পানি সেনা আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পেছনে নামে। গানবোট ও অ্যাসল্ট ক্রাফটের সাহায্যে নদীপথেও সেনা আসে।

১৪ এপ্রিল সকাল থেকে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর কয়েকটি জঙ্গি বিমান আশুগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আকাশ থেকে ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে। এর ছত্রচ্ছায়ায় দুপুর ১২টার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল (কমান্ডো) হেলিকপ্টারে করে নাসিমের প্রতিরক্ষা অবস্থানের পেছনে (সোহাগপুর) অবতরণ করে।

আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম এতে দমে যাননি। অব্যাহত বিমান হামলার মধ্যেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থান পুনর্বিন্যাস করেন। এরপর দ্রুত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দলের আক্রমণের ধারা ও অবস্থান চিহ্নিত করে সহযোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দলের মুখোমুখি হন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

নাসিম সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিক্রমের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডো দলকে মোকাবিলা করেন। তাঁর সহযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় কমান্ডোরা কিছুটা পিছু হটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার সংগঠিত হয়ে নাসিমের দলকে পাল্টা আক্রমণ করে। চার ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। কোনো স্থানে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ হয়।

একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমের দলকে প্রায় ঘেরাও করে আক্রমণ চালায়। এতে তাঁর সহযোদ্ধাদের বেশির ভাগ আহত ও কয়েকজন শহীদ হন। তিনি নিজেও আহত হন। নাসিমের সামনে পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। প্রতিরোধযুদ্ধে নাসিমের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তখন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন।

প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর নাসিম প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরের পঞ্চবটী সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধীন ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। আশুগঞ্জ, মনতলা, মাধবপুর, শাহবাজপুর ও চান্দুরার যুদ্ধ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম চান্দুরায় পুনরায় আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল কালাম আজাদ, বীর বিক্রম

গ্রাম সাতড়াপাড়া, উপজেলা চাটখিল, নোয়াখালী। বর্তমান ঠিকানা রাজাবাড়ি, উত্তরখান, ঢাকা। বাবা আবদুল গনি, মা মাহমুদা খাতুন। স্ত্রী সালেহা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৭।

ফেনী জেলার পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া সমন্বয়ে বিলুনিয়া। তিন দিকে ভারতের সীমান্ত। ১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর সকাল থেকে বিলুনিয়ায় কয়েক দিন ধরে একটানা যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল অংশ নেয়।

৪ নভেম্বর সকালে চিথলিয়ার দিক থেকে রেলট্রলিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি টহলদল এগিয়ে আসে।

আবুল কালাম আজাদের সহযোদ্ধাদের আক্রমণে রেলট্রলি ধ্বংস ও টহলদলের সব পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। শব্দ শুনে পাকিস্তানি সেনারা গোলাগুলি শুরু করে। এরপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা শেলিং ও ফায়ারিং অব্যাহত রাখে। আবুল কালাম আজাদসহ মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা জবাব দেন।

পরদিনও শেলিং ও ফায়ারিং চলে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ গড়ায় তৃতীয় দিনে। পরশুরামে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা চিথলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের বা পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পালানোর পথ ছিল রুদ্ধ। সেদিন বিকেলে পাকিস্তানি বিমান নিচু দিয়ে উড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করতে থাকে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। জনপদেরও অনেক ক্ষতি হয়। চারদিকে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে থাকে।

আবুল কালাম আজাদসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এতে বিচলিত হননি। তাঁদের কারও কাছে ছিল এলএমজি, কারও কাছে এসএমজি। আজাদের কাছে ছিল এলএমজি। তাঁরা শেষরক্ষা হিসেবে তাঁদের কাছে থাকা অস্ত্রগুলোই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহার করেন।

বিমানগুলো একবার তাঁদের এলাকায় গোলাগুলি করে যাওয়ার পর তাঁরা অপেক্ষায় থাকেন আবার কখন সেগুলো ফিরে আসে। বেশিক্ষণ দেরি করতে হয়নি। বিমানগুলো খুব নিচ দিয়ে তাঁদের দিকে উড়ে আসে। অস্ত্রের গুলির আওতায় আসামাত্র গর্জে ওঠে আবুল কালাম আজাদের এলএমজি ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্র।

দুটি বিমান উড়ে যায়। একটি ফিরে যেতে পারেনি। ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ে মাঠে। আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা চেঁচিয়ে ওঠেন সাফল্যের উল্লাসে। এদিন ছিল আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর সহযোদ্ধাদের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

আবুল কালাম আজাদ ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ বালুচ রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ওই বছরই তাঁকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে সেখানে বদলি করা হয়। যোগ দেওয়ার পর ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক তাঁর পাশাপাশি রেজিমেন্টে কর্মরত বেশির ভাগ বাঙালিকে ছুটি দেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নিজ এলাকায় প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে গিয়ে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। পুনর্গঠিত হওয়ার পর রাজনগর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর নবগঠিত ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল কাশেম হাওলাদার, বীর বিক্রম

গ্রাম রাধানগর (তেওয়ারীপুর), ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর। বাবা আবদুল ছোমেদ, মায়ের নাম জানা যায়নি। স্ত্রী রাজিয়া বেগম। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৯। গেজেটে নাম আবুল কাশেম। শহীদ ২১ নভেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরাও বসে থাকল না। পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। নিমেষে শুরু হয়ে গেল মুখোমুখি যুদ্ধ। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হতে থাকল।

মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে আছেন আবুল কাশেম। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান বেশ শক্তিশালী। তাদের কাছে আছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে ছুটে আসছে হাজার হাজার গুলি। একই সঙ্গে মুহুর্মুহু মর্টার শেল এসে পড়ছে মুক্তিযোদ্ধাদের আশপাশে।

সময় যত গড়াচ্ছে, যুদ্ধের তীব্রতা ততই বেড়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে আবুল কাশেমের কয়েকজন সহযোদ্ধা আহত হয়েছেন। গোলাগুলির শব্দের মধ্যে ভেসে আসছে তাঁদের আর্তনাদ। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ধরাধরি করে পেছনে নিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারী সহযোদ্ধারা। পাল্টা আক্রমণের তীব্রতায় মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বিচলিত। কিন্তু আবুল কাশেম এতে বিচলিত হলেন না। বরং তাঁর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সঙ্গে থাকা সহযোদ্ধাদের পেছনে ফেলে গুলি করতে করতে একাই এগিয়ে গেলেন সামনে। তাঁর সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত হলেন কয়েকজন সহযোদ্ধা। তাঁরাও গুলি করতে করতে এগিয়ে গেলেন সামনে।

তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণে ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো পাকিস্তানি সেনাদের এক অংশের প্রতিরক্ষা। এটা দেখে আবুল কাশেমের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন আরেকটু সামনে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা তাঁর রণমূর্তি দেখে হতভম্ব। চরম উত্তেজনাকর এক মুহূর্ত। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের গুলি এসে লাগল আবুল কাশেমের দেহে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঢলে পড়লেন মাটিতে। গুরুতর আহত হয়েও তিনি জয়ের আশা ছাড়লেন না। সহযোদ্ধাদের বললেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।' একটু পর নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা হরিপুরে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর।

হরিপুর রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। জেলা সদর থেকে পশ্চিমে। গোদাগাড়ী ও পবা উপজেলার সীমান্তে হরিপুর। ১৯৭১ সালে গোদাগাড়ী ও পবা উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। তাদের সঙ্গে ছিল একদল রাজাকার।

আবুল কাশেম চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা ও আঙ্গিনাবাদ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিন উল্লাহ শেখ, বীর বিক্রম

গ্রাম পাইকপাড়া, উপজেলা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
বাবা নোয়াব আলী শেখ, মা মাহমুদা খাতুন।
স্ত্রী আয়েশা বেগম। তাঁর এক মেয়ে ও ছয় ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২৭। মৃত্যু ১৯৯৯।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিবাহিনীর নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে আগস্ট মাসে একযোগে কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। এতে পাকিস্তানি সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হইচই পড়ে যায়। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'।

এরপর নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান। কিছুদিন পর তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আবার বাংলাদেশে রওনা হন। আমিন উল্লাহ শেখের নেতৃত্বে ২৬ জনের একটি দল অক্টোবর মাসের শেষে চাঁদপুরে পৌঁছান।

এবার আগের মতো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছিল না। কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি। দলনেতারা সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করে টার্গেট নির্ধারণ করতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমিন উল্লাহ শেখরা চাঁদপুরে অনেকগুলো অপারেশন করেন। এর মধ্যে বার্মা ইস্টার্ন (বর্তমানে মেঘনা) কোম্পানির তেলের ডিপো, এমভি লোরেম, এমভি স্বামী, এমভি লিলিসহ চীনা পতাকাবাহী জাহাজ ও পাকিস্তানি নৌবাহিনীর গানবোট ধ্বংস উল্লেখযোগ্য।

৩০ অক্টোবর রাতে তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একই সময় দুটি অপারেশন করেন। আমিন উল্লাহ শেখ পরিকল্পনা করেছিলেন ওই রাতে তাঁরা চাঁদপুরের ভাটিতে নীলকমলের কাছে অপারেশন করবেন। সেখানে রাতে পাকিস্তানি সেনা ও নৌবাহিনীর কয়েকটি গানবোট নোঙর করা থাকত।

এদিকে ডাকাতিয়া নদীর লন্ডন ঘাটে আমেরিকান পতাকাবাহী এমভি লোরেমও সেদিন নোঙর করা ছিল। জাহাজটি পাকিস্তানিদের জন্য খাদ্য ও সমরাস্ত্র বহন করে সেখানে আসে। এ খবর আমিন উল্লাহ শেখ সে দিনই জানতে পারেন। তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা করে একই দিন ওই জাহাজেও অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় নীলকমলের কাছে পাকিস্তানি গানবোট ধ্বংসের অভিযান। অপর দল এমভি লোরেম জাহাজ ধ্বংস করে। নীলকমলে নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। এরই মধ্যে সেদিন তাঁর দুঃসাহসী সহযোদ্ধারা সঙ্গে মাইন লাগিয়ে পাকিস্তানি নৌবাহিনীর একটি গানবোট ডুবিয়ে দেন।

দুর্ধর্ষ নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ পাকিস্তানিরা কঠোর নিরাপত্তাবলয় তৈরি করেও প্রতিরোধ করতে পারেনি। অন্যদিকে লন্ডন ঘাটে ডুবে যাওয়া 'এমভি লোরেম' স্বাধীনতার পর তিন দশক ওই অভিযানের স্মৃতি বহন করে। তখন পর্যন্ত সেটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আমিন উল্লাহ শেখ পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে ইলেকট্রিক আর্টিফিসার (ইএ) পদে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে ফ্রান্সের তুঁল নৌঘাঁটিতে সাবমেরিনার হিসেবে প্রশিক্ষণে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৩১ মার্চ আরও সাতজন বাঙালি সাবমেরিনারের সঙ্গে তুঁল থেকে পালিয়ে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ভারতে যান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম দক্ষিণ আনন্দপুর, ফুলগাজী, ফেনী। বর্তমান ঠিকানা গুলশান ২, ঢাকা। বাবা সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী, মা আজিজের নেছা চৌধুরানী। স্ত্রী সৈয়দা লতিফা আমীন। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৭।

১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট শেরপুর জেলার নকশী বিওপিতে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী।

এর বর্ণনা শোনা যাক তাঁর বয়ানে। '৩ আগস্ট (রাতে ঘড়ির সময় অনুযায়ী ৪ আগস্ট) আমি দুই কোম্পানি যোদ্ধা নিয়ে নকশী বিওপি আক্রমণ করি। অ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে যোদ্ধারা অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এফইউপিতে রওনা হন।

'তিনটা ৪৫ মিনিটে আমাদের আর্টিলারি গর্জে ওঠে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধের আগেই এফইউপিতে আমাদের নিজেদের আর্টিলারির কয়েকটি গোলা এসে পড়ে। একই সময় পাকিস্তানি আর্টিলারিও গর্জে ওঠে। এর মধ্যেই আমরা এক্সটেনডেড ফরমেশন তৈরি করি।

'একটু পর অ্যাসল্ট লাইন ফর্ম করে আমি চার্জ বলে হুংকার দেওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র উঁচু করে "জয় বাংলা" ধ্বনি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যান। শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের বেয়নেট চার্জের জন্য তাঁরা রীতিমতো দৌড়াতে থাকেন। আমাদের মনোবল দেখে পাকিস্তানি সেনারা তখন পলায়নরত।

'ঠিক তখনই শত্রুর আর্টিলারির শেলগুলো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়ে আমাদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এতে কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। আমার ডান পায়ে একটা শেল লাগে।

'দেখতে পেলাম, গুটিকতক অতি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা পলায়নরত শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের মারছেন। কেউ কেউ মাইন ফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের মন চাঙা রাখার জন্য জোরে জোরে জয় বাংলা চিৎকার দিয়ে বললাম, আগে অগ্রসর হও। এরপর পাকিস্তানিদের বিওপি তছনছ হয়ে গেল।

'এমন সময় এক পাকিস্তানি সেনা অস্ত্র উঁচু করে আমার দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে সালাম (অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, এক সুবেদার মেজরের ছেলে) নামে এক ছেলে তাকে খতম করে দেয়। কিন্তু অন্য জীবিত পাকিস্তানি সেনারা আমাকে ধরার চেষ্টা করে। আমি সাইড রোল, ক্রল করে সরে যাওয়ার সময় আবার আমার ডান কনুইয়ে গুলি লাগে। এর পরের ঘটনা সে আরেক কাহিনি।'

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আমীন আহম্মেদ চৌধুরী ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তিনি চট্টগ্রামে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণে গোপনে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২৫ মার্চ ঢাকায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে যান এবং নানা ঘটনাপ্রবাহের পর মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আশরাফ, বীর বিক্রম

গ্রাম বেরি, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা। বাবা নোয়াব মিয়া, মা হাজেরা খাতুন। স্ত্রী হাফিজা বেগম। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮০। শহীদ ১০ নভেম্বর ১৯৭১।

কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত কংসতলা। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি। এখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা ওই এলাকায় নিয়মিত টহল দিত। এ কারণে কুমিল্লার দক্ষিণে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সীমিত হয়ে পড়ে।

এই এলাকা ছিল মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের নির্ভয়পুর সাবসেক্টরের অধীন। সেপ্টেম্বরের শেষে এই সাবসেক্টরের ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল কংসতলায় আকস্মিক আক্রমণ চালায়। এই দলে ছিলেন আলী আশরাফ। তাঁরা ৩০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত একটায় ওই ঘাঁটিতে ঢুকে আক্রমণ চালান। তিন ঘণ্টার যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা চরম ক্ষতির মুখে পড়ে। ১৬ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার নিহত হয় এবং আটজন আহত হয়।

এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে তারা সেখানকার অবস্থান পরিত্যাগ করে কুমিল্লায় চলে যেতে বাধ্য হয়। সেদিন আলী আশরাফ ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা যথেষ্ট সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দেন। মূলত তাঁদের বীরত্বেই পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

মিয়াবাজারে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আলী আশরাফরা সেখানে আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর ১০ নভেম্বর পিপুলিয়া-হাজতখোলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি টহলদলকে তাঁরা অ্যামবুশ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই টহলদলটি ছিল বেশ বড়। তারা পাল্টা আক্রমণ করে। মুখোমুখি যুদ্ধের একপর্যায়ে তাঁদের দলনেতা লেফটেন্যান্ট মেহবুবুর রহমান (বীর উত্তম) পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ে পড়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়েন।

দলনেতার জীবন বাঁচাতে আলী আশরাফ ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা তখন নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। তাঁদের ঝটিকা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই সুযোগে লেফটেন্যান্ট মেহবুবুর রহমান নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু আলী আশরাফ পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা গুলিবর্ষণে গুরুতর আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

যুদ্ধ শেষে আলী আশরাফের মরদেহ তাঁর সহযোদ্ধারা উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে সমাহিত করেন বসন্তপুরে। তাঁর সমাধি সেখানে সংরক্ষিত।

আলী আশরাফ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ তাঁর ইউনিট মোতায়েন ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি গাড়িচালক ছিলেন। ২৭ মার্চ মেজর শাফায়াত জামিলের (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ২ নম্বর সেক্টরের নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে তিনি যুদ্ধ করেন। তাঁর আরেক ভাই সিরাজুল ইসলামও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ইনফরমার ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমাম উজ-জামান, বীর বিক্রম

বিয়ানীবাজার, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা মোদাচ্ছের আলী চৌধুরী, মা মাহমুদুনেছা বেগম। স্ত্রী ইসরাত ইমাম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬।

৬ নভেম্বর ১৯৭১। মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টরের হেডকোয়ার্টার্সে ডাক পড়ল লেফটেন্যান্ট ইমাম উজ-জামানের। তখন বিলুনিয়া পকেট পুরোপুরি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে। তাঁর ওপর ভার পড়ল বিলুনিয়া রেলস্টেশন থেকে শুরু করে ফেনী পর্যন্ত পকেটটি মুক্ত করার। পরশুরাম, চিথলিয়া, ফুলগাজী, মুন্সিরহাটে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের মজবুত ঘাঁটি। সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মিত্রবাহিনীর মেজর জেনারেল হীরা ইমাম উজ-জামানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তিনি দৃঢ়ভাবে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।

বিলুনিয়ার তিন দিকই ভারত সীমান্তে পরিবেষ্টিত। তাই ইমাম উজ-জামান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতের এক প্রান্তের সীমান্ত থেকে পরশুরাম-চিথলিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত সীমান্তের অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবরোধ করার। এ অবরোধ যদি সফল হয়, তবে পাকিস্তানি সেনারা সহজেই ফাঁদে আটকা পড়বে।

রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা। মুক্তিযোদ্ধারা অনুপ্রবেশ শুরু করলেন। পাকিস্তানি সেনারা বুঝতেও পারল না, তাদের জালে আটকানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসছে। সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিঃশব্দে পথ চলছেন। মুহুরী নদী ও আরেক নদীর কোথাও বুক, কোথাও কোমর পানি। পিচ্ছিল রাস্তা। অন্ধকারের জন্য কাছেও কিছু দেখা যায় না। ভোর হওয়ার আগেই সব কাজ শেষ। পাকিস্তানি সেনারা তখন মুক্তিযোদ্ধাদের অবরোধের মধ্যে।

তারপর সকালে বিলুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ শুরু হলো। ইমাম উজ-জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দুই দিন যুদ্ধের পর বিলুনিয়ার বিরাট এলাকা মুক্ত করলেন। ৮০ শতাংশ পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে নিহত হলো। অভাবনীয় ও অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখা গেল পাকিস্তানি সেনাদের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। ধানখেত, বাংকার, খাল—কোথাও ফাঁক নেই। লাশের ফাঁকে আহত অনেকে কাতরাচ্ছে বাঁচার আশায়।

ইমাম উজ-জামান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে নবীন সেনা কর্মকর্তা (লেফটেন্যান্ট) হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টে। ২৫ মার্চ রাতে তাঁকে আরও কয়েকজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে বন্দী করা হয়। ৩০ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের বন্দী অবস্থায় গুলি করে। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে যান। পরে কৌশলে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে একটি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজনগর সাবসেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

ইমাম উজ-জামান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে ২০০৩ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর নেন। তখন তিনি বগুড়া সেনানিবাসের জিওসি ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ আর আজম চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম বাজিতপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বাবা আফতাবউদ্দিন চৌধুরী, মা হালিমা চৌধুরী।
স্ত্রী জেসমিন চৌধুরী। তাঁদের তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ০৮। মৃত্যু ২০০২।

সোনাবাড়িয়া সাতক্ষীরা জেলা সদর থেকে উত্তরে। কলারোয়া উপজেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮-২০ তারিখে এখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এ আর আজম চৌধুরী।

এ আর আজম চৌধুরী তখন কুষ্টিয়া অঞ্চলে যুদ্ধরত ছিলেন। এই যুদ্ধের জন্য তাঁকে সেখান থেকে হাকিমপুরে আনা হয়। তাঁর দলে ছিল ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে সোনাবাড়িয়ায় পৌঁছান।

যুদ্ধের ছক অনুসারে সোনাবাড়িয়ায় যে স্থানে তাঁদের অবস্থান নেওয়ার কথা, সেখানে বাস্তবে ১০০ গজের বেশি উন্মুক্ত স্থান ছিল না। এ জন্য তিনি আরও ৫০০ গজ সামনে এগিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। সেখানে ছিল একটি নালা।

১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার দিকে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে হাজির হয় একদল পাকিস্তানি সেনা। তারা আসে একটি জিপ, একটি পিকআপ এবং তিনটি তিন-টনি লরিতে চেপে। সেগুলো আওতায় আসামাত্র এ আর আজম চৌধুরীর সংকেতে গর্জে ওঠে সব মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গোলাগুলি চলে বিকেল পর্যন্ত।

এরপর পাকিস্তানি সেনারা আর্টিলারির সহায়তায় পিছিয়ে যায়। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২০-২২ জন হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন শহীদ হন। পরের দিনও সেখানে যুদ্ধ হয়। সেদিন পাকিস্তানি সেনারা দুই দিক থেকে আক্রমণ করে। এ আর আজম চৌধুরী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে সাহসের সঙ্গে ওই আক্রমণ প্রতিহত করেন।

২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ দিনও তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স থেকে তাঁকে পশ্চাদপসরণ করতে বলা হয়। তখন তিনি পশ্চাদপসরণ করে হাকিমপুরে ফিরে যান।

এ আর আজম চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৭১ সালে প্রেষণে যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীন ৪ নম্বর উইংয়ে সহকারী অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কুষ্টিয়ার যুদ্ধে এ আর আজম চৌধুরী সার্বিক নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ মার্চ ভোর পাঁচটার সময় কুষ্টিয়ায় আক্রমণ করেন। ৩১ মার্চ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এ আর আজম চৌধুরী প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে ৪ নম্বর সেক্টরের লালবাজার সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বেশির ভাগ যুদ্ধেই তিনি অগ্রভাগে থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমান

বীর বিক্রম

কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ। বাবা সাইদুর রহমান, মা রেহান আরা খাতুন। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩। ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত।

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার হেঁয়াকো। রামগড় থেকে ১৬ কিলোমিটার এবং চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। করেরহাট-রামগড় সড়ক হেঁয়াকোতে এসে উত্তরে বাঁক নিয়ে আবার পুবদিকে পাহাড়ি এলাকায় গেছে।

ভৌগোলিক ও সামরিক দিক থেকে হেঁয়াকো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অদূরেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটিতে ছিল বিপুলসংখ্যক সেনা ও তাদের সহযোগী। ২৭ জুলাই এ ওয়াই এম মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা হেঁয়াকোর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি কল্পনাও করেনি। কারণ, হেঁয়াকো বেশ দুর্গম ও মিজো-অধ্যুষিত এলাকা। মিজোরা ছিল তাদের সহযোগী।

মুক্তিযোদ্ধা ছিল মাত্র এক প্লাটুন। অন্যদিকে ওই ঘাঁটিতে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের (প্রশিক্ষিত মিজো) সংখ্যা ছিল তিন গুণেরও বেশি। প্রায় ১২ মাইল দূর থেকে এসে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারাও তৎপর হয়ে ওঠে। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। আধঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে চারজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। সেখানে ছিল সেনাবাহিনীর কয়েকটি গাড়ি। মুক্তিযোদ্ধাদের ছোড়া মর্টারের গোলার আঘাতে এগুলোর বেশির ভাগই ক্ষতিগ্রস্ত এবং একটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

সেদিন যুদ্ধে মাহফুজুর রহমান দলনেতা হিসেবে যথেষ্ট সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেন। যুদ্ধ চলাবস্থায় পাকিস্তানি সেনা ও মিজোরা মুক্তিযোদ্ধাদের এই ছোট দলটিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। তখন তিনি সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তাঁর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধিমত্তায় সহযোদ্ধারা চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পান।

পাকিস্তানি ও মিজোদের মতলব বুঝতে পেরে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাহফুজুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে সহযোদ্ধাদের নিয়ে দ্রুত পেছনে হটে যান। ফলে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে নিজেদের শিবিরে ফিরে যেতে সক্ষম হন।

মাহফুজুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট।

প্রতিরোধযুদ্ধকালে তিনি চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে কৃষি ভবনে হামলা, মহালছড়ির যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য।

এরপর ভারতে যান। সেখানে সংগঠিত হওয়ার পর তিনি ১ নম্বর সেক্টরে প্রথমে শ্রীনগর, পরে মনুঘাট সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ টি এম হামিদুল হোসেন, বীর বিক্রম

সদর উপজেলা, বগুড়া। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৪২৪, সড়ক ৩০, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা আবদুল আজিজ, মা মনোয়ারা হামিদ। স্ত্রী আজিজুন নেছা শাম্মী। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৯।

সকালে শুরু হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। অস্ত্র, গোলাবারুদ সবই পরীক্ষা করে নেওয়া হলো। এরপর সবাই ঘুমোতে গেলেন। কারণ, সারা রাত জেগে কাটাতে হবে। রাত ৯-১০টার মধ্যে সবাই উঠে পড়লেন। আক্রমণের জন্য যাত্রার নির্ধারিত সময় রাত ১১টা। এফইউপিতে (ফর্মি আপ প্লেস) পৌঁছার সময় রাত সাড়ে চারটা। আক্রমণের সময় ভোর সাড়ে পাঁচটা।

শীতের অন্ধকার রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। এ টি এম হামিদুল হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সেনারা অ্যাসেম্বলি এরিয়ায় সমবেত হলেন নির্ধারিত সময়েই। তখন রাত আনুমানিক তিনটা। সেখানে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি দিয়ে রওনা হলেন এফইউপির উদ্দেশে। মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী মিলে প্রায় ৭০০ জন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। শুধু ইশারায় কাজ হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সেনারা এফইউপিতে অবস্থান নিলেন। তারপর সময় গড়াতে থাকল।

এইচ আওয়ার (আক্রমণের সময়) আর মাত্র তিন মিনিট। এ টি এম হামিদুল হোসেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতে অস্ত্র, ট্রিগার হাতে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছেন, এ সময় নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিকট শব্দ। আক্রমণের তখনো আড়াই মিনিট বাকি। মিত্রবাহিনীর একজন সেনার হাত থেকে উত্তেজনায় পিন খোলা গ্রেনেড মাটিতে পড়ে এই বিপত্তি। পাকিস্তানি সেনারা বুঝে গেল তাদের ওপর আক্রমণ আসন্ন। সঙ্গে সঙ্গে তারা আক্রমণ শুরু করল।

এ সময় মিত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। প্রথম লেয়ার শেষ হওয়ামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা এ টি এম হামিদুল হোসেনের নেতৃত্বে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে গুলি করতে করতে ধাবিত হলেন পাকিস্তানি অবস্থানের দিকে।

শুরু হলো ডগফাইট। একটু পর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাংকারগুলোতে গ্রেনেড চার্জ করতে শুরু করলেন। কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে এল। এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বরে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে। সেদিন সূর্য ওঠার আগেই ফুলবাড়ির অপারেশন শেষ হয়। এ যুদ্ধে আটজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

এ টি এম হামিদুল হোসেন ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৭ নম্বর সেক্টরের তপন সাবসেক্টরে। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করেন।

এ টি এম হামিদুল হোসেন ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে কমিশন লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে তাঁকে অকালীন অবসর দেওয়া হয়। তখন তাঁর পদবি ছিল মেজর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী

বীর বিক্রম

জেলা, সিলেট। বাবা এম এ নূর।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। বর্তমানে পলাতক।

এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধকালে ধলই বিওপির যুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর ভোরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ধলই বিওপির অবস্থান মৌলভীবাজার জেলায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

২৭ অক্টোবর রাতে নূর চৌধুরীসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিল কয়েকটি দল (কোম্পানি)। তাঁরা নিঃশব্দে সমবেত হন এফইউপিতে। তখন সময় আনুমানিক সাড়ে তিনটা। এফইউপির ৬০০ গজ দূরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি ও প্রতিরক্ষা।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের মূল দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা অ্যাসল্ট ফরমেশনে (আক্রমণ শুরু) যাওয়ার আগেই আক্রান্ত হন। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গোলাগুলি শুরু করে। এর ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে মুক্তিযোদ্ধাদের ডান-বাম—দুই প্লাটুনেরই অগ্রযাত্রা থমকে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার অ্যান্ড মুভ পদ্ধতিতে সামনে এগোতে থাকেন। তখন নূর চৌধুরী ও তাঁর উপদলের প্লাটুন হাবিলদার পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে আহত হন। ফলে তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

অন্যান্য উপদলের মুক্তিযোদ্ধারাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। সেখানে উঁচু টিলার ওপর ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এইচএমজির পোস্ট। এইচএমজির নিখুঁত গুলিবর্ষণের কারণে এগোনো যাচ্ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা ওই এইচএমজি পোস্ট ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। অনেক মুক্তিযোদ্ধা এইচএমজির গুলিতে হতাহত হন।

এ অবস্থায় ডেফথ প্লাটুনের সুইসাইডাল গ্রুপের ওপর দায়িত্ব পড়ে এইচএমজি পোস্ট ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় করার। এ দলের অসীম সাহসী যোদ্ধা হামিদুর রহমান (বীরশ্রেষ্ঠ) এইচএমজি পোস্ট ধ্বংস করতে সক্ষম হন। এই পোস্ট ধ্বংস করতে গিয়ে শহীদ হন তিনি। সেদিন শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ সফল হয়নি।

এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে ভারতে যান। তাঁকে মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে কর্নেল এম এ জি ওসমানীর (পরে জেনারেল) এডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত হন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী কামালউদ্দীন আহমেদ

বীর বিক্রম

গ্রাম সাকাশ্বর, উপজেলা কালিয়াকৈর, গাজীপুর। বাবা কাজী রইসউদ্দীন আহমেদ, মা সুরাইয়া বেগম। স্ত্রী খাদিজা কামাল। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৬। গেজেটে নাম কাজী কামালউদ্দীন। মৃত্যু ২০১২।

কাজী কামালউদ্দীন ১৯৭১ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকার ধানমন্ডিতে গেরিলা অপারেশন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। সেই অপারেশনের বর্ণনা আছে হাবিবুল আলমের (বীর প্রতীক) লেখায়। তিনি লিখেছেন, '...২৮ নম্বরে (ধানমন্ডি) গিয়ে আমরা প্লান করলাম একটা অ্যাকশন করা দরকার খুব সিরিয়াস টাইপের এবং ইট শুড রিয়েলি বদার দ্য আর্মি।

'আগস্ট মাসের ২৫ তারিখে সকাল থেকে আমরা খুব ওরিড এবং আপসেট ছিলাম। কারণ এবার আমাদের টার্গেট ছিল অ্যাটাক অন দ্য মুভ। খুবই বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। বাট ইট ক্যান পে ব্যাক কোয়াইট এ লট। অপারেশনের জন্য গাড়ি দরকার। গাড়ি ম্যানেজ করার ভার পড়ল আমার ও বদির ওপর।

'গাড়ি নিয়ে যখন ২০ নম্বরের সামনে গেলাম, দেখলাম নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে কোনো পুলিশ বা পাকিস্তানি ফোর্স নেই। ওই চাইনিজ অ্যাম্বেসির সামনে! আমরা গাড়ি টার্ন করে ১৮ নম্বরে ঢুকলাম। জাস্টিস জব্বার খানের আগের বাড়িটিতে দেখলাম প্রায় আটজন পাকিস্তানি আর্মি বসে আড্ডা মারছে। কেউ দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে টার্ন নিলাম। কাজী (কাজী কামালউদ্দীন আহমেদ) ও বদিকে ফায়ার করতে বলা হলো। আটজনই পড়ে গেল। আমরা খুব আনন্দিত হলাম যে, এত সহজে আটজন শেষ!

'৭ নম্বর দিয়ে বেরিয়ে পাঁচ নম্বরের সামনে আসতেই দেখি সামনে লাইন ধরে পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার মানে চেক হচ্ছে। আমরা কিছুটা চিন্তিত, নার্ভাস এবং উত্তেজিত। রাস্তাটা পুরো কর্ডন করা। ওরা (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) গাড়িটাকে থামাতে বলল। আমি প্রথমে ডান দিকে পরে বাঁ দিকে টার্ন নিলাম। বদি, কাজী ও স্বপন ফায়ার ওপেন করল। এখানে যারা ছিল একজনও যদি বাঁচত! আমার যতদূর মনে হয় একজনও বাঁচেনি।'

কাজী কামালউদ্দীন ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। পাশাপাশি বাস্কেট বলও খেলতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে পালিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে ভারতের মেলাঘরে যান। সেখানে তাঁদেরসহ ঢাকার আরও কয়েকজনকে নিয়ে গঠন করা হয় ক্র্যাক প্লাটুন। প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে দুঃসাহসী গেরিলা অপারেশন করেন।

২৫ আগস্টের অপারেশনে কাজী কামালউদ্দীন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। সবাই নিরাপদ এলাকায় যেতে সক্ষম হন। তবে এ অপারেশনের কয়েক দিন পর তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পাকিস্তানিরা পরে তাঁদের হত্যা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরুল হক, বীর বিক্রম

৪২২ মালিবাগ, ঢাকা। বাবা শামসুল চৌধুরী,
মা আনোয়ারা বেগম। স্ত্রী রোজি হক।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৫। গেজেটে নাম স্বপন।

মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য ছিলেন কামরুল হক (স্বপন)। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা ১৯৭১ সালের ২৫ আগস্ট ধানমন্ডিতে অপারেশন করেন।

তাঁদের পরিকল্পনা ছিল পুরাতন ২০ নম্বর রোডে চীনা দূতাবাসের সামনে এবং ১৮ নম্বর রোডে বিচারপতি আবদুল জব্বার খানের বাসার সামনে অপারেশন করার। সেখানে পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ পাহারায় থাকত।

সন্ধ্যার আগে গাড়িতে করে তাঁরা প্রথমে ২০ নম্বর সড়কে যান। কিন্তু তখন নির্দিষ্ট স্থানে পাকিস্তানি সেনা-পুলিশ কেউ ছিল না। এরপর তাঁরা ১৮ নম্বরে যান। সেখানে বিচারপতি আবদুল জব্বার খানের বাড়ির সামনে আটজন পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ বসে আড্ডা মারছিল। তাঁর দুই সহযোদ্ধা পাকিস্তানিদের গুলি করেন। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি সেনাদের কেউ পাল্টা গুলি করে কি না, তা লক্ষ রাখা।

সফলতার সঙ্গেই মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন করেন। ফিরে যাওয়ার পথে তাঁরা চরম ঝুঁকির মুখে পড়েন। ৫ নম্বর সড়কের মুখে মিরপুর রোডে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবরোধের মধ্যে পড়েন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল তখন সেখানে তল্লাশি শুরু করে। ওখানে দুটি ট্রাক মিরপুর রোডে সামনের দিকে, একটা জিপ রাস্তার ডান দিকে এবং আরেকটা জিপ পেট্রলপাম্পের সামনে নিউ মার্কেটের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো ছিল।

পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের গাড়ি থামাতে বলে। তাঁরা গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করে ডান দিকে বাঁক নেন। পাকিস্তানি সেনারা গালি দিয়ে তাঁদের বলে, 'কিধার যাতা? রোখো।' তৎক্ষণাৎ তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কামরুলের সহযোদ্ধা হাবিবুল আলম দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে এগিয়ে যান। তিনি, কাজী কামাল ও বদিউল চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি শুরু করেন।

ওখানে পাকিস্তানি সেনা যারা দাঁড়িয়ে ও শুয়ে ছিল, বেশির ভাগ নিহত হয়। বাকিরা আহত হয়। কামরুল ও তাঁর সহযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। এরপর তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে এক মিনিটের মধ্যে গ্রিন রোডের মোড় দিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। এ অপারেশনের পর প্রাদেশিক সরকারের বেসামরিক প্রশাসনসহ সামরিক প্রশাসনেও ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

কামরুল হক ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে ভারতে যান। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

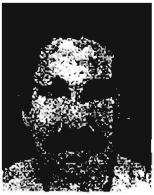

খন্দকার মতিউর রহমান, বীর বিক্রম

গ্রাম আদিয়াবাদ, উপজেলা রায়পুরা, নরসিংদী।
বর্তমান ঠিকানা তেলানগর, সদর উপজেলা, নরসিংদী।
বাবা খন্দকার সদরউদ্দীন আহমেদ, মা জামিলা খাতুন।
স্ত্রী সাহেরা খাতুন ও নাজমা খাতুন। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯২।

সকালেই চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, রংপুর থেকে আসা পাকিস্তানি সেনারা শহরের উপকণ্ঠ থেকে পালিয়ে গেছে। সারা শহরে আনন্দের ঢেউ। এরপর প্রতিরোধযুদ্ধরত ইপিআর সদস্যরা সমবেত হলেন শহরের সার্কিট হাউসে। তাঁদের একটি অংশের নেতৃত্বে খন্দকার মতিউর রহমান। ইপিআর সদস্যরা সংখ্যায় মোট ৩৯ জন। তাঁরা সবাই মিলে শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে থাকা সেনাক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিলের। ঘটেছিল বগুড়ায়।

প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে ২৮ মার্চ রাতে পাশের নওগাঁ জেলা থেকে খন্দকার মতিউর রহমানসহ একদল ইপিআর সদস্য বগুড়ায় এসে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রংপুর থেকে আসা পাকিস্তানি সেনারা ৩১ মার্চ রাতে বগুড়া থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে, বগুড়া শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে আড়িয়াবাজারে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদের ডিপো। পাশে ছোট সেনাক্যাম্পে ছিল সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট। এর কর্মকর্তাদের সবাই অবাঙালি হলেও সেনাদের বেশির ভাগ ছিল বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখানকার বাঙালি সেনাসদস্যদের নিরস্ত্র করে বন্দী করা হয়। দু-তিনজন প্রতিবাদ করায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্যাম্পের ভেতরে ঘটনা হলেও খবরটা আর চাপা থাকে না।

AMARBOI.COM

আড়িয়াবাজার ক্যাম্পে অবরুদ্ধ বাঙালি সেনাদের কথা জানার পর খন্দকার মতিউর রহমান ১ এপ্রিল সেখানে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধা দলের ৫০ জন পুলিশ সদস্য ও ২০ জন অস্ত্রধারী স্বেচ্ছাসেবক। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁরা তিন দিক থেকে আড়িয়াবাজারের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করেন। দুই পক্ষে শুরু হয় পাল্টাপাল্টি গুলি। পাকিস্তানি সেনারা অবিরাম গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। ঘণ্টা খানেক পর খবর পেয়ে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর বিমান আকাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারাও সবকিছু উপেক্ষা করে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। স্থানীয় গ্রামবাসীও মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে। আড়িয়াবাজারের যুদ্ধে খন্দকার মতিউর রহমান যথেষ্ট বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সে যুদ্ধে একজন প্রতিরোধযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদ হন।

খন্দকার মতিউর রহমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন নওগাঁ ইপিআর উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। আড়িয়াবাজার যুদ্ধের পর তিনি যুদ্ধ করেন পাবনা জেলার কাশিনাথপুরে, পরে ৩ নম্বর সেক্টরের আশ্রমবাড়ী সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার রেজানুর হোসেন, বীর বিক্রম

গ্রাম পাচুরিয়া, ইউনিয়ন লাউহাটি, উপজেলা দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল। বাবা খন্দকার হায়দার আলী, মা সৈয়দা রোকেয়া বেগম। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৭৩। শহীদ ২৩ অক্টোবর ১৯৭১।

অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে থাকলেন গোয়াইনঘাটের উদ্দেশে। তাঁরা কয়েকটি দল। একটি দলে আছেন খন্দকার রেজানুর হোসেন। তিনি মেশিনগান প্লাটুনের সহ-মেশিনগান চালক। গোয়াইনঘাটে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী এক ঘাঁটি। সিলেট জেলার অন্তর্গত গোয়াইনঘাট। উপজেলা সদরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে সুরমা নদী। তিন দিক ঘেরা নদীটি পূর্বপারে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহকে যথেষ্ট সুবিধাজনক করেছে।

তখন ২৩ অক্টোবর মধ্যরাত (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২৪ অক্টোবর)। মুক্তিযোদ্ধারা নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সীমান্ত এলাকা থেকে গোয়াইনঘাটের কাছাকাছি পৌঁছালেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। ভোরে পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর একযোগে আকস্মিক আক্রমণ চালাল। একটি দল গোয়াইনঘাট-রাধানগর সড়ক এলাকার দিক থেকে, অপর দল নদী পার হয়ে পশ্চিম দিক থেকে, আরেকটি লেংগুয়া গ্রাম বাইপাস করে এসে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পশ্চিম দিকের আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ল। এই অবস্থানেই মেশিনগান নিয়ে চালকের সঙ্গে ছিলেন খন্দকার রেজানুর হোসেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। একপর্যায়ে দেখা গেল, মুক্তিযোদ্ধাদের ওই অবস্থানে শুধু খন্দকার রেজানুর হোসেন ও মেশিনগান চালকসহ কয়েকজন আছেন।

পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে মাথা তোলা যাচ্ছে না। ঝুঁকি নিয়ে খন্দকার রেজানুর হোসেন ও মেশিনগান চালক মেশিনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে থাকলেন। তাঁদের বীরত্বে সাময়িকভাবে থেমে গেল পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। একসময় পাকিস্তানি সেনারা তাদের মেশিনগানের অবস্থান চিহ্নিত করে তাঁদের অবস্থানে দুই ইঞ্চি মর্টারের আক্রমণ চালায়। তাতেও তাঁরা বিচলিত হননি। মেশিনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারেননি।

পাকিস্তানি সেনারা দুই ইঞ্চি মর্টারের গোলা ছুড়ে খন্দকার রেজানুর হোসেনদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সেই সুযোগে পাকিস্তানি সেনাদের আরেক দল তাঁদের ওপর অবিরাম গুলি চালায়। তখন গুলিবিদ্ধ হয়ে খন্দকার রেজানুর হোসেন ও মেশিনগান চালক দুজনই শহীদ হন। এ দুজন জীবন দিয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

খন্দকার রেজানুর চাকরি ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১-এ এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মার্চ মাসে রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানি ছাড়া অন্যান্য কোম্পানিকে (এ, বি, সি, ডি) সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। তিনি ছিলেন হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানির মেশিনগান প্লাটুনের নবীন সৈনিক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

বীর বিক্রম

গ্রাম পায়েলগাছা, বরুড়া, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা ১০৯ পার্ক রোড, ব্লক এ, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, মা আফসারের নেছা। স্ত্রী মাহমুদা চৌধুরী। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৫।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ১৯৭১ সালে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী ইপিআর সেক্টরের ৭ নম্বর উইংয়ে। এর অবস্থান নওগাঁয়। তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন এবং তিনি উইংয়ের সহকারী অধিনায়ক ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

গিয়াসউদ্দিন ২৮ মার্চ নওগাঁ থেকে একদল ইপিআর সেনা নিয়ে বগুড়ায় যান। রংপুর থেকে বগুড়ায় আসা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলকে তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের একাংশ ৩০ মার্চ অ্যামবুশ করে। এ অ্যামবুশে পড়ে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী পরে গোদাগাড়ীতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইপিআর সেনাদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের নিয়ে রাজশাহীতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। ইপিআর সেনা ও স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে ৬ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে আক্রমণ চালান। কয়েক দিন ধরে সেখানে যুদ্ধ হয়। তাঁদের আক্রমণে রাজশাহীতে পাকিস্তানি সেনাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১২ এপ্রিল গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী একদল (এক কোম্পানি) সহযোদ্ধা নিয়ে পাবনার দিকে অগ্রসর হন। কিছুদূর (১০ মাইল) যাওয়ার পর তিনি ঢাকা থেকে আগত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড় দলের মুখোমুখি হন। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে কিছুটা পিছু হটে রাজশাহী ও সারদার মোড়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

সেখানে আগে থেকেই গিয়াসউদ্দিনের অধীন মিশ্র বাহিনীর আরেক দল মুক্তিযোদ্ধা প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। তাঁরা সবাই মিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তখন সেখানে দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

গিয়াসউদ্দিন ছত্রভঙ্গ মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশকে সংগঠিত করে পুনরায় গোদাগাড়ীতে অবস্থান নেন। রাজশাহী দখলের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গোদাগাড়ী আক্রমণ করে। ২২ এপ্রিল তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে ভারতে যান। ফিরে এসে সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওই এলাকায় অনেক গেরিলা অপারেশন করেন। এ সময় তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন এবং প্রায় ১০ সপ্তাহ হাসপাতালে থাকেন।

এর মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। গিয়াসউদ্দিনের যুদ্ধ এলাকা ৭ নম্বর সেক্টরের আওতায় পড়ে। তখনো তিনি পুরোপুরি সুস্থ হননি। চিকিৎসক ও সহযোদ্ধাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। এরপর তিনি লালগোলা সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাবসেক্টরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অগ্রভাগেও ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম মোস্তফা খান, বীর বিক্রম

গ্রাম কুটি, উপজেলা কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা গোলাম পাঞ্জত আলী, মা রাহেলা খাতুন।
স্ত্রী জ্যোৎস্না বেগম। তাঁদের পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭২। গেজেটে নাম গোলাম মোস্তফা কামাল। ভুল করে শহীদ দেখানো হয়েছে।

গোলাম মোস্তফারা নিঃশব্দে এফইউপিতে সমবেত হন। এর অদূরেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। তাঁদের সমন্বিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরে। এরপর পাকিস্তানিরা দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের শেলপ্রুফ বাংকারে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনের বাইরে একটি গাছের ওপর ছিল তাদের সুরক্ষিত গোপন পর্যবেক্ষণ পোস্ট। সেখান থেকে দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সম্পর্কে বাংকারে খবর পাঠায়। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানিরা গোলা ছোড়ে। এটা গোলাম মোস্তফা খানসহ মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে বুঝতে পারেননি। তাঁদের এক সহযোদ্ধা সেটি দেখতে পেয়ে তাঁকে জানান।

গোলাম মোস্তফা খানের কাছে ছিল এলএমজি। তিনি এলএমজি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পর্যবেক্ষণ পোস্টের কাছে যান এবং আক্রমণ করেন। তাঁর এলএমজির ব্রাশফায়ারে পর্যবেক্ষণ পোস্ট ধ্বংস ও পাকিস্তানি সেনারা নিহত হয়। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা কমে যায়।

এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাইয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কামালপুরে। এটি জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ছিল। চারপাশে ছিল বাংকার। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছিল ঘাঁটি। বিছানো ছিল অসংখ্য মাইন ও বুবি ট্র্যাপ। এ ছাড়া কয়েকটি গাছের ওপর ছিল তাদের পর্যবেক্ষণ পোস্ট।

সেদিন যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা সাহসের সঙ্গে পার হয়ে মূল প্রতিরক্ষায় ঢুকে যান। গোলাম মোস্তফা খানের অনেক সহযোদ্ধা মাইন ও গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এর পরও তাঁরা থেমে যাননি। দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় প্রতিশোধের নেশায় এগিয়ে যান। অবশ্য বিজয়ী হতে পারেননি। হেরে গিয়েও দেশমাতৃকার ভালোবাসায় জয়ী হন তাঁরা।

গোলাম মোস্তফা খান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানে। ১৯৭০ সালের শেষ থেকে ছুটিতে ছিলেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি ছুটি শেষে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য ঢাকা সেনানিবাসের ট্রানজিট ক্যাম্পে ছিলেন। ২৫ মার্চের পর আটক করা হয় তাঁকে। কিছুদিন পর পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ তাঁকেসহ আটক আরও অনেক বাঙালি সেনাকে ট্রেনযোগে রংপুর সেনানিবাসে পাঠায়। পথিমধ্যে এক স্টেশনে ট্রেন যাত্রাবিরতি করলে তিনিসহ কয়েকজন প্রহরারত পাকিস্তানি সেনাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান। পরে জামালপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান

বীর বিক্রম

আফজাল খান রোড, সিরাজগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৩০২, সড়ক ৬, বসুন্ধরা-বারিধারা, ঢাকা। বাবা গোলাম আরব আলী খান, মা সৈয়দা আফ্জা খান। স্ত্রী মুনিরা মোর্শেদ খান। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। সনদ নম্বর ২০।

২৩ মে ১৯৭১। গোলাম হেলাল মোর্শেদ খানের নেতৃত্বে সীমান্ত এলাকা থেকে মাধবপুরের দিকে রওনা হন একদল মুক্তিযোদ্ধা। বেলা দুইটার দিকে তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছান। কিন্তু সেদিন পাকিস্তানি সেনারা আসেনি। গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান হতাশ না হয়ে রাতে সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখানেই থাকেন। সবাই বৃষ্টিতে ভেজেন। সারা রাত ঘুমাননি। সকাল হওয়ার পর পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে আবার অ্যামবুশস্থলে আসেন।

বেলা আড়াইটার দিকে পাকিস্তানি সেনাদের কনভয় আসে। জিপ, লরি ও পিকআপ মিলে কনভয়ে মোট ২২টি গাড়ি ছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাড়ি (জিপ) পার হয়ে যায়। মাইন বিস্ফোরিত হয়নি। চতুর্থটি (পিকআপ) পার হওয়ার সময় মাইন বিস্ফোরিত হয়। সেটি উড়ে গিয়ে কয়েক গজ দূরে পড়ে। দ্বিতীয় গাড়িরও একই ভাগ্য ঘটে।

এ সময় হেলাল মোর্শেদ সংকেত দিলে সহযোদ্ধাদের অস্ত্র গর্জে ওঠে। হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। অক্ষত পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি করে নিরাপদ আশ্রয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে আসেন।

গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। ২৫ মার্চের পর ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের যুদ্ধে তিনি আহত হন।

হেলাল মোর্শেদ একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আশুগঞ্জের দুই মাইল দক্ষিণে লালপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিলেন। ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি নৌবাহিনীর একটি বহর লালপুরের কাছে মেঘনা নদীতে অবস্থান নেয়। তারা অবতরণের স্থান পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করতে থাকে। তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর সংকেত বা নির্দেশ ছাড়াই উত্তেজনার বশে গুলি করে। এতে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের প্রতিরক্ষা স্থান চিহ্নিত করে ফেলে এবং ট্যাংকের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিক্রমের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণের প্রচণ্ডতায় পাকিস্তানি নৌবহর পিছু হটে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর স্যাবর জেট তাঁদের অবস্থানে আকাশ থেকে গোলাগুলি শুরু করে।

হেলাল মোর্শেদ চরম বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও বিচলিত হননি। সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধও করেন। কিন্তু জল-স্থল-আকাশপথের ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণে তাঁরা সেখানে টিকতে পারেননি। একপর্যায়ে তিনিসহ অনেকে আহত হন। এ অবস্থায় তাঁরা পিছু হটে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম মিরাসানির নোয়াবাদী, উপজেলা বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মোহাম্মদ আলী ভূঁইয়া, মা দুধরাজ বিবি। স্ত্রী সাজেদা মাহমুদা। তাঁদের তিন মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৪। মৃত্যু ১৯৮৪।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে জনাব আলীসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন মনতলায়।

তেলিয়াপাড়া দখল করার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করে মনতলা দখলের জন্য। এখানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দল। আখাউড়া-সিলেট রেলপথের দুই ধারে তাঁরা মোতায়েন ছিলেন। জনাব আলীসহ মুক্তিযোদ্ধা দলের (কোম্পানি) অবস্থান ছিল মনতলা রেলস্টেশনে। অপর দুই দলের একটি ছিল কাশিমপুর রেলস্টেশনে, আরেকটি হরষপুর রেলস্টেশন এলাকায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৫ জুন প্রথম দূরপাল্লার গোলাবর্ষণের মাধ্যমে জনাব আলী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণের সূচনা করে। এরপর কয়েক দিন ধরে সেখানে যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা দিনের বেলায় দূর থেকে হালকা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গোলাগুলি করে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যস্ত রাখত। রাতে ভারী মেশিনগানের গুলি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ করত। এর ছত্রচ্ছায়ায় তারা ক্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আসে। মুক্তিযোদ্ধারা মাঝেমধ্যে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দিলেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারেননি।

২০ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল জনাব আলীদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের একেবারে সামনে চলে আসে। একই সময় পাকিস্তানি সেনাদের অন্যান্য দলও বিভিন্ন দিক থেকে সেখানে এগিয়ে আসে। জনাব আলীরা বীরবিক্রমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। কিন্তু একটানা কয়েক দিন যুদ্ধ করে তাঁর বেশির ভাগ সহযোদ্ধা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ে।

অসমসাহসী জনাব আলী এতে দমে যাননি বা মনোবল হারাননি। সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। ২১ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি দল তিন দিক থেকে জনাব আলীদের অবস্থানে আক্রমণ চালায়। এদিন আক্রমণকারী পাকিস্তানি সেনারা সংখ্যায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েক গুণ বেশি। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তাঁদের অবস্থান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষে অধিনায়কের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে যান। ওই দিন মনতলার পতন হয়।

জনাব আলী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে মনতলায় অবস্থান নেন। মনতলার পতন হলে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরের পঞ্চবটী সাবসেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর ইমাম, বীর বিক্রম

মিজান রোড, ফেনী। বর্তমান ঠিকানা ২৬২/২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। বাবা শেখ ওয়াহিদুল্লাহ চৌধুরী, মা আজমেরি বেগম। স্ত্রী নূরমহল বেগম। নিঃসন্তান। খেতাবের সনদ নম্বর ১২।

ফেনী জেলার অন্তর্গত বিলুনিয়া। ১৬ মাইল লম্বা এবং ছয় মাইল প্রস্থ সরু এক ভূখণ্ড। এলাকাটি অনেকটা উপদ্বীপের মতো। প্রায় গোটা এলাকাই ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এর তিন দিকেই ভারত সীমান্ত।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিলুনিয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের অবরোধ করেন। তখন ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন জাফর ইমাম।

এ ঘটনা শোনা যাক জাফর ইমামের জবানিতে, 'ভোর হওয়ার আগেই আমরা সবাই আমাদের নির্ধারিত স্থানে হাজির হলাম। শত্রুদের পরশুরাম ও চিথলিয়া ঘাঁটি পুরোপুরি আমাদের অবরোধের মধ্যে আটকা পড়ল। চিথলিয়া ঘাঁটি থেকে যাতে কোনো প্রকার আক্রমণ না আসতে পারে, তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুললাম।

'৯ নভেম্বর। সকাল থেকে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শত্রুরা সারা দিন আমাদের বিভিন্ন পজিশনের ওপর তুমুলভাবে আক্রমণ চালাল। আমরাও আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দিলাম। বৃষ্টির মতো আর্টিলারি আর মর্টার শেলিংয়ের শব্দে আশপাশের নীরব এলাকা কেঁপে উঠতে থাকল। ক্রমে রাত হয়ে এল।

'তারপর ভোর হলো। সারা দিন যুদ্ধ চলল। বেলা চারটার দিকে শত্রুরা আমাদের ওপর বিমান হামলা শুরু করল। কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারল না। এদিন গেল। পরের দিনও আগের দিনের মতো ফায়ারিং, শেলিং, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলল। এদিনও তারা বিমান থেকে বোম্বিং শুরু করল।

'পাকিস্তানি পাইলটরা হয়তো জেনেছিল, আমাদের কাছে বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র নেই। তাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে নিচ দিয়ে বিমান চালাচ্ছিল। শেষরক্ষা হিসেবে আমরা আমাদের এলএমজি এ কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আওতায় আসামাত্র আমাদের সব এলএমজি একযোগে গর্জে উঠল। দুটি বিমান উড়ে গেল। একটি যেতে পারল না। শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। কোনো যুদ্ধের ইতিহাসে এলএমজি দিয়ে এর আগে বিমান ভূপাতিত করা হয়নি। আমরা তা-ই করতে পেয়েছি।'

জাফর ইমাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ১৯৭১ সালে ঢাকায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঢাকা থেকে পালিয়ে তাতে যোগ দেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের অধীন পুনর্গঠিত ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কের দায়িত্বও দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুম্মা মিয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম হেতিমগঞ্জ, উপজেলা গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বাবা ওসমান আলী, মা সরিফা খাতুন।
তাঁর এক ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৭। শহীদ এপ্রিল ১৯৭১।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত বিবিরবাজার, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। কুমিল্লা-বিবিরবাজার সড়কের উত্তরে প্রায় সমান্তরাল বহমান গোমতী নদী। নদীটি বিবিরবাজারের কাছে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। নদীর বাঁক ঘেঁষেই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিবিরবাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করে। ৩৯ বালুচ রেজিমেন্ট, গোলন্দাজ ও ট্যাংক বাহিনীর সমন্বয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ। তারা প্রথমে পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে দেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে হতাহত হয় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা।

এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ পিছু হটে যায়। দুটি দল সাহসের সঙ্গে তাদের অবস্থান ধরে রাখে। এই দুটি দলের একটির নেতৃত্বে ছিলেন জুম্মা মিয়া। তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাঁদের বীরত্বে থেমে যায় পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা।

AMARBOI.COM

পরের দিনও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। সেদিন মুক্তিবাহিনীর নতুন একটি দলও বিবিরবাজারে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি ও মনোবল বেড়ে যায়। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে।

বিবিরবাজার থেকে যখন-তখন কুমিল্লা সেনানিবাস ও বিমানবন্দরে আক্রমণ চালানো সম্ভব। তাই বিবিরবাজার দখলের জন্য পাকিস্তানি সেনারা মরিয়া হয়ে ওঠে। এ জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর কাছেও বিবিরবাজার ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের একাংশের পতন ঘটলেও জুম্মা মিয়া তাঁর দল নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন। কোনো কিছুই তাঁকে টলাতে পারল না, বরং তাঁর দলের পাল্টা আক্রমণে নিহত হলো অগ্রসরমাণ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। সেদিন পাকিস্তানি সেনারাও দুর্দমনীয়। একপর্যায়ে ট্যাংকের ছত্রচ্ছায়ায় তারা চলে এল জুম্মা মিয়াদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের খুব কাছে। বৃষ্টির মতো গুলি করতে করতে তারা এগোতে থাকল।

জুম্মা মিয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। এ সময় একঝাঁক গুলি ছুটে এল তাঁর দিকে। নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না তিনি। কয়েকটি গুলি বিদ্ধ হলো তাঁর শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়লেন মাটিতে। শহীদ হলেন তিনি। এর পর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিবিরবাজার দখল করে নেয়।

জুম্মা মিয়া চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম নাটেশ্বর, উপজেলা বিয়ানীবাজার, জেলা সিলেট।
বাবা শাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী, মা সুফিয়া চৌধুরী।
স্ত্রী আসমা চৌধুরী। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৪।

১৯৭১ সালে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মহকুমা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ২১-২৩ মার্চ তিনি ঝিনাইদহে কয়েকজন বাঙালি সহকর্মীর (বেসামরিক কর্মকর্তা) সঙ্গে মিলিত হন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেন যদি সামরিক সংঘর্ষ অবধারিত হয়, তবে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

২৫ মার্চ রাতেই তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী জনগণের সঙ্গে একাত্ম প্রকাশ করে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। ২৬ মার্চ তিনি দুটি চিঠি লিখে পাঠান ভারতে। একটি মেহেরপুর সীমান্তসংলগ্ন নদীয়া জেলার ডিসিকে। এর অনুলিপি দেন বিএসএফের স্থানীয় অধিনায়ককে (সিও)। দ্বিতীয় চিঠি ভারতের জনগণকে উদ্দেশ করে। দুটি চিঠিতেই ছিল তাঁর স্বাক্ষর ও সরকারি সিলমোহর। দ্বিতীয় চিঠিটি ২৭ মার্চ *অমৃতবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়।

এদিকে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর চিঠি পেয়ে নদীয়া জেলার ডিসি ও বিএসএফের অধিনায়ক (কর্নেল চক্রবর্তী) সাড়া দেন। তাঁদের আমন্ত্রণে ২৯ মার্চ তিনি ভারতের বেতাই বিওপিতে যান। তাঁরা বাংলাদেশের দূতকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বিএসএফের একটি ছোট দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর তাঁরা আলোচনা করেন।

পরদিন ৩০ মার্চ তিনি চুয়াডাঙ্গা যান। চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইংয়ের বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহের খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। এখানে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগের নেতা তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁদের তিনি ও ঝিনাইদহ মহকুমার পুলিশ প্রশাসক (এসডিপিও) মাহবুবউদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চ্যাংখালী চেকপোস্টে নিয়ে যান।

তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী প্রতিরোধযুদ্ধকালে সক্রিয় যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের নানা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ৩০ মার্চ মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর সার্বিক নেতৃত্বে প্রতিরোধযোদ্ধারা কুষ্টিয়া আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

পরে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম শুরু হলে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীকে বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সশস্ত্র যুদ্ধেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ৮ নম্বর সেক্টরের শিকারপুর সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান তিনি। পরে বেনাপোল সাবসেক্টরের অধিনায়ক হন। ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের কাঁঠালবাগান ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশের ভেতরে এসে পুটখালীতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৌহিদ আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম মুখিতলা, উপজেলা গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
বাবা মিছির আলী, মা মুল্লুকচান বিবি। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৭। গেজেটে নাম তৌহিদ।
শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে রাধাকান্তপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক ঘাঁটি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাধাকান্তপুর।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তৌহিদসহ (তৌহিদ আলী) একদল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন রাধাকান্তপুরের পাকিস্তানি সেনাঘাঁটির কাছে। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি উপদলে (প্লাটুন) বিভক্ত। প্রত্যেক দলে ২৪-২৫ জন করে সদস্য।

মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান। গুলি ও গোলার শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে পড়ে। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা সুরক্ষিত বাংকারে আশ্রয় নিয়ে ব্যাপক গোলাগুলির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

পাকিস্তানি সেনারা মাটি কামড়ে ঘাঁটিতে পড়ে থাকে। কোনোভাবেই তাদের হটানো সম্ভব হয় না। তখন মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধকৌশল পাল্টাতে হয়। অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত বাংকারে ঝটিকা আক্রমণের। এ জন্য মনোনীত হন তৌহিদসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা সহযোদ্ধাদের কাভারিং ফায়ারিংয়ের ছত্রচ্ছায়ায় প্রত্যেকে কয়েকটি গ্রেনেডসহ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যান পাকিস্তানি বাংকার লক্ষ্য করে।

AMARBOI.COM

তৌহিদ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক বাংকারের কাছে পৌঁছেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি বাংকারে দুটি গ্রেনেড ছোড়েন। নিখুঁত নিশানায় তা ভেতরে পড়ে। বাংকার প্রায় ধ্বংস ও সেখান থেকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সাফল্য ও জয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। অদম্য জয়ের নেশায় বাকি গ্রেনেডসহ আরেকটি বাংকারের দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য। পাকিস্তানিরা তাঁকে দেখে ফেলে। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে ব্যাপক গুলি শুরু করে।

অসংখ্য গুলি ছুটে আসে তৌহিদের দিকে। নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি তিনি। সে সুযোগও ছিল না। কয়েকটি গুলি সরাসরি আঘাত করে তাঁর শরীরে। ঢলে পড়েন তিনি। রক্তে ভেসে যায় মাটি। শহীদ হন তিনি। স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যোগ হয় আরেকটি নাম।

এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের মুহুর্মুহু আক্রমণের মুখে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তৌহিদসহ কয়েকজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা তৌহিদসহ শহীদ সহযোদ্ধাদের মরদেহ সমাহিত করেন রাধাকান্তপুরে। তাঁর সমাধিটি তাঁরা তখন চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর অস্তিত্ব নেই।

তৌহিদ চাকরি করতেন পুলিশ বাহিনীতে। নবীন সদস্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী পুলিশ লাইনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেলোয়ার হোসেন, বীর বিক্রম

গ্রাম দড়িভেলানগর, উপজেলা বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা জায়েদ আলী মুন্সি, মা মাছুমা খাতুন। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৮।
শহীদ ১৭ জুলাই ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেলোয়ার হোসেন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। আগে থেকেই তাঁর অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল। ভাবলেন, দেশের বিপদে তাঁর এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে হবে। মাত্র অল্প কিছুদিন হয় বিয়ে করেছেন। স্ত্রীকে জানালেন, দেশের এই দুঃসময়ে তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেন না। স্ত্রী তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে বিদায় দিলেন না।

দেলোয়ার হোসেন মাকে বোঝালেন, এর পরও মা তাঁকে বিদায় দেন না। ফলে সেদিন তাঁর আর বাড়ি থেকে যাওয়া হলো না। কয়েক দিন পর (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে) মায়ের কাছ থেকে প্রায় জোর করেই সম্মতি আদায় করে নিয়ে ভারতে চলে যান।

ভারতে গিয়ে দেলোয়ার হোসেন দেখা করেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কয়েক দিন থাকেন। পরে ১৮ জনের একটি দল গঠন করে সেই দলের নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় তাঁর ওপর। তাঁদের দেশের ভেতরে পাঠানো হয় হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে গেরিলাযুদ্ধ করার জন্য।

দেলোয়ার হোসেন তাঁর দল নিয়ে প্রথমে কিছুদিন কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থানে ছোটখাটো কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করেন। এরপর কুমিল্লা অঞ্চলে অবস্থান করা তাঁদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়লে তাঁরা চলে যান নোয়াখালীর মুক্ত এলাকায়। সেখানে অবস্থান নিয়ে তাঁরা মাঝেমধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালাতে থাকেন। আক্রমণ চালানোর পরই তাঁরা নিরাপদ স্থানে সরে যেতেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের খুঁজে পেত না। তাঁদের এসব আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

পরে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশে জুলাই মাসে দেলোয়ার হোসেন তাঁর দল নিয়ে চলে আসেন চাঁদপুর জেলার মতলবে। সেখানে অবস্থানকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের গতিবিধি টের পেয়ে যায়। ১৭ জুলাই পাকিস্তানি সেনাদের একটি বড় দল তাঁদের আক্রমণ করে। দেলোয়ার হোসেন তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলে। একপর্যায়ে তাঁর বুকে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। সহযোদ্ধারা পরে তাঁর মরদেহ নৌকাযোগে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দেলোয়ার হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূর আহমেদ গাজী, বীর বিক্রম

গ্রাম গোবিন্দিয়া, সদর, চাঁদপুর। বাবা ফরমান আলী গাজী, মা দুধ মেহের। স্ত্রী খায়রুন নেছা। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১।
শহীদ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের অবস্থান ছিল বাখরপুর গ্রামে। চাঁদপুর সদর উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের অন্তর্গত বাখরপুর। মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা নূর আহমেদ গাজী। দলে মুক্তিযোদ্ধা ৪৫ জন।

১ সেপ্টেম্বর। মজুমদারবাড়িতে তাদের যে ক্যাম্প, তাতে নূর আহমেদ গাজীসহ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা তখন মাত্র ১৮ জন। বাকিরা অন্যত্র একটি অপারেশনে গিয়েছেন। যাঁরা ক্যাম্পে আছেন, তাঁদের বেশির ভাগই পরিশ্রান্ত। গত কয়েক দিন তাঁরা একের পর এক অপারেশন করেছেন। সেদিনও একটি অপারেশনে গিয়ে তাঁরা কয়েকজন রাজাকারকে আটক করেন। সেই রাজাকাররা তাঁদের ক্যাম্পে বন্দী।

রাতে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে ঘুমিয়ে আছেন। দু-তিনজন পাহারায় নিযুক্ত। চারদিক সুনসান। শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক আর অন্ধকারে জোনাকি পোকার আনাগোনা। শেষ রাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২ সেপ্টেম্বর) নীরবতা ভেঙে হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ। মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন, তাঁরা উঠে পড়েন। কিছুটা হকচকিত। তবে দ্রুত তাঁরা নিজেদের সামলে নেন।

নূর আহমেদ গাজীর ঘটনা বুঝতে দেরি হয়নি। তাঁদের অবস্থানে আকস্মিক আক্রমণ করেছে পাকিস্তানি সেনারা। তিনি সতর্কই ছিলেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, আটক রাজাকারদের উদ্ধারে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করতে পারে। এ রকম অবস্থায় পাল্টা আক্রমণ বা পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রথমটাই বেছে নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছিল এসএলআর, স্টেনগান, রাইফেল আর হ্যান্ড গ্রেনেড। ভারী অস্ত্র ছিল মাত্র একটি। তা-ই সম্বল করে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর।

সকাল আটটার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি প্রায় শেষ হয়ে যায়। তখন তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জীবিত সহযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ করতে বলে নূর আহমেদ গাজী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে একাই সম্মুখযুদ্ধ করেন। কিন্তু এটা ছিল অসম যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

সেদিন এই যুদ্ধে নূর আহমেদ গাজীসহ আটজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। অন্য মুক্তিযোদ্ধারা পালাতে সক্ষম হলেও কমবেশি আহত হন। ১৫-১৬ জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার যুদ্ধে এবং আটক রাজাকারদের বেশির ভাগই নিহত হয় ক্রসফায়ারে।

নূর আহমেদ গাজী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইএমই কোরে চাকরি করতেন। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায়। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের অধীন চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায়। তিনি 'নূরু মেজর' সমধিক পরিচিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

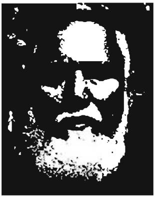

নূরুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম ও ইউনিয়ন ইছালী, সদর, যশোর।
বাবা মো. শমসের আলী মোল্লা, মা রাহেলা বেগম।
স্ত্রী শাহানারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৫।

শেষ রাতে মুক্তিযোদ্ধারা নিঃশব্দে অবস্থান নিতে শুরু করবেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান ঘিরে। তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে আছেন নূরুল হক। কিছুক্ষণ পর সকাল হলো। চারদিক ক্রমে সেই আলোয় উজ্জ্বল হতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের দেখেও বুঝতে পারল না তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। একটু পর সেখানে শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। এ ঘটনা ঘটে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৫ ডিসেম্বরে সিলেট এমসি কলেজে।

এই যুদ্ধের বিবরণ আছে মেজর (অব.) এম এ কাইয়ুম চৌধুরীর (১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন) বর্ণনায়। ওই যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তিনি বলেন: '...ভোর চারটায় এমসি কলেজের টিলার ওপরে এসে আমরা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করছিলাম। শত্রু কিন্তু আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে একটুও সজাগ ছিল না। তারা তাদের ডিফেন্সের ভেতর দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল।

'যথেষ্ট পাঞ্জাবি সেনা একসঙ্গে দেখতে পেয়ে আমরা নিজেদের দাবিয়ে রাখতে পারছিলাম না। তাই পজিশন না নিয়েই ছয়টা মেশিনগান দিয়ে তিন দিক থেকে ফায়ার শুরু করলাম। শত্রুর মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়ল। তারা পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। এর ভেতরেই বেশ কিছু পাঞ্জাবি সেনা নিহত হয়। কিছু সেনা হাত তুলে সারেন্ডার করে।

'শত্রুপক্ষে বেশ কিছু হতাহতের পর তারা আমাদের থেকে আরও উঁচু টিলায় অবস্থান নেয় এবং তাদের সব শক্তি টিলার ওপর নিয়োগ করে। এরপর আমাদের ডি ও বি কোম্পানির ওপর কয়েকটা মেশিনগান দিয়ে ফায়ার শুরু করে। আর্টিলারি ফায়ারও চলতে থাকে। এতে ডি ও বি কোম্পানির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার ফয়েজসহ বেশ কয়েকজন নিহত হন। যাঁরা আহত হয়েছিলেন, তাঁদের আমরা পেছনে নিয়ে যাই।'

এমসি কলেজের যুদ্ধে নূরুল হক যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি আহত হন। তাঁর পায়ে গুলি লাগে। এতে তিনি দমে যাননি। গুলিবিদ্ধ হয়েও অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। পরে সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেন ফিল্ড হাসপাতালে। এর আগে কামালপুর যুদ্ধেও শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন। ৩১ জুলাই ওই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গুয়াহাটিতে চিকিৎসা নিয়ে পুনরায় তিনি যুদ্ধে যোগ দেন।

নূরুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যশোরের বেনাপোলে যুদ্ধ করার পর ভারতে যান। পুনর্গঠিত হওয়ার পর যুদ্ধ করেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

বীর বিক্রম

গ্রাম রণকেলী-বারকোট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা চন্দ্রা, কোর্ট স্টেশন রোড, সদর, জামালপুর। বাবা ওসমান আলী চৌধুরী, মা জামিলুন নেছা। স্ত্রী সৈয়দা হেলেনা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯১।

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার মহামায়া ইউনিয়নের অন্তর্গত চাঁদগাজী জেলা সদর থেকে উত্তর-পূর্বে। চাঁদগাজী বিলুনিয়ার অংশ। বিলুনিয়ার তিন দিকে ভারত। সরু এক এলাকা। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ অবস্থান নিয়েছিল চাঁদগাজীতে। সেখানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

চাঁদগাজীতে ২৪ মে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম যুদ্ধ হয়। তারপর খণ্ড খণ্ডভাবে ২৪ জুন পর্যন্ত সেই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি এক দল পাকিস্তানি সেনা উপস্থিত হয় চাঁদগাজীতে। তারা সেখানে ঘাঁটি গাড়ে। ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা ২৪ মে সেখানে আক্রমণ করেন।

শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে। ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী তাতে দমে না গিয়ে সহযোদ্ধাদের নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর সাহসিকতায় হতবুদ্ধি ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা এবং নিহত ও আহতদের নিয়ে পালিয়ে যায়। সেদিন যুদ্ধে ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী যথেষ্ট রণকৌশল ও সাহস প্রদর্শন করেন। মূলত তাঁর রণকৌশল ও সাহসিকতার কারণেই পাকিস্তানি সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

এরপর কয়েক দিন সেখানে পরিস্থিতি শান্ত ছিল। ৬ জুন একদল পাকিস্তানি সেনা চাঁদগাজীতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে পাল্টা আক্রমণ চালায়। সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে প্রায় দুই কোম্পানি পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ করে। ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন।

পরে আরও কয়েক দিন যুদ্ধ হয়। শেষে ১৯ জুন পাকিস্তানি সেনারা হেলিকপ্টার ও স্থলবাহিনী দিয়ে যৌথ আক্রমণ করে। তারা হেলিকপ্টারের সাহায্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পেছনে সেনা নামায়। তখন পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে পড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত নিরাপদ অবস্থানে চলে যান। চাঁদগাজী পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

ফখর উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইপিআরের ১৪ নম্বর উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। এর অবস্থান ছিল হালিশহরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধ করেন। পরে মুক্তিবাহিনীর ১ নম্বর সেক্টরের ঋষিমুখ ও শ্রীনগর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। ৫ নভেম্বর ইছাছড়া নামক স্থানে এক যুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর বাঁ পা ও বুকে গুলি লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদউদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম

গ্রাম বাগৈ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বাবা আসাদ আলী ভূঁইয়া, মা আমেনা বেগম। স্ত্রী রুপিয়া বেগম। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩০। শহীদ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। এ সময় মুক্তিবাহিনীর নৌ-উইংয়ে সদ্য যোগ হওয়া গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' যাত্রা শুরু করে খুলনা অভিমুখে। তাদের লক্ষ্য খুলনার পাকিস্তানি নৌঘাঁটি দখল করা। একটি গানবোটে আছেন ফরিদউদ্দিন আহমেদ। তিনি এই গানবোটের আরইএন-১।

৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে গানবোট দুটি আকরাম পয়েন্টে পৌঁছাল। এখানে দুই রাত অবস্থান করে। এর মধ্যে মিত্রবাহিনীর দুটি জলযানও (গানবোট আইএনএস 'প্যানভেল' ও প্যাট্রোল ক্রাফট 'চিত্রাঙ্গদা') তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অভিযানের কমান্ডার মিত্রবাহিনীর মণীন্দ্রনাথ রায় সামন্ত (এম এন সামন্ত)। তিনি প্যানভেলের অধিনায়ক। রণতরিগুলো কোনো বাধা ছাড়াই ১০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় মংলায় পৌঁছাল।

সকাল নয়টায় শুরু হলো চূড়ান্ত অভিযান। সামনে প্যানভেল, মাঝে পলাশ, শেষে পদ্মা। চিত্রাঙ্গদা মংলায় থেকে গেল। প্যানভেলের সামনে থাকার কারণ, সেটি অত্যাধুনিক ও মজবুত। বেলা সাড়ে ১১টা। এ সময় আকাশে দেখা গেল তিনটি জঙ্গি বিমান। শত্রুবিমান মনে করে মুক্তিবাহিনীর গানবোট থেকে নৌমুক্তিযোদ্ধারা বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু প্যানভেলসহ বহরের কমান্ডার এম এন সামন্ত ওয়্যারলেসে জানালেন, ওগুলো ভারতীয় বিমান। তিনি গুলি করতে বারণ করলেন।

এরপর বিমানগুলো কিছুটা নিচে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গেল। তারপর হঠাৎ ঘুরে এসে বোমাবর্ষণ করল পদ্মার ওপর। পরক্ষণেই পলাশে। ভারতীয় বিমান মুক্তিবাহিনীর রণতরিকে পাকিস্তানি রণতরি মনে করে উপর্যুপরি বোমাবর্ষণ করতে থাকে। যদিও গানবোটগুলো মুক্তি বা মিত্রবাহিনীর কি না, তা শনাক্ত করার জন্য ছাদে ১৫X১০ ফুট প্রস্থের হলুদ কাপড় বিছানো ছিল। এ সময় প্যানভেল অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। ওই জাহাজে ভারতীয় বিমান বোমাবর্ষণ করল না।

বোমার আঘাতে দুই গানবোটেই আগুন ধরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হলেন ফরিদউদ্দিন আহমেদসহ কয়েকজন। বিপদ আন্দাজ করে অনেকে আগেই গানবোট থেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই অক্ষত। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাঁরা রণতরিতে ছিলেন, তাঁরা হয় শহীদ, নয়তো গুরুতরভাবে আহত হলেন।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া নৌমুক্তিযোদ্ধারা সাঁতার কেটে নদীর পাড়ে পৌঁছালে অনেকে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। দুই-তিনজনকে তারা হত্যা করে। বাকিদের নির্যাতনের পর জেলে পাঠায়।

ফরিদউদ্দিন আহমেদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১-এর জানুয়ারি থেকে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার কিছুদিন পর মুক্তিবাহিনীর নৌ-উইংয়ে যুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম শিওরখাল, বালাগঞ্জ, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ৩২ (বাকলি হাউস), অ্যাপার্টমেন্ট বি ৪, সড়ক ১১৬, গুলশান ১, ঢাকা। বাবা নূরুল হোসেন চৌধুরী, মা রিজিয়া খাতুন চৌধুরী। স্ত্রী রুবী চৌধুরী। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৪। মৃত্যু ২০১০।

আগেই ঠিক করা ছিল, মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ দল রাত ঠিক ১১টা ৪৫ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু করবে। চারদিকের নৈঃশব্দ্য ভেঙে ঠিক সময়েই গোলাবর্ষণ শুরু হলো। গোলাবর্ষণের প্রচণ্ডতা এমন যে, অনেক দূরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে থাকল।

মইনুল হোসেন চৌধুরী তাঁর সহযোদ্ধাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে তাঁরা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হটিয়ে তিতাস নদীর পাড়, মুকুন্দপুর, সিংগাইর বিল আর আজমপুর মুক্ত করাই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের কাছাকাছি (আনুমানিক ৪০০ মিটার দূরে) হওয়া মাত্র পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে বন্ধ হয়ে গেল তাঁদের দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ। এরপর শুরু হলো দুই পক্ষের মেশিনগান ও রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলি।

কুয়াশায় ঢাকা সেই রাতে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল প্রকৃতিপক্ষেই কঠিন। ভোর না হতেই শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধরত তাদের প্রসিদ্ধ পাঠান রেজিমেন্ট-১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির তারা। এর সঙ্গে তাদের ভারী কামানের গোলাবর্ষণ। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর দুটি স্যাবর জেটও মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে গোলা ফেলতে থাকল। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ।

মইনুল হোসেন চৌধুরী এতে বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। সারা দিন যুদ্ধ চলল। একের পর এক পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও পাকিস্তানিরা সফল হতে পারল না। মইনুল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে পালিয়ে গেল। এ ঘটনা ঘটে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ায়।

মইনুল হোসেন চৌধুরী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে সংঘটিত প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা। সে দিন বাঙালিদের ওপর গুলি চালাতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের দেওয়া নির্দেশ সরাসরি অমান্য করেন তিনি। ২৫ মার্চের পর এই জয়দেবপুর থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাঙালি সেনাদের নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন তিনি। কামালপুরসহ আরও কয়েকটি জায়গাতেও তিনি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান, বীর বিক্রম

গ্রাম শ্রীপুর, ডাক সাদুগঞ্জ, যশোর। বাবা রোয়াজেশ আলী জোয়ারদার, মা হাজেরা খাতুন। স্ত্রী ফারহানা সুলতানা। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮। ৩০ মে চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান হত্যা ঘটনার পর নিহত।

অন্ধকার রাত। ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা বেরিয়ে পড়লেন। নেতৃত্বে মতিউর রহমান। পথে তিস্তা নদীতে বেশ স্রোত। নৌকায় সবাই নদী পার হলেন। এরপর হেঁটে পৌঁছালেন লক্ষ্যস্থল শঠিবাড়িতে। পরের ঘটনা শোনা যাক মতিউর রহমানের বয়ানে:

'সেখানে একটা বিল্ডিং ছিল। এর সামনে প্রায় ৫০ গজ চওড়া ছোট একটি ক্যানেল। তখন ভোর হয় হয়। আমি আমার কোম্পানিকে দুই ভাগে ভাগ করলাম। একটি দল ক্যানেল ক্রস করে রৌমারীর দিকে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় অ্যামবুশ করল। প্ল্যান ছিল, আমি আক্রমণ চালালে পাকিস্তানি সেনারা যেন রৌমারীর দিকে পালিয়ে যেতে না পারে। অপরদিকে রৌমারী থেকেও যেন তারা না আসতে পারে।

'আক্রমণে ১৫ জন পাকিস্তানি নিহত হয়। ১৫ জনের সাতজন ছিল সেনাবাহিনীর। অপর আটজন ছিল ইপিকাপ। আহত হয় অনেক। এই সংঘর্ষ আগস্টের শেষের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটে। ঠিক তারিখ মনে নেই।

'ভারতীয়রা বলত, প্রমাণস্বরূপ যুদ্ধে নিহত পাকিস্তানি সেনাদের মাথা কেটে নিয়ে আসতে। আমরা ১৫ জনের মাথা কেটে এবং তাদের ইউনিফর্ম নিয়ে আমাদের গন্তব্যে রওনা হই। এই সংঘর্ষে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন। এই আক্রমণের জন্যই পরবর্তী সময়ে আমাকে "বীর বিক্রম" উপাধি দেওয়া হয়।

'পাকিস্তানি সেনারা যখন অস্ত্র ফেলে পালাচ্ছিল, তখন মুক্তিযোদ্ধারা পিছু ধাওয়া করে কয়েকজনকে হত্যা করে। তাঁদের সাহস দেখে আমি সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। এই অপারেশনে আমার সাবসেক্টরে ভীষণ মরাল ইফেক্ট হয়েছিল। যার ফলে আমার রেইডিং পার্টি পরবর্তী সময়ে সৈয়দপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রেইড করত। প্রতিটি রেইডই সাকসেসফুল হয়েছে।'

শঠিবাড়ি নীলফামারী জেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা। মতিউর রহমান এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে সেখানে আক্রমণ করে বড় ধরনের সাফল্য পান।

মতিউর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। সেখান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে, পরে পাটগ্রাম সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি পাটগ্রাম সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।

পাটগ্রাম সাবসেক্টরের আওতাধীন এলাকা ছিল লালমনিরহাট জেলার বড়খাতা, হাতীবান্ধা, কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম। এই সাবসেক্টরে মুক্তিযুদ্ধকালে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কয়েকটি যুদ্ধে মতিউর রহমান প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। এর মধ্যে তিস্তা রেলসেতুর যুদ্ধ, হাতীবান্ধা আক্রমণ, শঠিবাড়ির যুদ্ধ, কাকিনা আক্রমণ উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম

গ্রাম আমানতগঞ্জ, সদর উপজেলা, বরিশাল।
বাবা আলতাফ উদ্দিন আহমেদ, মা জেবুননেছা বেগম।
স্ত্রী নূপুর আহমেদ। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৮।

১৯৭১ সালে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মহকুমা পুলিশ প্রশাসক (এসডিপিও) ছিলেন। মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তিনি আশপাশের মহকুমায় কর্মরত কয়েকজন বাঙালি বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে ঝিনাইদহে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত নেন, যদি সামরিক সংঘর্ষ অবধারিত হয়, তবে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু করলে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২৬ মার্চ তাঁর নির্দেশে স্থানীয় পুলিশ ও আনসারের সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের প্রস্তুতি শুরু করেন।

১ এপ্রিল ভোরে যশোর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল ঝিনাইদহে রওনা হয়। পথিমধ্যে বিষয়খালীতে ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে প্রতিরোধযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাধা দেন। তখন সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানিরা পিছু হটে যায়। এ যুদ্ধে মাহবুব উদ্দিন সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

প্রতিরোধযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত সামরিক কর্মকর্তা ছিল না। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক অধিনায়ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরী তাঁর বাহিনীতে মাহবুব উদ্দিনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁকে সরাসরি ক্যাপ্টেন র‍্যাংকে কমিশন দিয়ে ব্যাজ পরিয়ে দেন।

১৫ এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা মাহবুব উদ্দিনের নেতৃত্বে ঝিনাইদহ মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। এপ্রিল মাসের শেষে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ক্রমে সাংগঠনিক রূপ পায়। সেক্টর গঠিত হয়। তিনি ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন একটি সাবসেক্টরে অধিনায়কের দায়িত্ব পান। এ দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা এলাকায় ছিলেন। ২৮-২৯ মে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তাঁর দলকে নেতৃত্ব দেন। সরাসরি যুদ্ধও করেন। তিনি ও তাঁর অধীন মুক্তিযোদ্ধারা অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শন করেন। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কাকডাঙ্গা-বেলেডাঙ্গা-সোনাবাড়িয়ায় কয়েক দিন ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এটি ছিল ৮ নম্বর সেক্টরের একটি স্মরণীয় যুদ্ধ। মূল আক্রমণকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ও ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ (বীর প্রতীক, পরে কর্নেল)। তাঁরা বিরামহীনভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে নিজ নিজ দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে দুই দলের মুক্তিযোদ্ধারাই বিপর্যয়ে পড়েন। মাহবুব উদ্দিনের বিচক্ষণতায় মুক্তিযোদ্ধারা চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পান। এ যুদ্ধে তিনি আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান,

বীর বিক্রম

ধাপ, সদর, রংপুর। বর্তমান ঠিকানা বাসা ১৪৯, সড়ক ৪, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা আবদুস সাত্তার, মা জরিনা খাতুন। স্ত্রী রাশিদা রহমান। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৯। মৃত্যু ২০০৮।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার অন্তর্গত ধোপাখালী সীমান্ত এলাকা। রণকৌশলগতভাবে ১৯৭১ সালে ধোপাখালী ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে অনেকবার খণ্ড ও গেরিলাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিন্যাস, জনবল ও অস্ত্রশক্তি ইত্যাদি নিরূপণের জন্য মুক্তি ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১২ নভেম্বর মুক্তি ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে ধোপাখালীতে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দেন মুস্তাফিজুর রহমান।

মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বানপুর থেকে রাত আটটায় ধোপাখালীর উদ্দেশে রওনা হন। গভীর রাতে কাছাকাছি পৌঁছে তাঁরা কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হন। নিঃশব্দে অবস্থান নেন পাকিস্তানি ঘাঁটির ২০-২৫ গজের মধ্যে। নির্ধারিত সময়ে একযোগে আক্রমণ শুরু করেন। পাকিস্তানি ঘাঁটিতে ছিল মর্টার, মেশিনগানসহ অন্যান্য ভারী অস্ত্র। এ ছাড়া কাছাকাছি ছিল পকিস্তানি সেনাদের একটি আর্টিলারি ব্যাটারি। প্রথমে তারা তিনটি মেশিনগান দিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। এরপর শুরু হয় আর্টিলারি মর্টার ফায়ার। সেদিনই তারা সেখানে প্রথম আর্টিলারি ব্যবহার করে। মুস্তাফিজুর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে এই পাকিস্তানি আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তাঁর অদম্য মনোবল ও সাহস সহযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করে। তাঁদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের একপর্যায়ে রাত দুইটার দিকে মুস্তাফিজুর রহমান আহত হন। তাঁর পেটে গুলি লাগে। আহত হওয়ার পর সহযোদ্ধারা তাঁকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধক্ষেত্রেই থেকে যান। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। সারা রাত যুদ্ধের পর সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে পাকিস্তানি সেনারা রণে ভঙ্গ দেয়। তখন মুস্তাফিজুর রহমান ভারতীয় ভূখণ্ডের ক্যাম্পে ফিরে যান। এরপর চিকিৎসার জন্য তাঁকে কৃষ্ণনগরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোর ফিল্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সেদিন এই যুদ্ধে ১৯-২০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও অনেকে আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তিনিসহ কয়েকজন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই বিপর্যয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে পালিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। ৮ নম্বর সেক্টরের বানপুর সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সাবসেক্টরের আওতাধীন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন। বেশির ভাগ যুদ্ধেই তিনি অগ্রভাগে থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহেদী আলী ইমাম, বীর বিক্রম

গ্রাম দাউদখালী, উপজেলা মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর। বাবা আবু মোহাম্মদ মোদাব্বের বিল্লাহ, মা আনোয়ারা খাতুন। স্ত্রী লায়লা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪। মৃত্যু ১৯৯৬।

মেহেদী আলী ইমাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মার্চ মাসে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। জুলাই মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন টাকি সাবসেক্টরের পটুয়াখালী গেরিলা বেইজের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত একটি বিবরণ আছে *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, দশম খণ্ডে। তাতে তিনি বলেন,

'পটুয়াখালী থেকে পাকিস্তানি সেনারা পায়রা নদ দিয়ে বামনা-বরগুনা না গিয়ে অনেক ঘুরপথে মীর্জাগঞ্জের পাশের খাল দিয়ে লঞ্চে যেত। আগস্টের প্রথম দিকে আমরা তাদের গতিবিধিতে বাধা দেওয়ার জন্য মীর্জাগঞ্জের কাছে খালের দুইধারে অ্যামবুশ পাতি। একটি লঞ্চে করে যখন পাকিস্তানি সেনারা যাচ্ছিল, তখন মীর্জাগঞ্জে আমাদের অ্যামবুশে পড়ে। লঞ্চটি আমাদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঠিক হতাহতের সংখ্যা জানা না গেলেও পরে লোকমুখে জানা যায় পাকিস্তানি সেনাদের ১০ জন নিহত হয়েছে।

'বিশখালী নদীতে পাকিস্তানি সেনারা গানবোটে করে পাহারা দিত। আগস্টের শেষে পরিকল্পনা নিই দিনের বেলা যখন গানবোট থানার কাছে যাবে, তখন আমরা কাছে থেকে হামলা করব। সেই মতো আমরা আগে থেকেই বামনা থানার কাছে অবস্থান নিয়ে তৈরি থাকি। বিকেল পাঁচটার সময় যখন গানবোট তীরে আসে, তখন আমরা গানবোটের ওপর আচমকা গুলি চালাতে থাকি। এই গুলির জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। এরপর শত্রুরা বন্দরে বা থানায় নামা বন্ধ করে দেয়।

'আগস্টের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের মহিষপুর ক্যাম্পে আকস্মিক হামলা চালায়। মহিষপুর ছিল তালতলী বন্দরের কাছে। পাকিস্তানি সেনারা দালালদের কাছ থেকে আমাদের অবস্থানের খবর পেয়ে পটুয়াখালী থেকে লঞ্চে ও গানবোটে করে মহিষপুরে আসে। একটি দল ছয়-সাত মাইল দূরে নেমে হেঁটে আমাদের অবস্থানের দিকে আসে। সকাল ছয়টার সময় পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। নদীর ধার থেকে আক্রমণ হতে পারে—এ আশঙ্কা আমাদের ছিল। কিন্তু স্থলপথে আক্রমণ হবে—এ আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাদের আক্রমণে হতবুদ্ধি ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করি। হামলা মোকাবিলা করার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আমাদের সমর্থনে জনগণ চিৎকার শুরু করে। এতে শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মহিষপুর এলাকা থেকে পালাতে থাকে। এ যুদ্ধে ১১ জন পাকিস্তানি সেনা ও ১৪ জন রাজাকার নিহত এবং অনেকে আহত হয়। আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে দুজন কৃষক শহীদ হন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল মান্নান, বীর বিক্রম

গ্রাম চান্দড়া, ইউনিয়ন গোপালপুর, উপজেলা আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর। বাবা আবদুল লতিফ, মা আছিরননেসা। তাঁর দুই স্ত্রী; নূরুন নাহার বেগম ও জাহানারা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৩। গেজেটে নাম এম এ মান্নান। মৃত্যু ২০০৩।

১৫ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা। সূর্যের আলো তখনো উঁকি দেয়নি। এ সময় ঠাস ঠাস, দ্রিম দ্রিম শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা ভাটিয়াপাড়া এলাকা। মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। গোপালগঞ্জ জেলার উত্তরে কাশিয়ানী উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে মধুমতী নদীর তীরে ভাটিয়াপাড়া। সেখানে আছে ওয়্যারলেস স্টেশন।

পাকিস্তানিদের এ ঘাঁটি ছিল বেশ সুরক্ষিত। আগেও মুক্তিযোদ্ধারা দু-তিনবার ওই ঘাঁটিটি আক্রমণ করেন। দুই ইঞ্চি মর্টার দিয়ে তাঁরা অনেক রকেট ছোড়েন। কিন্তু ক্যাম্পের কোনো ক্ষতি হয়নি। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানিদের এ ক্যাম্পটি দখল করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন মুক্তিযোদ্ধারা। মো. আবদুল মান্নান (এম এ মান্নান) সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর এ ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। তাঁরা প্রথমে ওই ক্যাম্প অবরোধ করেন। এর মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা ভাটিয়াপাড়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানিরাও পাল্টা আক্রমণ করে।

পরে বয়রা সাবসেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদার (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা সেখানে উপস্থিত হন। অবশেষে ১৮ ডিসেম্বর একজন মেজরের নেতৃত্বে প্রায় অর্ধশত পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মো. আবদুল মান্নান (জন্ম ১৯৪০) ১৯৭১ সালে ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। ফরিদপুর জেলায় সর্বপ্রথম তাঁর নেতৃত্বে আলফাডাঙ্গার গোপালপুরে সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল মুক্তিসেনার একটি দল গড়ে ওঠে। বেশির ভাগ সময় তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে দেশের ভেতরে ছিলেন। আলফাডাঙ্গা, কাশিয়ানীসহ বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধ করেন।

মো. আবদুল মান্নান স্বাধীনতার পর কয়েক মেয়াদে গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে তিনি মারা যান।

মো. আবদুল মান্নানের বড় ছেলে (প্রথম স্ত্রীর একমাত্র সন্তান) এম এ শওকত, দুই ভাই এম এ সোবহান ও এম এ মতিনও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ছেলে শওকত ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে ৩৬ জনের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে দেশে আসার পথে যশোরের আড়পাড়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অ্যামবুশে পড়েন। যুদ্ধে শওকত শহীদ হন। শহীদ শওকতের স্মরণে ১৯৭২ সালে চান্দড়া গ্রামে স্থাপন করা হয় 'শহীদ শওকত স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল মালেক, বীর বিক্রম

গ্রাম কড়িবাড়ি, মুরাদনগর, কুমিল্লা। বাবা মো. ইছহাক, মা রহিমা খাতুন। স্ত্রী আছিয়া খাতুন। তাঁদের তিন মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১০।
শহীদ ৬ এপ্রিল ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত। রাজশাহী উপশহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে থাকা ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রাজশাহী শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ৪ নম্বর ইপিআর সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল রাজশাহী শহরে। এর দুটি উইং চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এই সেক্টরের বাঙালি ইপিআর সদস্যরাও যুদ্ধে যোগ দেন। দুই উইংয়ের বাঙালি ইপিআর সদস্যদের বেশির ভাগ রওনা হন রাজশাহীতে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ উইংয়ে কর্মরত নায়েক মো. আবদুল মালেক ছিলেন তাঁদের একজন।

এ সময় গোদাগাড়ীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের বাধা দেয়। আবদুল মালেক ও তাঁর সহযোদ্ধারা ২ এপ্রিলের মধ্যে শহরের উপকণ্ঠে সমবেত হন। এরপর তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে রাজশাহী শহরের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। স্থানীয় ছাত্র-যুবকেরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এ সময় পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ করে। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বিমান আক্রমণ অব্যাহত থাকে। আবদুল মালেক নিজ অবস্থানে থেকে প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা উপশহরে সমবেত হয় এবং সেখানকার অবাঙালিদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের প্রতিরক্ষা আরও জোরদার করে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা শহরের বেশির ভাগ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা উপশহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক প্রতিরোধ ভেদ করে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেননি।

এ সময় আবদুল মালেক কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে ছিলেন কোর্ট স্টেশনের কাছে। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গুলি ছুটে আসে তাঁর দিকে। শহীদ হন এই বীরযোদ্ধা।

মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ফসিউদ্দিনের (আবদুল মালেকের দলনেতা, তখন হাবিলদার) ১৯৭৪ সালের বয়ানে আছে, '...চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ১৮ মাইল দূরে গোদাগাড়ীতে (আমাদের) কিছুসংখ্যক লোক ডিফেন্স তৈরি করে। রাতে পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। আমরা আস্তে আস্তে রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। গোলাগুলি চলতেই থাকে।

'রাজশাহীর কাছিয়াডাঙ্গাতে ক্যাপ্টেন গিয়াস (গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) নওগাঁ থেকে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। সেই সময় আমাদের কোনো অফিসার না থাকায় তিনি নেতৃত্ব দেন। রাজশাহী কোর্ট স্টেশনের কাছে ডিফেন্সে থাকাকালীন আমাদের একজন নায়েক, আবদুল মালেক শহীদ হন। এরপর রাজশাহী সেনানিবাস দখলের জন্য সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুস শুকুর, বীর বিক্রম

আদি নিবাস ভারত। বর্তমান ঠিকানা কামালকাছনা, সদর, রংপুর। বাবা শেখ আনোয়ার আলী, মা আমেনা খাতুন। স্ত্রী রবেদা খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৭।

মো. আবদুস শুকুরসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা নিঃশব্দে অবস্থান নিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। মুক্তিযোদ্ধাদের পিঠে ও মাথায় কেমোফ্লেজ হিসেবে বাঁধা ধানের খড়, পাতাসহ ছোট ছোট ডাল। মো. আবদুস শুকুর একটি ছোট দলের নেতৃত্বে। তাঁদের কাছে আছে মর্টার।

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার তিন দিক ঘিরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছেন। মো. আবদুস শুকুরের দল অগ্রবর্তী। তাঁরা মর্টার ছোড়ার পর পেছনে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। সময় গড়াতে থাকল। আক্রমণের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসতে থাকল।

নির্ধারিত সময়েই সেই সংকেত এল। যুদ্ধক্ষেত্রের অধিনায়কের সংকেত পাওয়ামাত্র মো. আবদুস শুকুরের দলের মর্টারগুলো গর্জে উঠল। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে একের পর এক মর্টারের গোলা ছুড়লেন। নিখুঁত নিশানায় সেগুলো পাকিস্তানি অবস্থানে পড়ল। বেশির ভাগই আঘাত হানল সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে। একই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিনগান থেকে গুলি শুরু হয়েছে। মর্টার, মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের গোলাগুলিতে সেখানকার আকাশ আলোকিত।

পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে তেমন প্রত্যুত্তর এল না। মুক্তিযোদ্ধাদের বুঝতে অসুবিধা হলো না, মর্টারের আঘাতে ওদের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়েছে। এরপর তাঁরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনারা অবস্থা বেগতিক দেখে পেছনে হটতে থাকল। এ ঘটনা ঘটে সিলেট জেলার গোবিন্দগঞ্জে ১৯৭১ স্যালের ১৪ ডিসেম্বরে।

মো. আবদুস শুকুর চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীন ৮ নম্বর উইংয়ে। এই উইংয়ের একটি কোম্পানির অবস্থান ছিল বাসুদেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। তিনি ওই কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন তিনি। প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মো. আবদুস শুকুর ২৮ মার্চ সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিদ্রোহ করে পরদিন রাতে ফুলবাড়ী-দিনাজপুর সড়কে অবস্থান নেন। এর আগেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল ফুলবাড়ীতে আক্রমণ করে। আক্রমণ শেষে সেনাদের পার্বতীপুরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পথ ভুলে তারা দিনাজপুরের দিকেই রওনা হয়। তখন তিনি তাদের আক্রমণ করেন। রাত ১০টা থেকে সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের চরম ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মো. আবদুস শুকুর প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে তিনি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। তাঁকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ, দেওয়ানগঞ্জ, সিলেট জেলার ছাতক, সালুটিকর, টেংরাটিলাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবু বকর, বীর বিক্রম

বাড়ি ৩, সড়ক ৯৬, গুলশান ২, ঢাকা। বাবা আবু জাফর, মা আনোয়ারা খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫০। শহীদ আগস্ট ১৯৭১।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধারা দুঃসাহসী বেশ কয়েকটি অপারেশন চালিয়ে দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (বর্তমানে রূপসী বাংলা) অপারেশন অন্যতম। তাঁরা এই হোটেলে দুবার অপারেশন চালান। প্রথম জুনে, দ্বিতীয়বার ১১ আগস্ট। দ্বিতীয় অপারেশনে অংশ নেন মো. আবু বকর। এই অপারেশনের মূল নায়ক ছিলেন তিনি ও আবদুস সামাদ (বীর প্রতীক)।

অপারেশন করার জন্য বকর ও সামাদ সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু প্রথম ঘটনার পর থেকে হোটেলে বসানো হয় কড়া পাহারা। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করেই হোক অপারেশন করতে হবে। শেষে একটা উপায়ও বের করলেন।

১১ আগস্ট বিকেলে গাড়িতে চেপে রওনা হন বকর, সামাদ, মায়া (মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম) ও গাজী (গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক)। হোটেলের গাড়ি পার্কিংয়ে পৌঁছে বকর ও সামাদ হোটেলের ভেতরে ঢোকেন। বাকি দুজন গাড়িতে স্টেনগান নিয়ে বসে থাকেন।

হোটেল লাউঞ্জে মূল দরজা দিয়ে না ঢুকে 'সুইস এয়ারের' অফিস কক্ষের দরজা দিয়ে তাঁরা যান। এ ব্যাপারে সহায়তা করেন ওই অফিসেরই একজন। ব্রিফকেস হাতে বকর প্রসাধনকক্ষের একেবারে কোনার কক্ষে ঢুকে দরজা আটকে দেন। সামাদ বাইরে থাকেন কাভার হিসেবে। ভেতরে বকর টাইম বোমা চালু করে ব্রিফকেস রাখেন কমোডের পেছনে। তারপর দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেই দেয়াল টপকে বেরিয়ে আসেন। দুজন সোজা চলে যান অপেক্ষমাণ গাড়ির কাছে। গাড়িতে ওঠামাত্র দ্রুত সেটি বেরিয়ে যায়।

ঠিক ৫৫ মিনিট পরই ঘটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হোটেলের লাউঞ্জ, শপিং আর্কেড ও আশপাশের কক্ষের কাচ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। ছিটকে যায় দরজা, ভেঙে পড়ে কক্ষের ভেতরের ও লাউঞ্জের লাগোয়া দেয়াল। আহত হয় বেশ কয়েকজন। দুই দিন পর বিশ্ব সংবাদপত্রে রোমাঞ্চকর এই অপারেশনের খবর প্রকাশিত হয় বেশ গুরুত্বসহকারে।

মো. আবু বকর ১৯৭১ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী (তখন কায়েদে আযম) কলেজের বিএ ক্লাসের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার্স কোর্সে যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসে ভারতে যান। ভারতের মেলাঘরে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকায় বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। ইন্টারকন্টিনেন্টালের অপারেশনই ছিল তাঁর শেষ অপারেশন। এরপর ২৮ বা ২৯ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে বাড়ি থেকে আটক করে। পরে টর্চার সেলে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম ভড়ুয়া, উপজেলা শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
বাবা আফাজউদ্দীন ভূঁইয়া, মা শরিয়তের নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪২। শহীদ মে ১৯৭১।

মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী। টগবগে তরুণ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেননি। দেশমাতৃকার ডাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। মে মাসের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন কুমিল্লার বিবিরবাজারে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া শহীদ হন।

এ যুদ্ধের বিবরণ আছে মেজর খালেদ মোশাররফের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) এক বয়ানে। তিনি বলেন, '...কুমিল্লার বিবিরবাজার (মুক্তিবাহিনীর) পজিশনের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কুমিল্লা শহরের সন্নিকটে দেড় মাইল পূর্ব দিকে তারণ্যপুর শত্রুরা দখল করতে সমর্থ হয়। আমি ইপিআরের একটি কোম্পানি এবং কিছুসংখ্যক বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা দিয়ে বিবিরবাজার প্রতিরক্ষাব্যূহ আরও শক্তিশালী করি। প্রতিরক্ষা অবস্থানে শত্রুরা বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে।

'অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী একদিন সন্ধ্যার সময় অতর্কিতে এ পজিশনের ওপর ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্যাংকের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে শত্রুসেনা পূর্ব দিকে আক্রমণ চালনা করে। এই আক্রমণ আমার সেনারা নস্যাৎ করে দেয় এবং শত্রুদের অনেক লোক নিহত ও আহত হয়। এরপর শত্রুসেনারা দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের পজিশনের ওপর পেছনে বাম পাশে ট্যাংক ও ৩৯ বালুচ রেজিমেন্টের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয়। ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং পেছন দিক থেকে আমরা ঘেরাও হওয়ার আশঙ্কায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়।

'এ যুদ্ধে ইপিআরের জওয়ানরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে মনে পড়ে এক নায়েকের কথা। সে শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের নিহতের বিপুলসংখ্যা দেখে একপর্যায়ে "জয়বাংলা" হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় দুর্ভাগ্যবশত তাঁর মাথায় গুলি লাগে এবং মারা যায়।

'যুদ্ধে আমার ছয়জন সেনা মারা যায় এবং ৮-১০ জন আহত হয়। আহতদের পেছনে নিয়ে আসি। কিন্তু তাঁদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। এ রকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে, যাঁর পেটে গুলি লেগেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপারেশন করার ব্যবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।'

এই আহত তরুণই ছিলেন মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া। মুক্তিযোদ্ধারা পরে তাঁর মরদেহ সমাহিত করেন ভারতের মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আশরাফ আলী খান, বীর বিক্রম

গ্রাম পশ্চিম মিজরা, সদর উপজেলা, গোপালগঞ্জ।
বাবা আবদুস সোবহান খান, মা মোছা. ছকিনা।
স্ত্রী নূরুন নাহার বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪২। শহীদ ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

রাতে যুদ্ধবিরতি। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত। মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার ডাক। মো. আশরাফ আলী খানসহ পরিশ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি একটি উপদলের (প্লাটুন) দলনেতা। সবাই সতর্ক অবস্থায়। কেউ আধা ঘুমে, কেউ জেগে। শেষ রাতে তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আকস্মিক আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি সেনারা।

নিমেষে শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ। মো. আশরাফ আলী খানসহ মুক্তিযোদ্ধারা এতে বিচলিত হননি। সাহসের সঙ্গে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ মোকাবিলা করেন।

সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। মুহুর্মুহু শেল ও রকেট এসে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে। শেল ও রকেটের স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ক্রমে বাড়ে।

আক্রমণের প্রচণ্ডতায় আশরাফ আলী খানের সহযোদ্ধারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন। তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে সহযোদ্ধাদের মনে সাহস জুগিয়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সহযোদ্ধারা পুনরায় সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের বীরত্বে থেমে যায় বেপরোয়া পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে হতোদ্যম পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একঝাঁক গুলি ছুটে আসে মো. আশরাফ আলী খানের দিকে। কয়েকটি গুলি লাগে তাঁর শরীরে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সহযোদ্ধারা উদ্ধার করার আগেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আজমপুরে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর। ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট রেলপথে আখাউড়া রেলজংশনের কাছে আজমপুর রেলস্টেশনের অবস্থান।

৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এলাকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল এ যুদ্ধে অংশ নেয়। সেদিন দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্ত হয় আজমপুর রেলস্টেশনসহ বিরাট এক এলাকা। পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দিকে। তবে যুদ্ধে আশরাফ আলী খান, তাঁর অধিনায়ক (কোম্পানি কমান্ডার) লেফটেন্যান্ট ইবনে ফজল বদিউজ্জামানসহ (বীর প্রতীক) আটজন শহীদ হন। যুদ্ধ চলাকালেই সহযোদ্ধারা তাঁকে সমাহিত করেন আজমপুর রেলস্টেশনের পাশেই। তাঁর সমাধি সংরক্ষিত।

মো. আশরাফ আলী খান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুর রাজবাড়িতে। ২৫ মার্চের পর মেজর কে এম সফিউল্লাহর (বীর উত্তম, পরে সেনাপ্রধান, মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। তিনি বি কোম্পানির একটি প্লাটুনের দলনেতা ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. কামরুজ্জামান খলিফা

বীর বিক্রম

গ্রাম সোনামুহা, গাবতলী, বগুড়া। বর্তমান ঠিকানা খলিফাপাড়া, গোঁসাইবাড়ী, উপজেলা ধনুট। বাবা মো. সরাফতউল্লাহ খলিফা, মা করিমন নেছা। স্ত্রী জাহেদা বিবি। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০২। শহীদ ১৩ আগস্ট ১৯৭১।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৭ নম্বর সেক্টর থেকে সীমান্তসংলগ্ন বিভিন্ন শহরে বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশন পরিচালিত হয়। এ অপারেশনে গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদেরও পাঠানো হতো, বিশেষ করে তাঁদের, যাঁদের বাড়ি অপারেশন এলাকায় বা যাঁরা ওই এলাকার সঙ্গে বেশি পরিচিত। মো. কামরুজ্জামান খলিফার নেতৃত্বে কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো হয় রাজশাহী শহরে।

জুলাই ও আগস্ট মাসের প্রথমার্ধে তিনি রাজশাহী শহর ও আশপাশ এলাকায় দুঃসাহসিক কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়, শহরেও তাদের চলাচল ব্যাহত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। উপর্যুপরি অ্যামবুশ ও আক্রমণে দিশেহারা পাকিস্তানিরা তখন রাজশাহী শহরে নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করে।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ভারতে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে খবর যায়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা রাজশাহী শহরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১৩ আগস্ট মো. কামরুজ্জামান খলিফার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল পাঠানো হয় রাজশাহীতে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং তাদের সহযোগী এই দিনটি বাঙালিদের সজাগ দৃষ্টির কারণে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সেদিন শহরে কোনো অপারেশন করতে পারেননি। কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যায় কামরুজ্জামান খলিফা সীমান্ত এলাকা থেকে সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওনা হন রাজশাহী শহরের উদ্দেশে। শেষ রাতে পাকিস্তানিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাঁরা ঢুকে পড়েন শহরে। গ্রেনেড হামলা চালান শহরের বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে। সেগুলো নির্ভুল নিশানায় পড়ে। বিকট শব্দে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত হয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কামরুজ্জামান খলিফা ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা পথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি টহলদলের সামনে পড়ে যান। টহলদলের সেনারা তাঁদের আক্রমণ করে। এ রকম পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা ছাড়া বিকল্প থাকে না।

তবে এটা ছিল অসম যুদ্ধ। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়েও কামরুজ্জামান খলিফা ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা বিচলিত হননি। বিপুল বিক্রমে তাঁরা আক্রমণ মোকাবিলা করেন এবং তিনজনই যুদ্ধে শহীদ হন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের মরদেহ সেখানেই ফেলে রেখে চলে যায়। পরে স্থানীয় কয়েকজন তাঁদের মরদেহ সমাহিত করেন, কিন্তু ভয়ে তাঁরা সমাহিত স্থান চিহ্নিত করে রাখেননি।

মো. কামরুজ্জামান খলিফা চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী সেক্টরে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ৭ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. দৌলত হোসেন মোল্লা

বীর বিক্রম

গ্রাম চরখামের, উপজেলা কাপাসিয়া, গাজীপুর। বাবা মো. আয়েত আলী মোল্লা, মা তাহেরা খাতুন। স্ত্রী আমেনা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১২৮। গেজেটে নাম মো. এইচ. মোল্লা। শহীদ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

ভারতের হলদিয়া নৌবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল মুক্তিবাহিনীর দুটি জাহাজ 'পদ্মা' ও 'পলাশ'। পলাশ জাহাজে আছেন মো. দৌলত হোসেন মোল্লা। তিনি জাহাজের ক্রুম্যান। তাঁদের লক্ষ্য, খুলনায় পাকিস্তানি নৌঘাঁটি দখল করা। মুক্তিবাহিনীর দুটি জাহাজের সঙ্গে আছে মিত্রবাহিনীরও একটি জাহাজ। খুলনার রূপসা নদীতে শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি আসামাত্র ঘটল এক আকস্মিক বিপর্যয়। এ সময় আকাশে দেখা গেল তিনটি জঙ্গি বিমান। সেগুলো জাহাজের ওপর চক্কর দিয়ে চলে গেল সাগরের দিকে। তারপর আবার এগিয়ে এল জাহাজগুলো লক্ষ্য করে। বোমা বর্ষণ করল। প্রথম ধাক্কাতেই বিধ্বস্ত হলো পদ্মা। পলাশের ইঞ্জিনরুমে জ্বলছে দাউ দাউ আগুন। একটু পর পলাশও ডুবতে থাকল। ডেকে শহীদ নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ পড়ে আছে। আহত যোদ্ধারা কাতরাচ্ছেন মৃত্যুযন্ত্রণায়। গুরুতর আহত মো. দৌলত হোসেন মোল্লা অনেক কষ্টে পানিতে ঝাঁপ দিলেন।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের। জাহাজ দুটি ভারত থেকে রওনা হয় ৭ ডিসেম্বর। সেদিন দুপুরে পৌঁছে খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে। মিত্রবাহিনীর বিমান পাকিস্তানি সেনাদের জাহাজ ভেবে ভুল করে পদ্মা ও পলাশ জাহাজে বোমাবর্ষণ করে। আত্মঘাতী এই বোমা হামলায় দুটি জাহাজেরই সলিলসমাধি হয়। এতে অনেক নৌ-মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও গুরুতর আহত হন। গুরুতর আহত মো. দৌলত হোসেন মোল্লাসহ কয়েকজন সাঁতরে নদীতীরে যান। কিন্তু সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক বিপদ। নদীতীরের বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী রাজাকার। মো. দৌলত হোসেন মোল্লা নদীতীরের যে স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হন, সেখানে তিনি একটু পর দেখতে পান তাঁর সহযোদ্ধা আহত সিরাজুল মওলাকে। আহত দৌলত হোসেন নদীতীরে পড়ে ছিলেন। তিনি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। ক্রল করে বা হেঁটে যেতে পারছিলেন না। দৌলত মওলাকে বলেন, 'আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সন্তানের মুখটা দেখা হলো না।' আহত মওলা চেষ্টা করেছিলেন মো. দৌলত হোসেন মোল্লাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু পারেননি। মওলা সামনে যেতে সক্ষম হন। তিনি বেঁচে যান। মো. দৌলত হোসেন মোল্লাকে পরে রাজাকাররা ধরে ফেলে। আহত দৌলত হোসেনকে রাজাকাররা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। রুহুল আমিনকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়।

মো. দৌলত হোসেন মোল্লা চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিবাহিনীর নৌ উইংয়ে যোগ দেওয়ার আগে স্থলযুদ্ধেও অংশ নেন। অক্টোবরে মুক্তিবাহিনীর নৌ উইং গঠিত হলে পলাশ গানবোটে তাঁকে গান ক্রুম্যান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর কয়েকটি নৌ অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

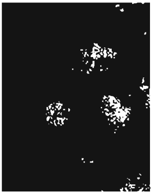

মো. নাজিম উদ্দীন, বীর বিক্রম

গ্রাম বেকি, উপজেলা বরুড়া, কুমিল্লা।
বাবা রহিম উদ্দীন, মা মেহেরজান বিবি।
স্ত্রী বিলাতুন নেছা। তাঁদের পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৯। মৃত্যু ডিসেম্বর ১৯৯৮।

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার অন্তর্গত মন্ডুমালা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে ঘাঁটি করে। এটি ছিল বেশ সুরক্ষিত। ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট প্রায় ৫০ মুক্তিযোদ্ধা এই ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃত্ব দেন মো. নাজিম উদ্দীন।

বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষিত। সরাসরি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। মো. নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে তাঁরা ঘাঁটি আক্রমণ করেন। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা কিছুটা হকচকিত হয়। তবে এ ধরনের আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুতই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা আক্রমণ প্রতিরোধ করে। পাকিস্তানিদের ভারী অস্ত্রের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা পেরে ওঠেননি। প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের মুখে তাঁদের পিছু হটে যেতে হয়।

এতে মনোবল হারাননি মো. নাজিম উদ্দীন। সহযোদ্ধাদের পুনরায় সংগঠিত করে পরদিন ১৭ আগস্ট ভোরে আবারও ওই ঘাঁটি আক্রমণ করেন। সহযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি ঘাঁটির ২০০-২৫০ গজের মধ্যে চলে যান। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের লক্ষ্য করে ব্যাপক গোলাগুলি করে।

মো. নাজিম উদ্দীন সহযোদ্ধাদের বলেন, 'মৃত্যু আসলে আসুক, তবু আমরা সামনে যাব।' তাঁর সাহস দেখে উজ্জীবিত হন সহযোদ্ধারা। এরপর তাঁর নেতৃত্বে তাঁরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং আরও কিছুদূর এগিয়ে যান। এ সময় হঠাৎ একটি বোমা আঘাত হানে মো. নাজিম উদ্দীনের ডান পায়ে। তাঁর ডান পায়ের নিচের অংশ সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

গুরুতর আহত হওয়ার পরও মো. নাজিম উদ্দীনের আরও কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে তিনি একাই ক্রল করে পাশের পাটখেতে যান। সেখানে যাওয়ার পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কয়েকজন সহযোদ্ধা অচেতন অবস্থায় তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে শিবিরে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে কলকাতায় নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য মহারাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে তাঁকে পাঠানো হয়।

দুই দিনের যুদ্ধে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং মো. নাজিম উদ্দীনসহ অনেকে আহত হন।

মো নাজিম উদ্দীন ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে দিনাজপুর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে হাবিলদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৮ মার্চ বিদ্রোহ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধকালে প্রথমে দশমাইল, পরে চম্পাতলীতে যুদ্ধ করেন। ভারতে যাওয়ার পর কিছুদিন একটি ক্যাম্পের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। মন্ডুমালা যুদ্ধের আগেও তিনি আরও কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে নেতৃত্ব দেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নিজামউদ্দীন, বীর বিক্রম

গ্রাম ফতেপুর, উপজেলা মদন, নেত্রকোনা।
বাবা সাইফউদ্দীন আহমেদ, মা ফাতেমা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৫।
শহীদ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গড়া যৌথ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিরক্ষা অবস্থান ও ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাবসেক্টরের অধীন একদল মুক্তিযোদ্ধা ১২ ডিসেম্বর হাকিমপুর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এ দলের একজন সদস্য মো. নিজামউদ্দীন। পথে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পোড়াগ্রাম ঘাঁটি। মুক্তিযোদ্ধারা ওই ঘাঁটির কাছাকাছি হওয়ামাত্র পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে কয়েকজন নিহত সহযোদ্ধা এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়।

পরদিন ১৩ ডিসেম্বর মো. নিজামউদ্দীনসহ মুক্তিযোদ্ধারা রওনা হন বহরমপুরে দিকে। কাছাকাছি গিয়ে জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পিছিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা পাকিস্তানি সেনাদের সরাসরি আক্রমণ না করে অ্যামবুশের সিদ্ধান্ত নেন। নির্দেশ পেয়ে তাঁরা দ্রুত অবস্থান নেন পাকিস্তানি সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার পথে। মুক্তিযোদ্ধারা সড়কের এক স্থানে দুই ধারের ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। আশপাশে কোথাও মানুষজনের সাড়া নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। যুদ্ধের ডামাডোলে স্থানীয় লোকজন নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। সাহসী কয়েকজন শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আছেন। তাঁরা সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শক।

বেশিক্ষণ তাঁদের অপেক্ষা করতে হলো না। ৪০-৪৫ মিনিট পর মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পেলেন, দুটি সেনাবাহী গাড়ি এগিয়ে আসছে। গন্তব্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ। গাড়ি দুটি গুলির আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠে মো. নিজামউদ্দীনসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সবার অস্ত্র।

পাকিস্তানি সেনারা এমন আক্রমণের চিন্তাও করেনি। কারণ, তারা মনে করেছিল, মুক্তিযোদ্ধারা পেছনেই আছেন। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই হতাহত হয় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। একটু পর পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। এ সময় হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মো. নিজামউদ্দীন।

সহযোদ্ধারা গুরুতর আহত মো. নিজামউদ্দীনকে দ্রুত উদ্ধার করেন। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর আগেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। যুদ্ধশেষে সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ সমাহিত করেন সেখানেই।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশে সব পাকিস্তানি সেনাই নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে শুধু মো. নিজামউদ্দীন শহীদ ও দু-তিনজন আহত হন।

মো. নিজামউদ্দীন চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন রাজশাহী সেক্টরের অধীনে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনর্গঠিত হয়ে যুদ্ধ করেন লালগোলা সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. বদিউল আলম, বীর বিক্রম

গ্রাম উত্তরপাড়া, উপজেলা পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা ৫৭ মণিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। বাবা আবদুল বারী, মা রওশন আরা খানম। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৯। গেজেটে তাঁর নাম মোহাম্মদ বদি। শহীদ ১৯৭১।

মো. বদিউল আলমের সহযোদ্ধা ছিলেন কাজী কামাল উদ্দীন (বীর বিক্রম)। তিনি লিখেছেন, 'আমি জনা দশেক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে যাচ্ছিলাম সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশন কীভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা সার্ভে করতে।

'আমরা যখন পিরুলিয়া থেকে রওনা হলাম, তখন আকাশ মেঘলা ছিল। আমাদের দুই নৌকার একটিতে ছিলাম আমি, বদি, জুয়েল ও আরও দুজন। সবাইকে আমি স্টেনগান নামিয়ে রাখতে বলি। কিন্তু বদি তা করেনি, তাঁর কোলের ওপরই রেখে দিয়েছিল স্টেনগানটা। আমাদের নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

'হঠাৎই সামনে নৌকার মতো কিছু একটা দেখলাম। নৌকাটা আমাদের নৌকা দুটির দিকে এগিয়ে আসে। সর্বনাশ, ওই নৌকায় পাকিস্তানি মিলিটারি। বদি আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে না। স্টেনগান তুলে ব্রাশফায়ার করে। পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দেয়। বদি পানিতে পড়ে গিয়েছিল। জুয়েলের ডান হাতের তিনটা আঙুল গুলিতে জখম হয়। আমরা সবাই একটা নৌকাতে ফিরেছিলাম।'

সিদ্ধিরগঞ্জের অপারেশন শেষ পর্যন্ত মো. বদিউল আলমরা করতে পারেননি। কয়েক দিন পর তাঁরা অপারেশন করেন ধানমন্ডিতে। এই অপারেশন করে তাঁরা বিখ্যাত হয়ে যান। কাজী কামালউদ্দীন লিখেছেন: 'আমাদের একটা টার্গেট ছিল ধানমন্ডির পাকিস্তানি আর্মির একটা ক্যাম্প। আমরা সেখানে আক্রমণ করার পর অনেক সংঘর্ষ হলো। অপারেশন শেষে আমরা যাচ্ছিলাম আমাদের আস্তানার দিকে।

'ধানমন্ডির ৪ কি ৫ নম্বর রোডে দুই দিকেই ছিল চেকপোস্ট। আমরা ঢুকে গেলাম চেকপোস্টের লাইনে। আস্তে আস্তে গাড়ি এগোতে থাকল। আমরা স্টেনগান নিয়ে প্রস্তুত। আলম গাড়ির স্পিড বাড়াতে থাকল। এর মধ্যে এক পাকিস্তানি সেপাই বলে উঠল, "রোকো, রোকো"। আমি ফায়ার শুরু করলাম। রুমী ফায়ার শুরু করে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে। স্বপন ও বদি ডান দিকে ফায়ার করতে থাকে।'

মো. বদিউল আলম ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের শিক্ষার্থী ছিলেন। একই সঙ্গে ছাত্ররাজনীতিও করতেন। তিনি যে ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন। কিন্তু ভারতে যাননি। মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকায় ফিরলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্র্যাক প্লাটুনের বেশির ভাগই ছিলেন তাঁর পরিচিত। ধানমন্ডির অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে আটক করে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনে তিনি শহীদ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. মহিবুল্লাহ, বীর বিক্রম

গ্রাম শাহেদাপুর, উপজেলা কচুয়া, চাঁদপুর।
বাবা সুজাত আলী, মা রফিকাতুন্নেছা। স্ত্রী মমতাজ বেগম।
তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১২৯।
শহীদ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর নৌ-উইংয়ের দুটি গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' ভারত থেকে নৌপথে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ অভিমুখে। একটি গানবোটে ছিলেন মো. মহিবুল্লাহ। তিনি ছিলেন কামানের ক্রুম্যান।

পরে মিত্রবাহিনীর দুটি রণতরি আইএনএস 'প্যানভেল' (গানবোট) ও 'চিত্রাঙ্গদা' (প্যাট্রোল ক্রাফট) তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়।

১০ ডিসেম্বর ভোরে সব রণতরি নোঙর তুলে মংলার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। কোনো বাধা ছাড়াই সকাল সাড়ে সাতটায় তাঁরা মংলায় পৌঁছান। সকাল নয়টায় শুরু হয় তাঁদের চূড়ান্ত অভিযান। সামনে 'প্যানভেল', মাঝে 'পলাশ', শেষে 'পদ্মা'। 'চিত্রাঙ্গদা' মংলায় থেকে যায়।

রণতরিগুলো যখন খুলনার পাকিস্তানি নৌঘাঁটির কাছাকাছি, তখন আনুমানিক বেলা সাড়ে ১১টা। এ সময় আকাশে দেখা যায় তিনটি জঙ্গিবিমান। শত্রুবিমান মনে করে মো. মহিবুল্লাহরা বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষণ করতে উদ্যত হন। কিন্তু 'প্যানভেল' গানবোট থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁদের গানবোটে জানানো হয়, ওগুলো ভারতীয় বিমান।

এরপর বিমানগুলো কিছুটা নিচে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে যায়। ১০ মিনিট পর হঠাৎ ঘুরে এসে বোমা বর্ষণ করে 'পদ্মা'র ওপর। পরক্ষণেই 'পলাশে'। যদিও গানবোটগুলো মুক্তি, নাকি মিত্রবাহিনীর, তা শনাক্ত করার জন্য ছাদে ১৫ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট চওড়া হলুদ কাপড় বিছানো ছিল। তার পরও এই দুর্ঘটনা ঘটে। 'প্যানভেল' গানবোটে বিমান বোমা বর্ষণ করেনি। তখন সেটি বেশ এগিয়ে ছিল।

বোমার আঘাতে দুই গানবোটেই আগুন ধরে যায়। দুটিতে ৫৬ জন নৌযোদ্ধা ছিলেন। বিপদ আন্দাজ করে কেউ কেউ আগেই পানিতে ঝাঁপ দেন। তাঁদের বেশির ভাগই অক্ষত থাকেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মো. মহিবুল্লাহসহ যাঁরা রণতরিতে ছিলেন, তাঁরা শহীদ হন, নয়তো মারাত্মকভাবে আহত হন। মো. মহিবুল্লাহ প্রথম বিমান হামলাতেই শহীদ হন।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা সাঁতরে নদীর পাড়ে এলে অনেককে পাকিস্তানি সেনা এবং সহযোগী রাজাকাররা তাদের আটক করে। কয়েকজনকে তারা সঙ্গে সঙ্গে হত্যা এবং বাকিদের নির্যাতন করার পর জেলে পাঠায়।

১৮ ডিসেম্বর নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা ধ্বংসপ্রাপ্ত গানবোট থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার করেন। এর মধ্যে একটি ছিল শহীদ মো. মহিবুল্লাহর। আট দিনে তাঁর মরদেহ শুকিয়ে হাড়ের সঙ্গে কেবল চামড়া লেগে ছিল। তার পরও সহযোদ্ধাদের তাঁর মরদেহ চিনতে কষ্ট হয়নি।

পাকিস্তানি নৌবাহিনীর সাবেক ক্রুম্যান (এবি) মো. মহিবুল্লাহ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে শেষে ভারতে যান। পরে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌ-উইংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. মোহর আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম নয়নসুখা, সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বাবা সোলেমান মণ্ডল, মা সায়মা খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬১। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইসলামপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক ঘাঁটি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত ইসলামপুর।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিক। মো. মোহর আলীসহ এক দল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন ইসলামপুরের পাকিস্তানি সেনাঘাঁটির কাছে।

মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করেও পাকিস্তানিদের উচ্ছেদ করতে পারেননি।

এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কৌশল পাল্টাতে হয়। মো. মোহর আলীসহ কয়েকজন গ্রেনেডসহ হামাগুড়ি (ক্রল) দিয়ে এগিয়ে যান বাংকার লক্ষ্য করে। কিন্তু পাকিস্তানিদের প্রবল গোলাগুলির মুখে জীবন বাঁচাতে তাঁরা বেশির ভাগ পথেই থেমে যেতে বাধ্য হন। একপর্যায়ে মোহর একা হয়ে যান।

এতে মো. মোহর আলী দমে যাননি। মনোবলও হারাননি। প্রবল গোলাগুলির মধ্যেই পাকিস্তানিদের চোখ এড়িয়ে তিনি এক বাংকারের কাছে অবস্থান নিয়ে ওই বাংকারে গ্রেনেড ছোড়েন। নিখুঁত নিশানায় তা বাংকারের ভেতরে পড়ে। বিস্ফোরণে ওই বাংকার প্রায় ধ্বংস এবং সেখান থেকে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংকারে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনায় হকচকিত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা। এই সাফল্য ও জয়ে মোহর আলীও অভিভূত হয়ে পড়েন। জয়ের অদম্য নেশায় তিনি পাকিস্তানিদের দ্বিতীয় বাংকারে গ্রেনেড ছোড়ার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয় বাংকারের দিকে যাওয়ার সময় পাকিস্তানিরা তাঁকে দেখে ফেলে। তাঁকে লক্ষ্য করে ব্যাপক গোলাগুলি শুরু করে। অসংখ্য গুলি ছুটে আসে মো. মোহর আলীর দিকে। কয়েকটি গুলি সরাসরি আঘাত করে তাঁর শরীরে। ঢলে পড়েন তিনি। রক্তে ভেসে যায় মাটি। শহীদ হন তিনি। স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার লড়াইয়ে যোগ হয় আরেকটি নাম।

এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের মুহুর্মুহু আক্রমণের মুখে ঘাঁটি ছেড়ে পেছনে গিয়ে অবস্থান নেয়। তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে মোহর আলীসহ কয়েকজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা মো. মোহর আলীসহ শহীদ সহযোদ্ধাদের মরদেহ সমাহিত করেন ইসলামপুরের কাছেই সীমান্তসংলগ্ন গ্রামে। তাঁর সমাধি চিহ্নিত।

মো. মোহর আলী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে তিনি নিজ এলাকায় যান। পরে ৭ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. সানা উল্লাহ, বীর বিক্রম

গ্রাম ও ইউনিয়ন নন্দনপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর।
বাবা সোলায়মান মিয়া, মা সাদিয়া খাতুন। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭১।
শহীদ ২৮ নভেম্বর ১৯৭১।

মো. সানা উল্লাহ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে।

১৯৭১ সালের মার্চে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশির ভাগ সদস্যকে সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। কিছু অংশ থাকে সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। এরপর ভারতে যান। সেখানে তারা পুনর্গঠিত হন।

নভেম্বরের শেষে রাধানগরে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এখানকার বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান। তাদের একটি অবস্থান ছিল ছোটখেলে। ২৬ নভেম্বর মিত্রবাহিনীর ৫/৫ গোর্খা রেজিমেন্ট রাধানগরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব অবস্থানে একযোগে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে গোর্খা রেজিমেন্টের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের কোম্পানি কমান্ডারসহ ৬৭ জন শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন আহত হন। তবে কেউ এদিন শহীদ হননি।

মিত্রবাহিনীর ২৬ নভেম্বরের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর ওপর রাধানগর দখলের দায়িত্ব পড়ে। ২৮ নভেম্বর ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে ছোটখেল আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন শাফায়াত জামিল (বীর বিক্রম)। যুদ্ধে তিনি আহত হলে নেতৃত্ব দেন এস আই এম নূরুন্নবী খান (বীর বিক্রম)।

মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে ছোটখেল দখল করে নেন। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থান ছেড়ে পিছু হটে যায়। সকাল আটটার দিকে তারা পুনর্গঠিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একের পর এক আক্রমণ মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিহত করেন। সেদিনকার যুদ্ধে মো. সানা উল্লাহসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও অনেকে আহত হন।

রাধানগর যুদ্ধ সম্পর্কে এস আই এম নূরুন্নবী খান বলেন, '২৮ নভেম্বর ১৯৭১। তখন সকাল সাতটা ৩০ মিনিটের মতো হবে। ব্যাপক আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপের পরপরই তিন দিক থেকে স্থল হামলা শুরু হলো। পাকিস্তানি সেনারা তিন দিক থেকে নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর, ইয়া আলী, ইয়া হায়দার ধ্বনি দিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাল। উত্তরে রাধানগর এবং দক্ষিণে গোয়াইনঘাট থেকে আসা ওদের কাউন্টার অ্যাটাক ছিল খুবই মারাত্মক ধরনের। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে প্রতিহামলা প্রতিহত করলেন। দুপুর ১২টার দিকে পুনরায় পাকিস্তানি সেনাদের একটি ব্যাপক প্রতিহামলা আসে। এবারও তিন দিক থেকে এ হামলা আসে। এবারের প্রতিহামলায় তাদের জনবলের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাফফর আহমদ, বীর বিক্রম

গ্রাম পশ্চিম চাঁদপুর, ইউনিয়ন সোনাপুর, উপজেলা সোনাইমুড়ী। বাবা অলি মিয়া, মা হাবিয়া খাতুন। স্ত্রী রাশিদা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৮। শহীদ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের একদম কাছে গিয়ে সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন মোজাফফর আহমদ। হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হলেন তিনি। পাকিস্তানি সেনাদের অস্ত্রের কয়েকটি গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা ঘটেছিল হরিপুরে ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর।

হরিপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাংলাদেশে-ভারত সীমান্তবর্তী অনেক এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে এলেও হরিপুর থেকে যায় পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে। সেদিন ভোররাতে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল একযোগে শত্রুপক্ষের অবস্থানে আক্রমণ চালায়।

মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ চালালে পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাদের ঘাঁটি ছিল বেশ সুরক্ষিত। মুক্তিযোদ্ধারা, বিশেষত মোজাফফর আহমদের দল পাকিস্তানি সেনাদের তীব্র গোলাগুলি উপেক্ষা করে সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যান। তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, এ সময় মোজাফফর আহমদ পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদ হন।

কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হরিপুর থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে মোজাফফর আহমদসহ চারজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা সহযোদ্ধাদের মরদেহ উদ্ধার করে সেখানেই সমাহিত করেন।

মোজাফফর আহমদ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী ইপিআর সেক্টরের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাবসেক্টরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম মোহনপুর, ইউনিয়ন মোহনপুর, উপজেলা মতলব উত্তর, চাঁদপুর; স্থায়ীভাবে বাস করেন ঢাকায়। বাবা আলী আহমেদ মিয়া, মা আকতারুন্নেছা। স্ত্রী পারভীন চৌধুরী। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪১।

১৯৭১ সালের ৯ জুন ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (পরে শেরাটন, বর্তমানে রূপসী বাংলা হোটেল) প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠেছিল। অপারেশনটি করেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন (বীর প্রতীক), কামরুল হক (বীর বিক্রম) ও হাবিবুল আলম (বীর প্রতীক)।

একটি হাইজ্যাক করা নীল রঙের ডাটসান গাড়িতে করে এসে ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা অপারেশনটি করেছিলেন। গাড়ি চালান বাদল নামে তাঁদের একজন সহযোগী। তিনি পাকিস্তান টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান ছিলেন। এই অপারেশনের বিশদ বর্ণনা আছে হাবিবুল আলমের ইংরেজিতে লিখিত *ব্রেভ অব হার্ট* বইয়ে।

৯ জুন সন্ধ্যার আগে গুলশান থেকে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীসহ মুক্তিযোদ্ধারা গাড়িটি হাইজ্যাক করেন। এরপর তাঁরা গাড়ি নিয়ে নিজেদের গোপন অবস্থানে (সিদ্ধেশ্বরী) যান। সেখান থেকে গ্রেনেড নিয়ে আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের উদ্দেশে রওনা হন।

ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা সিদ্ধেশ্বরী থেকে হেয়ার রোড হয়ে মিন্টো রোডে ঢুকে হোটেলের সামনে যান। হোটেলের গেটে ও ভেতরে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। গেটে প্রহরারতরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীসহ তিনজন গাড়ি থেকে নেমে চারটি গ্রেনেড ছোড়েন।

তখন পোর্চে দাঁড়ানো ছিল বিদেশি প্রতিনিধিদের ব্যবহৃত গাড়িবহর। গাড়িগুলো দু-তিন মিনিট আগে বিদেশি প্রতিনিধিদের নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে। এর মধ্যে ছিল একটি শেভ্রোলেট গাড়ি। সম্ভবত এই গাড়িতেই ছিলেন কারগিল। কারণ ওই গাড়ির সামনে ও পেছনে ছিল পুলিশের গাড়ি। প্রথম গ্রেনেড সরাসরি পড়ে শেভ্রোলেট গাড়ির সামনের দরজা ঘেঁষে। এটি ছোড়েন আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেনেড ছোড়েন যথাক্রমে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী ও হাবিবুল আলম।

অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা রমনা থানার পাশ দিয়ে রওনা হন মতিঝিলে *মর্নিং নিউজ* পত্রিকা অফিসের উদ্দেশে। পত্রিকাটি ছিল পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারযন্ত্র। পথিমধ্যে তাঁরা গাড়ি ঘুরিয়ে মগবাজার কাজী অফিসের গলিতে জামায়াতের নেতা গোলাম আযমের (বর্তমানে যুদ্ধাপরাধের দায়ে আটক ও অভিযুক্ত) বাড়িতে একটি গ্রেনেড ছোড়েন। এরপর তাঁরা মতিঝিলে যান এবং *মর্নিং নিউজ* পত্রিকা অফিসে দুটি গ্রেনেড ছোড়েন।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে যান। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজধানী ঢাকায় বেশ কয়েকটি অপারেশন করেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্বিতীয় অপারেশনেও তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ উল্লাহ, বীর বিক্রম

জেলা লক্ষ্মীপুর। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম কামালপুর, ইউনিয়ন রামনগর, সদর, যশোর। বাবা খলিলুর রহমান পাটোয়ারী, মা আলিজান বানু। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১২১। শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আকস্মিক আক্রমণ করে বসে পাকিস্তানি সেনারা। ফলে নিমেষে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। এমনি এক জায়গায় অবস্থান নিয়ে আছেন মোহাম্মদ উল্লাহ তাঁর জনাকয়েক সঙ্গীসাথি সব। তাঁরা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করতে লাগলেন। যুদ্ধ চলছে সমানতালে।

একটু পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। বিপুল শক্তি নিয়ে এসেছে তারা। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে এসে পড়ছে মুহুর্মুহু রকেট শেল।

আক্রমণের প্রচণ্ডতায় বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লেন। তাঁরা কেউ কেউ পিছু হটে যেতে লাগলেন। মোহাম্মদ উল্লাহ ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা এতে বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করে চললেন। তাঁদের বীরত্বে থেমে গেল পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। তবে বেশিক্ষণ পারলেন না। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মোহাম্মদ উল্লাহসহ তিনজন মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ হলেন তাঁরা।

এরপর ভেঙে পড়ল মুক্তিযোদ্ধাদের সব প্রতিরোধ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দখল করে নিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষ দিকের। ঘটেছিল শেষ রাতের দিকে। মোহাম্মদপুরের পাশে গোয়ালহাটে। যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা। সেখানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানেই হঠাৎ করে আক্রমণ করে। সেদিন ছিল ঈদের দিন। চৌগাছা এলাকা ছিল মুক্তিবাহিনীর ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরের আওতাধীন এলাকা। এখানে যুদ্ধ করেন মুক্তিযোদ্ধা অলীককুমার গুপ্ত (বীর প্রতীক, পরে মেজর)। মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। অলীককুমার গুপ্তের ১৯৭৩ সালে দেওয়া ভাষ্যে ধরা আছে এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তিনি বলেন, '...গুলবাগপুর গোয়ালহাট নামক স্থানে পাকিস্তানি সেনারা আমার দলের ওপর ঈদের দিন আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে নয়জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। তিনজন মুক্তিযোদ্ধাসহ তিনজন সাধারণ মানুষও শহীদ হন। জনসাধারণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। জনসাধারণ সেই সময় এই এলাকায় কাজ করেন মুক্তিবাহিনীর জন্য। সেদিন কর্নেল মঞ্জুর (এম এ মঞ্জুর বীর উত্তম) ছয়-সাত ঘণ্টার মধ্যে ওই এলাকা পুনরুদ্ধার করার হুকুম দেন। পাল্টা আক্রমণকালে পাকিস্তানি বিমান আমাদের আক্রমণ করে। পরে ভারতীয় সেনাদের সাহায্যে ওই এলাকা আমরা পুনরায় দখল করি।'

মোহাম্মদ উল্লাহ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে সেপাই হিসেবে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীনে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন বয়রা সাবসেক্টরের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীন, বীর বিক্রম

গ্রাম আদিয়াবাদ (বাইদ পাড়া), উপজেলা রায়পুরা, নরসিংদী। বাবা কামাল উদ্দীন আহমেদ, মা নূরজাহান বেগম। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫১। শহীদ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালে মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীনের বয়স ছিল ১৭ বা ১৮। স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেননি। বাড়িতে মা-বাবা ও কাউকে কিছু না বলে চলে যান ভারতে। যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে। ভারতের নরসিংহগড়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরে। সেপ্টেম্বর মাসে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার লুবাছড়া চা-বাগানে এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

এই যুদ্ধের কথা আছে ৪ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জেনারেল (অব.) চিত্তরঞ্জন দত্তের (বীর উত্তম, তখন মেজর) বিবরণে। তিনি বলেন, 'খবর পাওয়া গেল লাতুতে প্রায় এক কোম্পানি শত্রুসেনা (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) পরিখা খনন করেছে। তারা বড়লেখা পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। লাতু এমন এক জায়গা, সেটা দখল করা আমাদের জন্য খুবই দরকার ছিল। কারণ, লাতু দখল করলে শত্রুদের কুলাউড়া-শ্রীহট্ট চলাচলে অনেক অসুবিধা হবে। তাই ৩০০ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে লাতু দখলের পরিকল্পনা করলাম।

'আগস্টের শেষের দিকে ভোর চারটায় আক্রমণ শুরু হলো। বেলা প্রায় দুটোয় আমাদের ওপর শুরু হলো শত্রুসেনাদের গোলাবর্ষণ। তিন ইঞ্চি এমজির গোলাগুলি আসতে লাগল। বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা টিকতে না পেরে পেছনে চলে আসতে শুরু করল'। মনটা খারাপ হয়ে গেল। যুদ্ধে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন।

'সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেখানে আবার আক্রমণ চালানো হয়। সারোপার ও লাতু—এ দুটো জায়গা আবার দখলের প্রচেষ্টা চালানো হলো। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সারোপার আমাদের হস্তগত হয়। পুরো সেপ্টেম্বর মাসটা লাতু, বড়লেখা এমনকি ফেঞ্চুগঞ্জ পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ চলতে লাগল।

'ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাদী (মাহবুবুর রহমান সাদী বীর প্রতীক) তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে লুবাছড়া চা-বাগানে আক্রমণ চালায়। দুই দিন যুদ্ধের পর পুরো লুবাছড়া-কারবালা আমাদের হস্তগত হয়। লুবাছড়া মুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনারা বারবার চেষ্টা চালিয়েছে তা পুনর্দখল করার জন্য। কিন্তু লুবাছড়া তারা পুনরায় দখল করতে সমর্থ হয়নি। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা খাজা নিজামউদ্দীন, মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীনসহ নয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

'এইসব মুক্তিযোদ্ধাকে বীরত্বসূচক অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য আমি সিএনসির কাছে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁরা হলেন: ১. খাজা নিজামউদ্দীন বীরশ্রেষ্ঠ, ২. মোহাম্মদ সাহাব উদ্দীন বীরশ্রেষ্ঠ, ৩. রফিকউদ্দীন বীর উত্তম, ৪. আশরাফুল হক বীর উত্তম, ৫. মাহমুদুর রব বীর উত্তম, ৬. মো. বশির আহম্মদ, ৭. মো. মইজুল ইসলাম, ৮. মোহাম্মদ হোসেন ও ৯. আতিকুল ইসলাম বীর প্রতীক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ্গু মিয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম মোকরা (মৌবাড়ি), উপজেলা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বাবা আবু মিয়া, মা লালমতি বিবি। স্ত্রী জয়তুন নেছা। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫১। শহীদ ১৯৭১।

অমিত সাহসী যোদ্ধা ছিলেন রঙ্গু মিয়া। হাতীবান্ধা অপারেশনে তিনি শহীদ হন। হাতীবান্ধা লালমনিরহাট জেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধকালে এই এলাকা ছিল মুক্তিবাহিনীর ৬ নম্বর সেক্টরের পাটগ্রাম সাবসেক্টরের আওতাধীন। এই সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা ঘটনায় নিহত)। তাঁর ভাষ্যে ধরা আছে এই যুদ্ধের বিবরণ ও রঙ্গু মিয়ার বীরত্বের কথা। তিনি বলেন :

'আমাদের প্রথম আক্রমণেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার নিহত হয়। কমান্ডার নিহত হওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা পেছনে পালাতে থাকে। তারা প্রায় এক হাজার গজের মতো পিছু হটে একটি গ্রামে ডিফেন্স নেয়। সেখানে তাদের আর্টিলারি পজিশন ছিল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ডিফেন্স নিই। ক্রমশ আঘাত হেনে পাকিস্তানিদের পিছু হটিয়ে অগ্রসর হতে থাকি। ১০ ডিসেম্বর লাঙ্গলের হাটে পৌঁছি।

'আমি আমাদের দলের একজনের কথা বলব। হাবিলদার রঙ্গু মিয়া। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হতো যেন একটা ডাকাত। রঙ্গু মিয়া ও লুৎফর রহমান হাতীবান্ধা অপারেশনে শহীদ হন। তাঁদের কথা না বললেই নয়।

'তখন বেলা সাড়ে আটটা। পাকিস্তানিদের ডান দিকের পজিশন ফল করেছে। কিন্তু বাঁ দিকের অবস্থান ছিল একটি বিওপিতে। বেশ উঁচুতে। আমাদের উচিত ছিল আগে বাঁ দিকের পজিশন দখল করা, পরে ডান দিকের পজিশনে আঘাত হানা। আমার প্ল্যানিংয়ে ভুল হওয়ায় আমি প্রথমে ডান ও পরে বাঁ দিকে আক্রমণ চালাই। কিন্তু ডান দিকে আক্রমণ চালিয়েই আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। বাঁ দিক দখল না করতে পারলে যে আমরা সেখানে থাকতে পারব না, তাও বুঝতে পারলাম।

'আমাদের একটি কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন লুৎফর রহমান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রঙ্গু মিয়া। আমরা অ্যাটাকিং পজিশন থেকে এগোচ্ছি, বাঁ দিকে। সময় তখন বেলা সাড়ে ১০টা। আমরা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি আর্টিলারির গোলা এসে পড়তে থাকল। এই গোলা শূন্যেই ফাটে এবং ক্ষয়ক্ষতি হয় বেশি। এর মধ্য দিয়ে ওই দুজন (রঙ্গু মিয়া ও লুৎফর রহমান) নির্ভয়ে পাকিস্তানিদের বাংকারে চার্জ করেন। তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগ অতুলনীয়। দুজনই বাংকারে চার্জ করতে গিয়ে শহীদ হন।'

রঙ্গু মিয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রংপুর সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেনানিবাস থেকে পালিয়ে তাতে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিকুল ইসলাম, বীর বিক্রম

গ্রাম চর খলিফা, দৌলতখান, ভোলা। বাবা সেকেন্দার আলী, মা মাসুমা খাতুন। স্ত্রী মমতাজ বেগম। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৮। শহীদ ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আখাউড়ার পতনের পর রফিকুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসর হন চান্দুরা অভিমুখে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার অন্তর্গত চান্দুরা।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই অগ্রাভিযানে সামনে ছিল সি দল। এই দলে ছিলেন রফিকুল ইসলাম। তাঁদের ওপর দায়িত্ব ছিল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শাহবাজপুর সেতু দ্রুত দখল করা।

সি দলকে অনুসরণ করে এ দল। সবশেষে ছিল ডি দল। এই দলের সঙ্গে ছিলেন এস ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কাজী মুহাম্মদ সফিউল্লাহ (কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম) এবং ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক। বি দল ছিল পেছনে। কাট অফ পার্টি হিসেবে তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল অগ্রসরমাণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তা বিধান করা।

রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা ধর্মনগর-হরষপুর-পাইকপাড়া হয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দল, বিশেষত এ এবং ডি দলের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব ছিল। এই দুই দল যখন চান্দুরার কাছে ইসলামপুরে পৌঁছায়, তখন বড় ধরনের এক দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হয় একদল পাকিস্তানি সেনা। এ ঘটনা ছিল অভাবিত। নিমেষে সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একটু পর সেখানে হাজির হয় আরও পাকিস্তানি সেনা।

AMARBOI.COM

এ সময় রফিকুল ইসলামের দল ছিল বেশ সামনে। তারা খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে ছুটে আসে। তখন পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। একটি প্লাটুন (উপদল) নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাশের তিতাস নদীর অপর পাড়ে চলে যায়। বাকি দুই প্লাটুনের একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অক্ষত থাকে মাত্র একটি প্লাটুন।

অক্ষত ওই প্লাটুনেই ছিলেন রফিকুল ইসলাম। তিনি ও তাঁর অল্প কয়েকজন সহযোদ্ধা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাঁদের কৃতিত্বে বেঁচে যায় কে এম সফিউল্লাহর জীবন এবং শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয় পাকিস্তানি সেনারা। কিন্তু যুদ্ধের একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন রফিকুল ইসলাম।

সেদিন যুদ্ধে রফিকুল ইসলামসহ দুজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং এ এস এম নাসিমসহ ১১ জন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দী হয়। মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ দুই মুক্তিযোদ্ধাকে চান্দুরায় সমাহিত করেন।

রফিকুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন তিনি। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরের পঞ্চবটী সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে এস ফোর্সের অধীন নবগঠিত ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলু মিয়া, বীর বিক্রম

গ্রাম লোকমানখাঁর কান্দি, ইউনিয়ন ছয়সুতি, উপজেলা কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ। বাবা সোনা মিয়া, মা সাইরননেছা। স্ত্রী ললিতা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৪। শহীদ এপ্রিল ১৯৭১।

১৯৭১ সালে দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের ৯ উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) কর্মরত ছিলেন লিলু মিয়া। তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। উইং হেডকোয়ার্টার্সের অবস্থান ঠাকুরগাঁও শহরে। ২৬ মার্চ সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ ঠাকুরগাঁও শহরের রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। তাঁরা সড়কে ব্যারিকেড দেয় এবং বাঙালি ইপিআরদের আহ্বান জানায় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে।

২৮ মার্চ রাতে (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২৯ মার্চ) লিলু মিয়াসহ বাঙালি ইপিআর সেনারা বিদ্রোহ করেন। উইংয়ে বাঙালি-অবাঙালি ইপিআরদের মধ্যে ৩০ মার্চ পর্যন্ত সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে বেশির ভাগ অবাঙালি ইপিআর ও পাকিস্তানি সেনা (প্রায় ১১৫ জন) নিহত হয়।

এরপর ইপিআর মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। একটি দল ভাতগাঁও (ঠাকুরগাঁও থেকে ২৩ মাইল আগে), একটি দেবীগঞ্জে, একটি দল শিবগঞ্জে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে। এ ছাড়া ঠাকুরগাঁও-সৈয়দপুরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী বিভিন্ন সড়কের খানসামা, জয়গঞ্জ ও ঝাড়বাতিতেও তাঁরা প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তোলেন।

প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের এসব প্রতিরক্ষার একটির সঙ্গে আরেকটির ফিল্ড টেলিফোন বা ওয়্যারলেস যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে অসুবিধা হয়। একমাত্র রানারই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। তখন কখনো কখনো এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্ভীক, অকুতোভয় ও কৌশলী লিলু মিয়াকে। তিনি যুদ্ধের পাশাপাশি এই দায়িত্বও সাহসের সঙ্গে পালন করেন।

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। একদিন লিলু মিয়া এই দায়িত্ব পালনকালে একটি মোটরসাইকেল নিয়ে এক প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে আরেক প্রতিরক্ষা অবস্থানে যাচ্ছিলেন। পথে দিনাজপুর-সৈয়দপুর সড়কের ১০ মাইল নামক জায়গায় তিনি আক্রান্ত হন। ১০ মাইলেও ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রবল আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক দিন আগে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে ওই প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে যান।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের এক প্রতিরক্ষা থেকে আরেক প্রতিরক্ষা অবস্থানে খবর পৌঁছাতে হতো ওই এলাকা দিয়েই। ১০ মাইল এলাকায় পাকিস্তানি সেনা মোতায়েন ছিল। আকাশেও মাঝেমধ্যে চক্কর দিয়ে বেড়ায় পাকিস্তানি হেলিকপ্টার। লিলু মিয়া এতে দমে যাননি। ভয়ও পাননি। নির্ভয়ে এগিয়ে যান ওই এলাকা দিয়ে। কিন্তু সফল হননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে লক্ষ্য করে গোলাগুলি শুরু করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং শহীদ হন তিনি।

শহীদ লিলু মিয়ার মরদেহ তাঁর সহযোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করতে পারেননি। পরে তাঁর মরদেহ স্থানীয় গ্রামবাসী সেখানেই সমাধিস্থ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত আলী সরকার, বীর বিক্রম

গ্রাম দক্ষিণ ওয়ারী, ইউনিয়ন রানীগঞ্জ, উপজেলা চিলমারী, কুড়িগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা চিলমারী থানাহাট বাজার। বাবা ইজাব আলী সরকার, মা শরিতুজ নেছা। তাঁর চার মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭২।

মুক্তিযোদ্ধারা দুপুরে এক দফা যুদ্ধ করলেন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে। তাঁদের নেতৃত্বে শওকত আলী সরকার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তাঁরা ব্যর্থ হন। অসম যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারাই জয়ী হয়। শওকত আলী সরকার সহযোদ্ধাদের নিয়ে পিছু হটে সাময়িকভাবে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন, কিন্তু দমে যাননি। বিকেলে পুনঃসংগঠিত ও শক্তি বৃদ্ধি করে আবার পাল্টা আক্রমণ চালান। এবার পাকিস্তানি সেনারা বিপর্যস্ত। শেষে পাকিস্তানি সেনারা তাদের হতাহত সহযোদ্ধাদের ফেলে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা ঘটে অনন্তপুরে ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে।

অনন্তপুর কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত। সেদিন ছিল বাংলা পৌষ মাসের ৫ বা ৬ তারিখ। বেলা ১১টার দিকে একদল পাকিস্তানি সেনা হঠাৎ হাতিয়া ইউনিয়নে আসে। তাদের নেতৃত্বে ছিল এক মেজর। পাকিস্তানি সেনারা সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে থাকে। হাতিয়া ইউনিয়নের অনন্তপুরে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মূল শিবির।

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের বেপরোয়া আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে ঝোঁপ-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। চারদিকে তখন আহত গ্রামবাসীর চিৎকার। মৃত মানুষের রক্তে ভেসে গেছে গ্রাম। দুঃসহ এক পরিস্থিতি।

এ পরিস্থিতিতে শওকত আলী সরকার বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারলেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে। এবার তাঁরা সংখ্যায় কিছুটা বেশি। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দল—চাঁদ প্লাটুনের কিছু মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামবাসী হত্যার প্রতিশোধ নিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শওকত আলী সরকার মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর সাহস দেখে উজ্জীবিত হন সব মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা বেসামাল হয়ে পড়ে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আরও বেড়ে যায়। বিপুল বিক্রমে তাঁরা যুদ্ধ করেন। একসময় শওকত আলী সরকারসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। কিন্তু তাঁদের হাতেও হতাহত হয় ২৫-৩০ জন পাকিস্তানি সেনা। শেষ পর্যন্ত নিহত কয়েকজনের লাশ ফেলে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায় কুড়িগ্রামে। সেদিন পাকিস্তানি সেনারা কয়েক শ নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করে। জীতেন্দ্র নাথ, গোলজার হোসেন, মনতাজ আলী, আবুল কাসেম কাচু, নওয়াব আলীসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে শহীদ হন।

শওকত আলী সরকার ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরের মানকারচর সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শমসের মবিন চৌধুরী, বীর বিক্রম

গ্রাম ভাদেশ্বর, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা ১৯ পার্ক রোড, অ্যাপার্টমেন্ট বি ৪, বারিধারা, ঢাকা। বাবা আবদুল মবিন চৌধুরী, মা তাহমেদুন নাহার। স্ত্রী শাহেদা ইয়াসমিন। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২১।

১৯৭১ সালে শমসের মবিন চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রতিরোধযুদ্ধকালে চট্টগ্রামের কালুরঘাটের যুদ্ধে তিনি আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে বন্দী করে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ঘটনা, কালুরঘাট যুদ্ধ ও বন্দী জীবনের ঘটনার কথা জানা যাক তাঁর নিজের বয়ানে (১৯৭৩)।

'২৫ মার্চ রাত ১২টায় ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টের গেটে গিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। বৃষ্টির মতো গুলি।...এমন সময় কিছু বাঙালি সেনাকে গেটের কাছে দেখলাম। তাঁরা বললেন, "স্যার, বালুচ রেজিমেন্ট আমাদের ওপর হামলা করেছে এবং অনেককে মেরে ফেলেছে।" আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে ষোলশহরে এইট বেঙ্গলে গেলাম।

'সেখানে গিয়ে শুনলাম সকল পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৬ মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের একটু দূরে পৌঁছলাম। কালুরঘাটে আমরা শপথ গ্রহণ করলাম। "বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।"

'১১ এপ্রিল সকাল আটটার সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কালুরঘাটে ভীষণ আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে। আমি ও মেজর হারুন (বীর উত্তম, তখন ক্যাপ্টেন, পরে মেজর জেনারেল) আমাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমাদের সেনাসংখ্যা ছিল ৩৫। ওদের (পাকিস্তানি) ছিল ১০০-এর ওপরে।

'মেজর হারুন ব্রিজের ওপর আহত হন। আহত হওয়ার পর তাঁকে অতি কষ্টে পুলের অপর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে (মুক্তিযোদ্ধাদের) পিছু হটতে নির্দেশ দিলাম। আমাকে একজন সেনা (মুক্তিযোদ্ধা) চলে যেতে বলল। আমি বললাম, তোমরা যাও, আমি আসছি।

'আমি রয়ে গেলাম। হঠাৎ আমি নিজেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ঘেরাও অবস্থায় দেখলাম। অন্য সবাই পুলের অপর পারে চলে যেতে সক্ষম হয়। আমি ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে চারদিকে চায়নিজ স্টেনগান দিয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করলাম। চোখের সামনে তিনজন পাকিস্তানি সেনাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম। তারপর একটা গুলি এসে আমার কোমরে লাগে। আমি গুরুতরভাবে আহত হয়ে পুলের ওপর পড়ে গেলাম।

'আমি ভাবতে থাকলাম শত্রুরা আমাকে ধরে ফেলবে। আমি ওদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে স্থির করলাম। কিন্তু স্টেনগানটা দূরে ছিল। তাই এটা সম্ভব হলো না। শত্রুরা আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বন্দী করে রাখে।

'তারপর আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়। বন্দী শিবিরে রাখা হয় এবং (আমার ওপর) অশেষ নির্যাতন চালানো হয়। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আমি মুক্ত হয়ে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাফী ইমাম রুমী, বীর বিক্রম

গ্রাম খাটুরিয়া, উপজেলা ডোমার, নীলফামারী। বাবা শরীফুল আলম ইমাম, মা জাহানারা ইমাম। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৭। গেজেটে তাঁর নাম মোহাম্মদ রুমী। শহীদ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ২৫ আগস্ট মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা ঢাকার ধানমন্ডিতে দুর্ধর্ষ এক গেরিলা অপারেশন চালান। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডে তোলপাড় শুরু হয়। এই অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন শাফী ইমাম রুমী। কয়েক দিন পর শাফী ইমাম রুমীসহ তাঁর আরও কয়েকজন সহযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পরে অমানুষিক নির্যাতনে তিনি শহীদ হন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আটক করেছিল ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য আবুল বারক আলভীকেও (শিল্পী)। তিনি বেঁচে যান। নির্যাতনের বর্ণনা আছে তাঁর লেখায়। তিনি লিখেছেন: '৩০ আগস্ট ভোরবেলা সুরকার আলতাফ মাহমুদের বাসা পাক সেনারা ঘিরে ফেলে। আলতাফ মাহমুদ ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকেও ধরে নিয়ে যায়। ওখানে দেখলাম আমাদের অনেকেই ধরা পড়েছে। সেই পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে ছিল রুমী, জুয়েল, বদি, হাফিজ, চুন্নু ভাই, বেলায়েত ভাই (ফতেহ আলীর দুলাভাই), উলফাতের বাবা, আলমের ফুফা আরো অনেকে।

'রুমীকে শুধু একদিনই দেখেছি। রুমীকে বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড টর্চার করা হয়েছে। দুপুরের পর ওকে নিয়ে গেল। তারপর আর দেখা হয় নাই। আমাকেও আমার সহযোদ্ধা অন্যান্য গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন কথা বের করার জন্য অনেক টর্চার করা হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে দেহ, আঙুলগুলো ভেঙে গেছে। হাত-পিঠ ফেটে রক্ত বেরিয়েছে। থেঁতলে দিয়েছে সারা শরীর। অতএব আমিও জানি, রুমীর কাছ থেকেও কথা বের করতে এই নির্দয় পাক সেনারা কি কি করতে পারে।'

রুমীর সহযোদ্ধা হাবিবুল আলম লিখেছেন: 'রুমী খুব বেশি দিন যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেনি। একজন মুক্তিযোদ্ধা কতগুলো অ্যাকশন করেছে, সেটা বড় কথা নয়। যদি একটা অ্যাকশনে সে সাহস ও বীরত্ব দিয়ে সফল হতে পারে, সেটাই বড় কথা। রুমী ঢাকার অপারেশনে অনেক বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। আর এ রকমই একটি দুঃসাহসী অপারেশন ছিল ২৫ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখ।'

শাফী ইমাম রুমী ১৯৭০ সালে এইচএসসি পাস করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু ক্লাস শুরু হতে বিলম্ব হওয়ায় কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে পড়াশোনা করেন। ১৯৭১ সালে আমেরিকার ইলিনয় স্টেটের ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তি হন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। জুনের মাঝামাঝি মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক, বীর বিক্রম

গ্রাম বলিবাড়ি, ইউনিয়ন জিনোদপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা সৈয়দ আলী মুন্সি, মা নূরেন্নেছা বেগম। স্ত্রী আফিয়া বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৩।

শামসুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে অবস্থান নিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। মুক্তিযোদ্ধারা সংকেতের অপেক্ষায় আছেন। এ সময় হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ। ব্যাপক হারে গোলা এসে পড়তে থাকে শামসুল হকদের অবস্থানে। বিরামবিহীন ও ভয়াবহ সেই গোলাবর্ষণ। শামসুল হক তবু মনোবল হারালেন না। তাঁদের বিক্রম ও সাহস দেখে পাকিস্তানি সেনারা হতবাক হয়ে পড়ে। এ ঘটনা কানাইঘাটে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

কানাইঘাট ছিল মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন। সেক্টর অধিনায়ক ছিলেন মেজর সি আর দত্ত (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল)। তাঁর এক সাক্ষাৎকারে এ যুদ্ধের বিবরণ আছে। তিনি বলেন, '...কানাইঘাটে শত্রুদের ওপর মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকাল প্রায় সাড়ে ১০টায় মেজর রব, লেফটেন্যান্ট গিয়াস ও লেফটেন্যান্ট জহিরের অধীন মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে শত্রুসৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পাকিস্তানিরা রাস্তা না পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে শুরু করল। যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল, তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। অনেকে পানিতে ডুবে মারা যায়। ভীষণ শব্দে মাইনগুলো ফাটছিল। যারা চরখাই দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল, তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে প্রাণ হারায়। বেলা ১১টায় কানাইঘাট আমাদের দখলে এল।

'কানাইঘাট যুদ্ধে পাকিস্তানিদের মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০ জন। আহত ২০ জন। আমাদের পক্ষে শহীদ হয়েছে ১১ জন। আহত হয়েছিল ১৫ জন।

'এত বড় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে যারা ভালো কাজ করেছে তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করার জন্য সর্বাধিনায়কের কাছে নাম পাঠিয়েছিলাম। তারা হলো মেজর রব, লেফটেন্যান্ট জহিরুল হক, সুবেদার মতিন, সুবেদার বাছর আলী, নায়েব সুবেদার শামসুল হক প্রমুখ।'

শামসুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে কালবিলম্ব না করে অংশ নেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার পর প্রথম যুদ্ধ করেন জেড ফোর্সের অধীনে। পরে ৪ নম্বর সেক্টরে। ধামাই চা-বাগানের যুদ্ধে শামসুল হক অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে তাঁর দলনেতা (কোম্পানি কমান্ডার) লেফটেন্যান্ট এস এম ইমদাদুল হক (বীর উত্তম) শহীদ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকিম উদ্দিন, বীর বিক্রম

গ্রাম মাগুরমারী, ইউনিয়ন দেবনগর, উপজেলা তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। বাবা হিরিম উদ্দিন, মা সকিনা বেগম। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৫২ শহীদ নভেম্বর ১৯৭১।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটি অমরখানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। পেছনে হটে গিয়ে পাকিস্তানিরা অবস্থান নিয়েছে জগদলহাটে। পঞ্চগড় জেলার অন্তর্গত অমরখানা ও জগদলহাট। অমরখানা দখলের পর সকিম উদ্দিনসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত সমবেত হন জগদলহাটে। তিনি একটি উপদলের (প্লাটুন) দলনেতা।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে আর্টিলারির গোলাবর্ষণ শুরু করে। সকিম উদ্দিনসহ নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন সামনের ফ্রন্ট লাইনে। বেশুমার কামানের গোলা এসে পড়ে তাঁদের পেছনে ও আশপাশে। মাটি কাঁপিয়ে বিকট শব্দে সেগুলো বিস্ফোরিত হয়। পোড়া বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হয়ে পড়ে।

প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ আক্রমণ। এরপর শুরু হয় স্থল আক্রমণ। সামনের প্রতিরক্ষা অবস্থানে সকিম উদ্দিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁরা বিক্রমের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করেন।

অগ্রবর্তী ঘাঁটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানিরা ছিল উন্মত্ত। বেপরোয়া হয়ে তারা আক্রমণ শুরু করে। প্রতিটা পাকিস্তানি সেনা ছিল সুইসাইড স্কোয়াডের মতো। ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের দিকে। সকিম উদ্দিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বীরত্বে থেমে যায় পাকিস্তানিদের এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা। তুমুল মুখোমুখি যুদ্ধের একপর্যায়ে অসীম সাহসী সকিম উদ্দিন ঝোড়োগতিতে গুলি করতে করতে এগিয়ে যান। জীবনের মায়া ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানিদের ওপর। এ সময় হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন তিনি। তাঁর বুকসহ হাত-পায়ে গুলি লাগে। মাটিতে ঢলে পড়েন তিনি। নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

সেদিন যুদ্ধ চলাবস্থায় সকিম উদ্দিনের সহযোদ্ধারা চেষ্টা করেন তাঁর মরদেহ উদ্ধারের। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক গোলাগুলির মুখে তাঁরা মরদেহ উদ্ধারে ব্যর্থ হন। কয়েকজন আহতও হন। পরে যৌথ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা পালিয়ে যায়। তখন মরদেহ উদ্ধার করে জগদলহাটেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সকিম উদ্দিনের সমাধি সংরক্ষিত। তবে স্বাধীনতার পর থেকে তা অযত্ন-অবহেলায় পড়ে ছিল। সম্প্রতি জেলা পরিষদের উদ্যোগে সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু নামফলকে তাঁর নামের পাশে বীর বিক্রম না লিখে বীর প্রতীক লেখা হয়েছে। পঞ্চগড় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভেও তাঁর নামের পাশে বীর প্রতীক লেখা রয়েছে।

সকিম উদ্দিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মার্চ মাসে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। ৬ নম্বর সেক্টরের ভজনপুর সাবসেক্টরের বিভিন্ন জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ মনসুর আলী, বীর বিক্রম

গ্রাম ঘোষপাড়া, পৌরসভা কুড়িগ্রাম।
বাবা সৈয়দ সাহাবান আলী। মা জহিরুন নেছা।
স্ত্রী শাহিদা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৫। মৃত্যু ২০০২।

•

কুড়িগ্রাম থেকে সড়ক ও রেলপথ মোগলবাছার ওপর দিয়ে উলিপুর হয়ে চিলমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরাপত্তার দিক থেকে সড়কের চেয়ে রেলপথকেই বেশি নিরাপদ মনে করত। তখন নিজেদের যাতায়াত, রসদ ও অন্যান্য মালামাল পরিবহনের কাজ তারা রেলপথেই সারত।

নভেম্বরের মাঝামাঝি মনসুর আলী সহযোদ্ধাদের নিয়ে মোগলবাছা ইউনিয়নের ওপর দিয়ে যাওয়া রেলপথের অর্জুনমালায় রেলসেতুতে বিস্ফোরক বসান। এতে ট্রেনের কয়েকটি বগি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগী হতাহত হয়।

এখন জানা যাক, সৈয়দ মনসুর আলীর নিজস্ব বয়ানে (১৯৭৩) মুক্তিযুদ্ধকালের কিছু ঘটনার কথা :

'২ নভেম্বর যাত্রাপুর বাজারে তিনজন পাকিস্তানি সেনা ও নয়জন রাজাকার এলে তাদের আক্রমণ করি। তারা সবাই সংঘর্ষে নিহত হয়। এরপর ওই এলাকার সব রাজাকারকে জনগণের সহায়তায় ৯ নভেম্বর আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। সেদিন সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

'এদিকে যাত্রাপুরে সংঘর্ষের খবর পেয়ে কুড়িগ্রাম থানার ঘোগাদহ ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ রাজাকার স্বেচ্ছায় তাদের হাতিয়ারসহ আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের খবর আশপাশ এলাকার রাজাকারদের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে রাজাকাররা দলে দলে আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

'কুড়িগ্রাম শহরের নিকটবর্তী মোগলবাছা ইউনিয়নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনবার পাকিস্তানিদের আক্রমণ করি। তৃতীয়বারের সংঘর্ষের সময় উলিপুরগামী ট্রেনের দুটি বগি ডিনামাইট দিয়ে বিচ্ছিন্ন করি। এতে প্রায় ৩৫ জন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী হতাহত হয়।

'মোগলবাছা ইউনিয়নের অর্জুনমালায় রেলসেতুর নিচে আমরা ডিনামাইট ফিট করেছিলাম। পাকিস্তানি সেনাবাহী ট্রেন ওই স্থান অতিক্রম করার সময় ডিনামাইট বিস্ফোরিত হয়। এ অপারেশনে আমাদের মীর নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

'৭ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার যোশির নির্দেশে আমরা মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে কুড়িগ্রাম শহরে আক্রমণ করি। যৌথ বাহিনীর দূরপাল্লা ও ভারী কামানের গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে আক্রমণের সূচনা হয়। কিন্তু পাকিস্তানিরা তেমন প্রতিরোধ না করে পালিয়ে যায়।'

মনসুর আলী পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর ফ্লাইট সার্জেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানে। ১৯৭১-এর প্রথম দিক থেকে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে সরাসরি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, বীর বিক্রম

লালমোহন, ভোলা। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি কে-২১, সড়ক ২৭, বনানী, ঢাকা। বাবা আজহার উদ্দিন আহম্মদ, মা করিমুন্নেছা। স্ত্রী দিলারা হাফিজ। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ দলনেতা (কোম্পানি কমান্ডার) হিসেবে বেশ কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এর মধ্যে কামালপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কামালপুর। ৩১ জুলাই এখানে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁর নিজের বয়ানে (১৯৭৩) এই যুদ্ধ :

'ভোর সাড়ে তিনটার সময় দুই কোম্পানি (বি ও ডি) মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কামালপুর বিওপিতে আক্রমণ করি। বি কোম্পানির কমান্ডার ছিলাম আমি নিজে। ডি কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ (বীর উত্তম)। আমরা একটি ফিল্ড ব্যাটারির সাহায্য নিই। ক্যাপ্টেন মাহবুবের (মাহবুবুর রহমান বীর উত্তম, কানাইঘাট যুদ্ধে শহীদ) নেতৃত্বে এ কোম্পানিকে পাঠানো হয় উঠানিপাড়ায়, যাতে তারা কাট অফ পার্টিতে যোগ দিতে পারে। আমরা এফইউপিতে পৌঁছানোর আগেই আমাদের পক্ষ থেকে আর্টিলারির গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটা আমরা এফইউপিতে পৌঁছার পর শুরু হওয়ার কথা ছিল। এতে মুক্তিযোদ্ধারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এ সময় শত্রুপক্ষও (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) আর্টিলারি ও ভারী মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ শুরু করে।

'তার পরও আমি এবং সালাহউদ্দিন আমাদের দলের মুক্তিযোদ্ধাদের একত্র করে শত্রুদের আক্রমণ করি। আমরা "জয় বাংলা" ধ্বনি দিতে দিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হই। মাইনফিল্ড অতিক্রম করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষার অর্ধেক জায়গা দখল করে নিই। শত্রুরা পেছনে হটে যায়। শত্রুরা পেছনে অবস্থান নিয়ে আর্টিলারি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে তাঁর কোম্পানির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শত্রুর গোলাগুলিতে তিনি হঠাৎ শহীদ হন। একটু পর আমিও মর্টারের স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হই। আমার শরীরের পাঁচ জায়গায় স্প্লিন্টার লাগে। আমাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের দুই দলই নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। তাদের মনোবল ভেঙে যায়। ফলে তারা পিছিয়ে আসে।'

হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন।

৩০ মার্চ আক্রান্ত হওয়ার পর দেশমাতৃকার টানে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি করেননি তিনি। এ সময় তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

পরে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে বেনাপোলে সমবেত হন। সেখানেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধ করেন। এরপর ভারতে যান। সেখানে পুনরায় সংগঠিত হয়ে তিনি প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের অধীন কামালপুরে যুদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ কামালপুর, ধলই বিওপি, কানাইঘাট ও সিলেট এমসি কলেজের যুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম

গ্রাম পশ্চিমপাড়, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। এখন ঢাকায় বাস করেন। বাবা আবদুল করিম, মা সখিনা বেগম। স্ত্রী সোনেকা রানী ও হাজেরা খাতুন; প্রথম স্ত্রী হাজেরা খাতুন মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ। তাঁদের নয় ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৪।

হেমায়েত উদ্দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। ১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি থেকে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বিভিন্ন বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোট দল গঠন করেন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি নিজ এলাকায় যান। একটি ক্যাম্প করেন। তাঁর এলাকা তখনো মুক্ত ছিল। ক্যাম্পে তিনি স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে এ দলের নাম হয় হেমায়েত বাহিনী।

হেমায়েত অল্প কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে ৪ মে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানায় আক্রমণ চালান। তাঁরা বাঙালি-অবাঙালি পুলিশদের কৌশলে আটক করে থানার সব অস্ত্র হস্তগত করেন। হতবুদ্ধি ওসি ও পুলিশরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনা ওই এলাকার জনগণের মনে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে।

কোটালীপাড়া থানায় অপারেশন করার কয়েক দিন পর (৭ মে) পাকিস্তানি সেনাদের বিরাট একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়।

সম্মুখযুদ্ধ করার ক্ষমতা হেমায়েতের দলের ছিল না। ফলে তিনি সাময়িক সময়ের জন্য এলাকা ছেড়ে পেছনে যান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন। ২৯ মে রাতে তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে আবার কোটালীপাড়া থানায় আক্রমণ চালান।

তখন থানায় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও অনেক বাঙালি-অবাঙালি পুলিশ ছিল। হেমায়েতের দলের প্রচণ্ড আক্রমণে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ পালিয়ে যায়। কয়েক দিন কোটালীপাড়া মুক্ত থাকে। ৩ বা ৪ জুন পাকিস্তানি সেনারা হেলিকপ্টারের সাহায্যে আবার কোটালীপাড়া দখল করে।

১৭ জুন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে হেমায়েতের দলের বড় ধরনের একটি যুদ্ধ হয়। তখন কোটালীপাড়ার রাজাপুরে ছিল হেমায়েত বাহিনীর ক্যাম্প। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কয়েকটি স্টিলবডি লঞ্চযোগে এসে সেখানে আক্রমণ চালায়। হেমায়েত সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানিরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়।

হেমায়েত উদ্দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব দেখান। এর মধ্যে রামশীলের যুদ্ধ অন্যতম। এ যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হন। ১৪ জুলাই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

হেমায়েত উদ্দিন স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারেননি। গুলির ক্ষতে পচন ধরায় তাঁকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। তিন বছর তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীর প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম বনকোলা, উপজেলা সুজানগর, পাবনা।
বাবা আবদুল আলী মোল্লা, মা জাগিরননেছা।
স্ত্রী লুৎফা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও পাঁচ ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২০১। মৃত্যু ১৯৯০।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন ময়নাগুড়ি, কামারপাড়া, বিলখাজুদ, ফকিরপাড়া, নয়াপাড়াসহ কয়েকটি গ্রাম। এগুলো পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার অন্তর্গত। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল একযোগে ওই এলাকায় আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্ব দেন আজিজুর রহমান। ওই সব এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে।

দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা সামনের আরও এক মাইল এলাকা দখল করেন। এর মধ্যে ছিল জাবরীদোয়ার, গোয়ালঝাড়, বানিয়াপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, বামনগাঁও, কামাদা, ভেলুকাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম। আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁর সহযোদ্ধারা গোয়ালঝাড় গ্রাম দখলে নিয়ে ওই গ্রামে ক্যাম্প করে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। গ্রামগুলো হাতছাড়া হওয়ায় তা পুনরুদ্ধারের জন্য পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে ওঠে। কয়েক দিন পর বিপুল শক্তি নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে ভেলুকাপাড়া ও জাবরীদোয়ারে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আজিজুর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানিদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। পাকিস্তানিরা ভেলুকাপাড়া ও জাবরীদোয়ার গ্রাম পুনর্দখল করতে সক্ষম হলেও গোয়ালঝাড় গ্রাম দখল করতে পারেনি।

AMARBOI.COM

পাকিস্তানি সেনারা গ্রাম দুটি দখল করার পর ভারতীয় আর্টিলারি দল পাকিস্তানি সেনাদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। আর্টিলারি শেলিং ও মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা কাবু হয়ে শেষ পর্যন্ত পিছু হটে যায়। পাকিস্তানি সেনারা পরে আরও কয়েকবার গোয়ালঝাড়ে আক্রমণ করে। আজিজুর রহমান প্রতিবারই সহযোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। স্বাধীনতার পর স্থানীয় জনসাধারণ গোয়ালঝাড় গ্রামের নাম তাঁর নামে অর্থাৎ আজিজনগর নামে নামকরণ করে।

আজিজুর রহমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর সেক্টরের ৯ নম্বর উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তেঁতুলিয়ায় তিনি কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ৬ নম্বর সেক্টরের ভজনপুর সাবসেক্টরে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অমরখানায় এক সেতু ধ্বংসের অপারেশনে তিনি আহত হন। সুস্থ হওয়ার পর আবার যুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাহার আলী খান, বীর প্রতীক

গ্রাম বারাইভিকরা, সদর, মানিকগঞ্জ। বাবা আলাদত খান, মা তোতা বেগম। স্ত্রী শিরিয়া বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২১৯।
গেজেটে নাম আতাহার আলী।

শীতের রাতে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে আছেন আতাহার আলী খান। নিঃশব্দে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন। আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় শেষ রাত। সেই সময় ক্রমে এগিয়ে আসছে। আর কিছু সময়ের মধ্যেই তাঁরা পৌঁছে যাবেন নির্ধারিত স্থানে। অন্য দলগুলোরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার কথা। তারপর তাঁরা একযোগে আক্রমণ শুরু করবেন।

আতাহার আলী খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিচ্ছেন। এ সময় তাঁদের ডান দিকে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি।

নির্ধারিত সময়ের আগেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আক্রমণ করেছে। আতাহার আলী খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকলেন। যুদ্ধ চলতে থাকল।

মুক্তিযোদ্ধারা একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। একসময় তাঁরা প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা করে পৌঁছে গেলেন পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পের কাছে। আতাহার আলী খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকলেন। সারা দিন যুদ্ধ চলল। রাতেও থেমে থেমে গোলাগুলি চলল। পরদিন সকাল হওয়ার আগেই পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে গুলির শব্দ থেমে গেল। কিছুক্ষণ পর জানা গেল, পাকিস্তানি সেনারা নিহত ও আহত সঙ্গীদের ফেলে পালিয়ে গেছে।

এরপর আতাহার আলী খানসহ মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ঢুকে পড়লেন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতর। তখন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতর পড়ে আছে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনার লাশ। আহত কয়েকজন কাতরাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে তছনছ হয়ে গেছে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা। এ ঘটনা ঘটে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নভেম্বরের শেষে রায়গঞ্জে। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা (তখন থানা) সদরের উত্তর দিকে রায়গঞ্জ। দুধকুমার নদের পশ্চিম পাশে সীমান্ত এলাকা। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট।

দুই দিন যুদ্ধের পর রায়গঞ্জ মুক্ত হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩০-৩৫ জন নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে লেফটেন্যান্ট আবু মঈন মো. আশফাকুশ সামাদ (বীর উত্তম) কয়েকজন শহীদ হন।

আতাহার আলী খান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীন ১০ নম্বর উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে। তিস্তা, পাটেশ্বরী, জয়মনিরহাট, রায়গঞ্জ, ভুরুঙ্গামারীসহ আরও কয়েক স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনিসুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম স্থল, উপজেলা সরিষাবাড়ী, জামালপুর।
বাবা মকবুল হোসেন, মা আমিনা বেগম।
স্ত্রী শামসুন নাহার। তাঁদের তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪২৬।

হালকা শীতের রাতে মুক্তিযোদ্ধারা নেমে পড়লেন পানিতে। তাঁদের নেতৃত্বে আনিসুর রহমান। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ। সেগুলো নিয়ে ঠান্ডা পানির মধ্যে সাঁতরে যেতে থাকলেন সামনের দিকে। প্রায় ঘন্টা খানেক সাঁতরে পৌঁছালেন লক্ষ্যস্থলে। সেখানে নোঙর করা চারটি ফেরি ও একটি স্টিমার। নিঃশব্দে তাতে লাগালেন বিস্ফোরক। তারপর দ্রুত সরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেগুলো পানি তোলপাড় করে ফাটতে শুরু করল। ঘাটে থাকা পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা ছোটাছুটি করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকল। নিমেষে পানিতে ডুবে গেল ফেরি ও স্টিমার। এ ঘটনা বাহাদুরাবাদে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে।

বাহাদুরাবাদ জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে বাহাদুরাবাদ ঘাট ছিল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। এই ঘাটের বিপরীতে ফুলছড়ি ঘাট। তখন এই ঘাটের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারতের মেঘালয়, কোচবিহার ও দার্জিলিং থেকে নদীপথে এই এলাকা হয়ে দেশের ভেতর ঢুকতেন মুক্তিযোদ্ধারা। সে জন্য বাহাদুরাবাদে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সার্বক্ষণিক নজরদারি।

আনিসুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দলের ওপর ভার পড়ে বাহাদুরাবাদ ঘাটে অপারেশনের। তাঁদের এই দায়িত্ব দেন কাদেরিয়া বাহিনীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)। এবার তাঁরা ভিন্ন কৌশল নেন। সরাসরি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ না করে ঘাটে থাকা ফেরি ও স্টিমার বিস্ফোরকের সাহায্যে ডুবিয়ে দেন।

রাতের অন্ধকারে ২৪টি বিস্ফোরকসহ ব্রহ্মপুত্র নদে নেমে প্রায় আড়াই মাইল সাঁতরে তাঁরা লক্ষ্যস্থলে যান। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তীরে তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য থাকেন। আনিসুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা স্থলযোদ্ধা হয়েও সফলতার সঙ্গেই সব ফেরি ও স্টিমারে বিস্ফোরক লাগান। সবই পানিতে নিমজ্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনারা সেগুলো উদ্ধার করে আর চালু করতে পারেনি। এরপর নৌপথে পাকিস্তানি সেনাদের বিচরণ কমে যায়। এ কারণে ওই এলাকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবাধ চলাচল করা সহজ হয়ে পড়ে।

আনিসুর রহমান ১৯৭১ সালে নরসিংদীর আলীজান জুট মিলে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২২-২৩। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নিজ এলাকায় যান। পরে মায়ের অনুমতি নিয়ে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে। পরে কাদেরিয়া বাহিনীর অধীনে। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি অপারেশন করে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম পাতারচর, উপজেলা মুলাদী, বরিশাল।
বাবা আমির হোসেন, মা আমেনা বেগম।
স্ত্রী দেলোয়ারা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৫। মৃত।

আনোয়ার হোসেন ১৯৭১ সালে সিলেটে ওয়াপদায় (বর্তমানে পানি উন্নয়ন বোর্ড) চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে তিনিও যোগ দেন যুদ্ধে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। পরে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাবসেক্টরে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৌরনদী। এর অবস্থান বরিশাল সদর থেকে উত্তরে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ এলাকার বিভিন্ন নদী দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রসদবাহী লঞ্চ কয়েক দিন পর পর চলাচল করত। লঞ্চের আগে-পিছে পাহারায় থাকত বিশেষ জলযান। এভাবে পাকিস্তানি মিলিশিয়ারা লঞ্চ গন্তব্যে নিয়ে যেত।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে আনোয়ার হোসেনসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা গৌরনদী এলাকায় ছিলেন। এ সময় একদিন ভোরে তাঁর দলনেতা খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য রসদবাহী একটি লঞ্চ তাদের এলাকার নদী দিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা দলনেতার নির্দেশে দ্রুত তৈরি হয়ে নদীতীরে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নেন। একটু পর তাঁরা দেখতে পান লঞ্চটি এগিয়ে আসছে।

নদীতীরে আনোয়ার হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিলেন আড়ালে। পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও সহযোগী কেউ তাঁদের দেখতে পায়নি। নদীর ওই স্থান ছিল কিছুটা সরু। লঞ্চটি অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র গর্জে ওঠে তাঁদের সবার অস্ত্র। পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও তাদের বাঙালি সহযোগীরাও পাল্টা গুলি করে। তবে তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা লঞ্চ ও বিশেষ জলযান লক্ষ্য করে দু-তিনটি মর্টারের গোলা ছোড়েন। সেগুলো লঞ্চ বা জলযানে আঘাত করেনি। কিন্তু এতে পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও সহযোগীরা ভয় পেয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা লঞ্চ ফেলে বিশেষ জলযানে করে পালিয়ে যায়।

এর কিছুদিন পর আগস্ট মাসের একদিন, আনোয়ার হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাতারহাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি গানবোটে আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনারাও তাঁদের পাল্টা আক্রমণ করে। তখন দুই পক্ষে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক গোলাগুলি করে তীরে নামে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে তিন-চারজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা গানবোটে ফিরে যায় এবং গোলাগুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়।

এ যুদ্ধে আনোয়ার হোসেন ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী

বীর প্রতীক

সিরাজগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
বাবা রমজান আলী শেখ, মা খাইরুন নেছা।
স্ত্রী মমতাজ পাহাড়ী। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪২০।

১৯৭১ সালের ২০ মে। আনোয়ার হোসেন পাহাড়ীকে তাঁর মা বললেন, 'বাবা, তুমি আমার একমাত্র ছেলেসন্তান। তার পরও বলি, বাড়িতে থেকে মরার চাইতে যুদ্ধ করে মরলেও আমি মনকে সান্ত্বনা দিতে পারব যে আমার ছেলে দেশের জন্য জীবন দিয়েছে।' তারপর ২৪ মে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন তিনি।

১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানা আক্রমণ করে কাদেরিয়া বাহিনী। দুপুরে কয়েক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা যার যার অবস্থান থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু করেন। এই যুদ্ধে অংশ নেন আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী।

থানার সামনে একটি কাঠের পুলের ২০ গজ দূরে কাঁচা সড়কের নিচে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি। তাঁদের কাছে অস্ত্র ছিল তিনটি এলএমজি, নয়টি এসএমজি, দুটি মর্টার ও দুটি গ্রেনেড লঞ্চার। বাকি সব রাইফেল। পাহাড়ীর দলের ওপর দায়িত্ব ছিল থানার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করার।

লাগাতার মর্টার, গ্রেনেড ও ব্লান্ডিসাইডের গোলার বিকট শব্দ ও অন্যান্য অস্ত্রের ঝনঝনানিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হতে থাকে। কয়েক মিনিট পর অন্য একটি দলের দলনেতা পাহাড়ীকে জানান, তাঁদের অবস্থানে দুটি বাংকার থেকে পাকিস্তানি সেনারা অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে। গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে ওই বাংকারে গ্রেনেড নিক্ষেপের জন্য তিনি পাহাড়ীকে অনুরোধ করেন।

আনোয়ার হোসেন পাহাড়ীর কাছে ছিল গ্রেনেড লঞ্চার। তিনি সেটা দিয়ে একটি বাংকারের ছিদ্রমুখ বরাবর গ্রেনেড ছোড়েন। সঠিক নিশানায় সেটি আঘাত হানে। স্তব্ধ হয়ে যায় সেখানকার এলএমজি। নিহত হয় বাংকারের ভেতরে থাকা পাকিস্তানি সেনারা।

এরপর তিনি একই পজিশন থেকে যখন দ্বিতীয় বাংকারে গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে গ্রেনেড ছুড়বেন, ঠিক তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। ট্রিগারে চাপ দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে ওই বাংকারে থাকা শত্রুপক্ষের এলএমজিম্যান তাঁকে দেখে ফেলে। সে তড়িৎগতিতে এলএমজির ব্যারেলটি তাঁর দিকে ঘুরিয়ে গুলি শুরু করে। তাঁর মুখের বাঁ চোয়ালে এবং গলার বাঁ পাশে গুলি লাগে।

পাহাড়ীর পেছনে গ্রেনেড লঞ্চারের বাঁট ধরে ছিলেন সহযোদ্ধা হুমায়ুন বাঙ্গাল। তাঁরও পিঠে দুটি গুলি লাগে। দুজনই একসঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে অন্য সহযোদ্ধারা তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যান স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে। বেঁচে যান তাঁরা।

আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী ১৯৭১ সালে সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে একটি কোম্পানির সহকারী অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মধুপুর, ভেংগুলা, ভুঞাপুর, সিংগুলিয়া, সোহাগপাড়া, মির্জাপুরসহ আরও কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রউফ শরীফ, বীর প্রতীক

গ্রাম তাড়াইল, উপজেলা কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
বাবা আলেম শরীফ, মা মাজেদা খাতুন।
স্ত্রী হামিদা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৭। মৃত্যু ১৯৯৩।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল একযোগে আক্রমণ চালায় পঞ্চগড় জেলার বোদা থানায় (বর্তমানে উপজেলা)। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর একটি উপদলের (সেকশন) নেতৃত্ব দেন আবদুর রউফ শরীফ। তাঁরা ১ ডিসেম্বর বোদা থানা দখল করে নেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বোদা থেকে পশ্চাদপসরণ করে নতুন স্থানে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সেই সুযোগ না দিয়ে ধাওয়া করেন। পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে, কিন্তু টিকতে পারেনি।

পাকিস্তানি সেনারা ভূল্লী সেতু পার হয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঠেকানোর জন্য সেতুটি বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করে। মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা সেখানে থেমে যায়। এই সুযোগে পাকিস্তানি সেনারা সেখানে নতুন প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করে।

নদীর এক পাড়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সেনা, অপর পাড়ে পাকিস্তানি সেনারা। দুপর থেকে সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দুই পক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। আবদুর রউফ শরীফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিক্রমের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি সেনাদের সেখান থেকে হটানোর জন্য তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এ অবস্থায় মুক্তি ও মিত্রবাহিনীকে যুদ্ধের কৌশল কিছুটা পাল্টাতে হয়। দুই বাহিনীর অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নেন, মুক্তিবাহিনীর একটি দল দূর দিয়ে নদী পার হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে। এই দলে অন্তর্ভুক্ত হন আবদুর রউফ শরীফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিকেলের মধ্যেই নদী পার হন।

আবদুর রউফ শরীফ সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝোড়োগতিতে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানিরা চিন্তাও করেনি এই কৌশল। আক্রমণে তারা বিস্মিত হয়ে পড়ে। একই সময়ে সামনে থেকেও যৌথ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থা বেগতিক হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড আক্রমণে হতাহত হয় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা।

নদী পার হয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের ঝোড়ো আক্রমণে আধা ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। তখন পাকিস্তানি সেনারা নিহত সহযোদ্ধাদের ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মুক্ত হয় ভূল্লী। ভূল্লী মুক্ত হওয়ায় যৌথ বাহিনী খুব সহজেই ঠাকুরগাঁও জেলা (তখন মহকুমা) শহর দখল করতে সক্ষম হয়।

আবদুর রউফ শরীফ ১৯৭১ সালে দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীন ঠাকুরগাঁও উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) কর্মরত ছিলেন।

২৮ মার্চ গভীর রাতে আবদুর রউফ শরীফসহ বাঙালি ইপিআর সদস্যরা বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তখন অবাঙালি ইপিআরদের সঙ্গে তাঁদের রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ হয়। বেশির ভাগ অবাঙালি ইপিআর সেনা এই যুদ্ধে নিহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রশিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম তন্তর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা সুন্দর আলী ভূঁইয়া, মা করপুলের নেছা।
স্ত্রী খোদেজা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২০৮। মৃত্যু ২০০৮।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত ভোমরা। এপ্রিল মাসের শেষে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন এখানে এসে। এই দলে ছিলেন আবদুর রশিদ।

মে মাসের শেষ দিকে একদিন রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবস্থানে আকস্মিক হামলা চালায়। আবদুর রশিদসহ মুক্তিযোদ্ধারা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেকোনো সময় তাঁদের অবস্থানে হামলা চালাতে পারে। তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাকিস্তানি হামলা প্রতিহত করে পাল্টা হামলা চালান। ফলে পাকিস্তানি সেনারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সকালে পাকিস্তানি সেনারা আবার আক্রমণ করে। এবারও মুক্তিযোদ্ধারা সফলতার সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়নের কয়েকটি কোম্পানি একের পর এক সেখানে আক্রমণ চালায়। থেমে থেমে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। শত্রুসেনারা বারবার আক্রমণ করেও মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। বাঁধের ওপর সুবিধাজনক জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে সুইপিং ফায়ার করেন।

এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে। তাদের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আহত এবং একজন ক্যাপ্টেনসহ অনেক সেনা নিহত হয়। অবশ্য হতাহতের সঠিক সংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্য মুক্তিযোদ্ধারা পাননি। তবে তাঁরা জানতে পারেন, যুদ্ধে নিহত পাকিস্তানি সেনাদের মৃতদেহ ট্রাকে করে সাতক্ষীরা হয়ে যশোর সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

সারা দিনের এই যুদ্ধে আবদুর রশিদসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শন করেন। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দুজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। শহীদ দুজন মুক্তিযোদ্ধার একজন নিহত পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ নিজেদের অবস্থানে টেনে আনার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। পরে আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা ওই ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ টেনে আনেন।

আবদুর রশিদ ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে যশোর সেক্টরের ৪ নম্বর উইংয়ের অধীনে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ ও ভোমরার যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ভোমরার পতন হলে আবদুর রশিদ ভারতে চলে যান। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের লালবাজার সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। একটি ছোট দলের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বেশির ভাগ যুদ্ধেই পুরো অগ্রভাগে থাকতেন। একটি যুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর বুকের বাঁ পাশে গুলি লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুর রহমান, বীর প্রতীক

টানপাড়া, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা মো. মোস্তফা মিয়া ওরফে কফিল উদ্দিন।
মা গুলবারে নেছা। স্ত্রী আয়েশা বেগম। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৪৫। শহীদ ৯ এপ্রিল ১৯৭১।

শেরপুর সাদিপুর। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সংযোগস্থল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন শেরপুর-সাদিপুরে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার-পুলিশ ও ছাত্র-যুবক সমন্বয়ে গড়া মুক্তিবাহিনী।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলে ছিলেন আবদুর রহমান। তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল)।

আজিজুর রহমানের নির্দেশে ৭-৮ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে একাংশ সিলেট শহরে, একাংশ খাদিমনগর, একাংশ আম্বরখানা ও ওয়্যারলেস স্টেশনে অবস্থান নেয়। আরেকটি অংশ ছিল সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে। তারা ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। এই দলেই ছিলেন আবদুর রহমান।

মুক্তিযোদ্ধারা ৮ এপ্রিল রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন। সিলেটের খাদিমনগরে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। আম্বরখানায় সারা রাত যুদ্ধ চলে। আক্রমণকারী পাকিস্তানি সেনা ছিল সংখ্যায় বিপুল। তুলনায় মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন অনেক কম।

রাত তিনটার দিকে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে বেশির ভাগ অবস্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। চার ঘণ্টা যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনারা সিলেট শহরের বেশির ভাগ দখল করে নেয়। তবে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীর মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে ছিল। কিন ব্রিজের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল আবদুর রহমানের দলের এলএমজি পোস্ট। কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ তিনি নিজেই ছিলেন এই পোস্টের দায়িত্বে।

সেখানে পকিস্তানি সেনারা শেষ রাত থেকে বিরামহীনভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এর ছত্রচ্ছায়ায় তারা ওই স্থান দখলের চেষ্টা চালায়। আবদুর রহমান এলএমজি দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করেন। তাঁর ও সহযোদ্ধাদের সাহস দেখে পাকিস্তানি সেনারা পরদিন (৯ এপ্রিল) সকাল পর্যন্ত নদী পারাপারে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে চলে যায়। একপর্যায়ে কিন ব্রিজের এলএমজি পোস্টের অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তার পরও আবদুর রহমান এতে বিচলিত হননি বা সাহস হারাননি। তখন তাঁর সহযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করতে চাইলে তিনি একজন তেজি যোদ্ধার মতোই বলেন, যতক্ষণ জীবিত আছেন ততক্ষণ তিনি এই অবস্থান ধরে রাখবেন। ঠিক এই সময় পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া গোলা ওই এলএমজি পোস্টে এসে পড়ে। গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন অমিত সাহসী আবদুর রহমান। এরপর সেখানকার প্রতিরোধও ভেঙে পড়ে।

আবদুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল আউয়াল সরকার, বীর প্রতীক

গ্রাম শাদগাঁও, উপজেলা বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আফতাব উদ্দিন সরকার, মা কেলেন্তারা বিবি।
স্ত্রী হালিমা খাতুন সিদ্দিক। তাঁদের ছয় মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৫। মৃত্যু ১৯৯৩।

সকালে খুলনার জলসীমায় নির্বিঘ্নেই পৌঁছে তিনটি গানবোট। এর দুটি ছিল মুক্তিবাহিনীর। অপরটি ভারতীয় নৌবাহিনীর। মুক্তিবাহিনীর একটি গানবোটে ছিলেন আবদুল আউয়াল সরকার। গানবোটগুলো পথে কোথাও বাধা পায়নি। সেগুলো দ্রুত এগিয়ে যায়।

১০ ডিসেম্বর রণতরিগুলো যখন খুলনার পাকিস্তানি নৌঘাঁটির কাছাকাছি, তখন আকাশে দেখা যায় ওই তিন জঙ্গি বিমান। পলাশ গানবোটে ছিলেন আবদুল আউয়াল সরকার। শত্রুবিমান মনে করে পদ্মা ও পলাশের নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে গোলাগুলি করতে উদ্যত হন। কিন্তু ভারতীয় নৌবাহিনীর প্যানভেল গানবোট থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জানানো হয় ওগুলো ভারতীয় বিমান।

এরপর বিমানগুলো কিছুটা নিচে নেমে দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরের দিকে চলে যায়। ১০-১১ মিনিট পর হঠাৎ ঘুরে এসে বোমাবর্ষণ করে পদ্মার ওপর। পরক্ষণেই পলাশে। যদিও গানবোটগুলো মুক্তি না মিত্রবাহিনীর তা শনাক্তের জন্য ছাদে ১৫ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট চওড়া হলুদ কাপড় বিছানো ছিল। তার পরও এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর প্যানভেল গানবোটে বিমানগুলো বোমাবর্ষণ করেনি। সেটি তখন বেশ এগিয়ে ছিল। বোমার আঘাতে মুক্তিবাহিনীর গানবোটে আগুন ধরে যায়। দুই গানবোটে আবদুল আউয়াল সরকারসহ ৫৬ জন নৌযোদ্ধা ছিলেন। বিপদ আন্দাজ করে কেউ কেউ আগেই পানিতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু আউয়ালসহ যাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গানবোটে ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন শহীদ এবং বাকি প্রায় সবাই আহত হন।

ঘটনাচক্রে আবদুল আউয়াল সরকার তেমন আহত হননি। তিনি গুরুতর আহত দুই-তিনজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেন। আহত অন্য নৌ-মুক্তিযোদ্ধারাও যে যাঁর মতো পানিতে ঝাঁপ দেন। অনেকে সাঁতার কেটে নদীর পাড়ে ওঠেন। নদীতীরে ছিল পাকিস্তানি সেনা বা তাদের সহযোগী রাজাকার। আবদুল আউয়াল সরকার, রুহুল আমিনসহ (বীরশ্রেষ্ঠ) কয়েকজনকে রাজাকাররা আটক করে। রুহুল আমিনকে রাজাকাররা তখনই হত্যা এবং বাকিদের নির্যাতনের পর পাকিস্তানিদের কাছে হস্তান্তর করে। পাকিস্তানিরা তাঁকেসহ অন্যদের জেলে পাঠায়। স্বাধীনতার পর তিনি মুক্তি পান।

আবদুল আউয়াল সরকার পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের (তখন পশ্চিম পাকিস্তানি) করাচিতে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান।

প্রথমে তিনি ২ নম্বর সেক্টরে স্থল মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয়ভাবে নানা সহায়তা করেন। এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেকি করতে এসে তিনি আটক হন। কৌশলে মুক্তি পেয়ে আবার ভারতে যান। পরে তিনি মুক্তিবাহিনীর নৌদলে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল আলিম, বীর প্রতীক

গ্রাম সাহাপুর, সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া।
বাবা জলিল বিশ্বাস, মা চিনিরন নেছা।
স্ত্রী জরিনা খাতুন। তাঁদের চার মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৩। মৃত্যু ১৯৯৫।

রাতের বেলা আবদুল আলিমসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে রওনা হন তাদের লক্ষ্যস্থল অভিমুখে।

মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য ছিল বসন্তপুরের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ করা। সাতক্ষীরা জেলা সদরের দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবহাটা উপজেলার অন্তর্গত বসন্তপুর। মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি।

মধ্যরাতে আবদুল আলিম ও তাঁর সহযোদ্ধারা পৌঁছান লক্ষ্যস্থলের কাছে। কিন্তু তাঁরা জানতে পারেন ঘাঁটিতে পাকিস্তানি সেনাসহ সহযোগী কেউ নেই। এটি ছিল অস্বাভাবিক এক ঘটনা। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা সিদ্ধান্ত নেন বাকি রাত সেই গ্রামেই অবস্থানের। এদিকে ওই গ্রামের বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন ছিল পাকিস্তানিদের বিশ্বস্ত অনুচর। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাঠায় নিকটবর্তী পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে।

সকাল হওয়ার আগেই পাকিস্তানিরা গোটা গ্রাম ঘেরাও করে। তখন পাহারায় নিযুক্ত কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ঘুমিয়ে। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আকস্মিক আক্রমণ করে। নিমেষে শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ। দুই পক্ষের গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে পড়ে। আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়েও আবদুল আলিমসহ মুক্তিযোদ্ধারা মনোবল হারাননি। সাহসের সঙ্গে তাঁরা আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানিরা বিস্মিত হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনা ও সশস্ত্র বিহারিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

সেদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। দেড়-দুই ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানিদের বাঙালি সহযোগী বেশির ভাগ পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনা ও বিহারিরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করেও ব্যর্থ হয়। পাঁচ ঘণ্টা পর জীবিত পাকিস্তানি ও বিহারীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যেই নিহত হয় তাদের অনেক। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে শত্রুদের ১৯টি মৃতদেহ পান। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৩ জুনের।

বসন্তপুরের যুদ্ধ ছিল গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিরাট এক সাফল্য। অবশ্য এই সাফল্য ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আবদুল আলিমের সাতজন সহযোদ্ধাও শহীদ হন। আর আহত হন তিনিসহ ১৪-১৫ জন। যুদ্ধের একপর্যায়ে প্রথমে তাঁর শরীরে বোমার স্প্লিন্টার এবং পরে গুলি লাগে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টা বা এর কিছু আগে আবার তাঁর শরীরে গুলি লাগে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা তাঁকে ভারতে নিয়ে যান। সুস্থ হয়ে আগস্ট মাসে তিনি পুনরায় যুদ্ধে যোগ দেন।

আবদুল আলিম ১৯৭১ সালে কৃষিকাজ করতেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণও তাঁর নেওয়া ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। ভারতের চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে ৯ নম্বর সেক্টরে, পরে ৮ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল ওয়াজেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম বিষ্ণুদিয়া, ইউনিয়ন বিনয়কাঠি, সদর, ঝালকাঠি।
বাবা ইয়াছিন উদ্দীন হাওলাদার, মা লতিফুন নেছা।
স্ত্রী রাজিয়া বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২৫।

মধ্যরাতে ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে হইচই আর বাঁশির শব্দ। আবদুল ওয়াজেদ ঘুমিয়ে ছিলেন। হইচই আর বাঁশির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। শুনলেন, পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সের সামনে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছিল যশোরে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে।

সেদিন রাত সাড়ে ১১টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি দল যশোর সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে শহরে প্রবেশ করে। একটি দল অবস্থান নেয় ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সের কাছে। যশোর ইপিআর সেক্টরে তখন ইপিআরের বাঙালি সদস্যের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। পাহারারত কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগ সদস্য এ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁরা ঘুম থেকে উঠে দ্রুত অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলার প্রস্তুতি নেন।

AMARBOI.COM

শেষ পর্যন্ত সেই রাতে পাকিস্তানি সেনারা যশোর ইপিআর সেক্টরে আক্রমণ করেনি। তবে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। ইপিআরের বাঙালি সদস্যরা সতর্ক অবস্থায় থাকেন। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে চলে যায়। ৩০ মার্চের পর আবদুল ওয়াজেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে শহরের কারবালা, চাঁচড়া ও কলেজ এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

৩ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইপিআরের তিন প্রতিরক্ষা অবস্থানেই আক্রমণ চালায়। ব্যাপক আক্রমণে ইপিআর সদস্যদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরপর তাঁরা পিছু হটে ঝিকরগাছায় অবস্থান নেন। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানেও আক্রমণ চালায়। ফলে ভয়াবহ যুদ্ধ বাধে। সেদিন আবদুল ওয়াজেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল পিছু হটতে বাধ্য হয়।

পরদিন ১২ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর্টিলারির সাপোর্ট নিয়ে ইপিআর অবস্থানে আবার আক্রমণ চালায়। আবদুল ওয়াজেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা এ দিন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও সফল হতে পারেননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁরা অবস্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। সেদিন যুদ্ধে তাঁদের দুজন সহযোদ্ধা শহীদ ও কয়েকজন গুরুতর আহত হন।

আবদুল ওয়াজেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা এরপর অবস্থান নেন নাভারনে। কয়েক দিন পর সে অবস্থানেরও পতন হয়। সেখান থেকে তাঁরা বেনাপোল হয়ে ভারতে যান। ভারতে যাওয়ার কিছুদিন পর আবদুল ওয়াজেদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কারণে তাঁর পক্ষে পরে আর সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সুস্থ হওয়ার পর আবদুল ওয়াজেদকে ৮ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তরে কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল ওয়াহেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম তেলজুরী, ইউনিয়ন শেখর, উপজেলা বোয়ালমারী, ফরিদপুর। বাবা বারিক মোল্লা, মা মোমেনা খাতুন। স্ত্রী লাইলী বেগম। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪১। গেজেটে নাম আবদুল ওয়াহিদ। শহীদ ২৩ জুন ১৯৭১।

সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত তলিগাছি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ২১ জুন তলিগাছিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি টহলদলের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এ দলে ছিলেন আবদুল ওয়াহেদ। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি।

সেদিন প্রায় এক ঘণ্টা দুই পক্ষে সামনাসামনি পাল্টাপাল্টি গুলির ঘটনা ঘটে। সম্মুখযুদ্ধের একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন আবদুল ওয়াহেদ। যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা তাঁকে ভারতে নিয়ে যান। দুই দিন পর ২৩ জুন বানপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা যান তিনি। ভারতেই তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন আবদুল ওয়াহেদ। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের (তখন পশ্চিম পাকিস্তানি) করাচিতে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৭ মে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে চলে যান। সেই ছিল তাঁর শেষ যাওয়া, আর ফিরে আসেননি। স্বাধীনতার পর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

আবদুল ওয়াহেদের গ্রামের আরও কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তাঁরা সবাই স্বাধীনতার পর একে একে বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর পরিবারের সবাই অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। কয়েক মাস পর তাঁর বাবা যশোর সেনানিবাসে যান খবর নিতে। তখন জানতে পারেন ছেলের শহীদ হওয়ার খবর।

তাঁর খেতাবপ্রাপ্তির খবর পরিবারের লোকজন ১৯৯২ সালে জানতে পারেন। পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সনদ গ্রহণ করেন তাঁর মেয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল কাদের, বীর প্রতীক

গ্রাম লতিফ সিকদার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।
বাবা কাজী মমতাজ উদ্দিন, মা লুৎফুন নেছা।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৭।
শহীদ ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু ঢাকার মিরপুর এলাকা তখনো মুক্ত হয়নি। স্বাধীনতার পর প্রায় দেড় মাস ওই এলাকা সশস্ত্র বিহারিদের দখলে ছিল।

বাংলাদেশ সরকার বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও বিহারিরা আত্মসমর্পণ করেনি। এ অবস্থায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সেখানে অভিযান পরিচালনার। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা (তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) সেখানে অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানে গিয়ে আবদুল কাদেরসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা বিহারিদের পাল্টা আক্রমণে শহীদ হন।

স্বল্প পরিসরে এ ঘটনার বর্ণনা আছে মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীর বিক্রমের (১৯৭১ সালে মেজর, পরে রাষ্ট্রদূত ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) লেখায়। তিনি লিখেছেন: '...২৯ তারিখে সন্ধ্যায় হাবিলদার ওয়াজেদ আলী বারকির (বীর প্রতীক) নেতৃত্বে এক প্লাটুন সেনা সাড়ে ১১ নম্বর সেকশনে পুলিশ পোস্টের কাছে মোতায়েন করা হয়। রাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ওই স্থান ছেড়ে যান। রাত শেষে ৩০ জানুয়ারি সকালে পুলিশ এসে সেনাসদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর তারা ১২ নম্বর সেকশনে যায় এবং বিভিন্ন পয়েন্টে সেনা মোতায়েন করে। উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশ বাড়িঘরে তল্লাশি করে চিহ্নিত লোকজনকে গ্রেপ্তার করবে এবং সেনাবাহিনী তাদের সহায়তা করবে।

'আনুমানিক (বেলা) ১১টার দিকে চতুর্দিকের বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে অতর্কিতে একযোগে সেনা ও পুলিশের ওপর বিহারিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

'চারদিকের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে পড়ে পুলিশ ও সেনারা হতাহত হয়। তাঁরা পাল্টা আক্রমণের তেমন সুযোগই পাননি। অনেকে ঘটনাস্থলে নিহত হন। কোম্পানি কমান্ডার হেলাল মোরশেদও আহত হন।'

পরে শহীদ আবদুল কাদেরের মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করা হয় ঢাকা সেনানিবাস কবরস্থানে। সেখানে তাঁর সমাধি সংরক্ষিত।

আবদুল কাদের শিক্ষার্থী ছিলেন। এসএসসি পাস করে ১৯৭১ সালে কলেজে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধের পর ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হন। ২ নম্বর সেক্টরের অধীন বিভিন্ন জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে চন্দ্রপুর-লাতুমুড়ার যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল কুদ্দুস, বীর প্রতীক

গ্রাম গোগাউড়া, উপজেলা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
বাবা আবদুস শহিদ, মা কাতেমুন্নেছা।
স্ত্রী সালেমা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫০।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। রাতে আবদুল কুদ্দুসসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় এলাকায়। এপারে বাংলাদেশের কসবা থানার লাতুমুড়া। মুক্তিযোদ্ধাদের মূল লক্ষ্য অবশ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কসবার পুরোনো বাজার ঘাঁটি, সেটি দখল করা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত কসবা।

কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা লাতুমুড়ায় সমবেত হয়েছেন বিশেষ কারণে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদের ধোঁকা দেওয়া। প্রায় এক ব্যাটালিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন লাতুমুড়ার সামনে।

মুক্তিযোদ্ধারা লাতুমুড়ার সামনে গোলাগুলি ও ছোটখাটো যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করেন। এর মাধ্যমে সফলতার সঙ্গেই তাঁরা পাকিস্তানিদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। কসবার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত হয়ে লাতুমুড়ার সামনে সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নেয়। এ ঘটনা চলাকালে আবদুল কুদ্দুসসহ মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ অন্ধকারে স্থান পরিবর্তন করেন।

২২ অক্টোবর ভোরে একদল মুক্তিযোদ্ধা লাতুমুড়ার সামনে থেকে প্রথম আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ শুরু করে। তখন আবদুল কুদ্দুসরা পেছন দিক থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন। বিস্মিত পাকিস্তানিরা এমন আক্রমণ আশা করেনি। আক্রমণ প্রতিরোধে তারা ব্যর্থ হয় এবং পশ্চাদপসরণ করে।

তবে পাকিস্তানিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পুনরায় সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুখোমুখি যুদ্ধ চলতে থাকে। আবদুল কুদ্দুস ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তাঁদের সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা পিছু হটতে শুরু করে।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের ওপর আরও চড়াও হন। দুই পক্ষে প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের একপর্যায়ে একটি শেল বিস্ফোরিত হয় আবদুল কুদ্দুসের পাশে। স্প্লিন্টার তাঁর বুকে লাগে। আহত হয়েও তিনি দমে যাননি। যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে ফিল্ড চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান।

সেদিন প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানিরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ২৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৮ জন আহত হয়। এলএমজি, পিস্তল ও গ্রেনেডসহ নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

আবদুল কুদ্দুস ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। পরে ওই রেজিমেন্টের অধীনে প্রশিক্ষণ নেন। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর নবগঠিত নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২ নম্বর সেক্টরে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল গফুর, বীর প্রতীক

চরপাড়া, কাউলজানী, উপজেলা বাসাইল, টাঙ্গাইল।
বাবা গজনভী মিয়া, মা বাছাতন বেগম। স্ত্রী লাইলি বেগম।
তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৬।

সকালবেলায় আবদুল গফুরের অবস্থান ধলাপাড়ার কাছাকাছি। গোলাগুলির শব্দ। তিনি বুঝতে পারলেন আশপাশে কোথাও পাকিস্তানি সেনারা এসেছে। আবদুল গফুর মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর সঙ্গে আছেন ৪০-৪৫ জন সহযোদ্ধা। দলনেতা তিনি নিজেই। ভাবলেন, পাকিস্তানি সেনাদের অতর্কিতে আক্রমণের সুযোগ পাওয়া গেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

আবদুল গফুরের অনুমান ভুল হলো না। বেলা আনুমানিক একটা। খবর পেলেন, শত্রুসেনারা ফিরে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজ চোখেই তাদের দেখতে পেলেন। কোথাও কোনো বাধা না পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই আসছে। সেনা ও সহযোগী রাজাকার মিলে সংখ্যায় তারা কম নয়। আবদুল গফুরের মনে হলো তাঁদের চেয়েও বেশি।

আবদুল গফুর এতে বিচলিত হলেন না। তিনি জানেন, আশপাশে আছে তাঁদের আরেকটি দল। খবর পেলে তারাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবে। যদি না-ও আসে তাহলেও ক্ষতি নেই। যদি পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ করে, তিনি তাঁর দল নিয়েই তাদের মোকাবিলা করবেন। সহযোদ্ধাদের সাহস দিয়ে বললেন, পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পাবে না। জান বাঁচাতে পালাতে থাকবে। আরও বললেন, তিনি সংকেত দেওয়ার আগে কেউ যেন গুলি না করেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে পাকিস্তানি সেনা আর রাজাকাররা আবদুল গফুরের দলের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের আওতায় চলে এল। তিনি সংকেত দেওয়ামাত্র তাঁর সহযোদ্ধারা একযোগে গুলি শুরু করলেন। নিমেষে লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার। বাকিরা ছোটাছুটি শুরু করে দিল। রাজাকাররা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা পজিশন নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঘটনাচক্রে কাদেরিয়া বাহিনীর সামরিক প্রধান আবদুল কাদের সিদ্দিকীও (বীর উত্তম) কয়েকজন সহযোদ্ধাসহ সেদিন মাকড়াইয়ের কাছাকাছি ছিলেন। তিনিও ওই যুদ্ধে অংশ নেন।

সেদিন মাকড়াইয়ের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কয়েকজন নিহত ও অনেকে আহত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা নিহত ব্যক্তিদের ফেলে এবং আহতদের নিয়ে পালিয়ে যায়। মাকড়াই টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার অন্তর্গত। এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে।

আবদুল গফুর চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। সে সময় ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে তিনি কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁকে একটি দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। ভূঞাপুর, ধলাপাড়া, দেওপাড়া, বল্লাসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল জব্বার, বীর প্রতীক

গ্রাম কপালহর, উপজেলা নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
বাবা ইসহাক আলী, মা সৈয়দজান বেওয়া।
স্ত্রী আয়েশা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫০। মৃত্যু ১৯৯৮।

১৫ অক্টোবর ১৯৭১। ভারতে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে সকাল থেকেই চাঞ্চল্য। বেলা ১২টা বাজার আগেই আবদুল জব্বারসহ মুক্তিযোদ্ধারা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলেন। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। সংখ্যায় তাঁরা শতাধিক।

দিনের বেলায়ই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবেশ করলেন বাংলাদেশের ভেতরে। চারদিকে চা-বাগান।

বিভিন্ন চা-বাগানে আছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে সেসব চা-বাগানে অতর্কিতে আক্রমণ করবেন। এর মধ্যে ফুলতলা-সাগরনাল চা-বাগান অন্যতম। অবস্থানগত কারণে সাগরনালের গুরুত্ব অনেক। জুড়ী থেকে আট-নয় মাইল পর সাগরনাল। তারপর আবার কয়েক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফুলতলা।

চা-বাগানগুলো মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। ফুলতলার পরই ভারতীয় সীমান্ত এলাকা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ফুলতলা-সাগরনাল চা-বাগানে ঘাঁটি তৈরি করে। শক্তি-সামর্থ্যও সংহত করে যথেষ্ট পরিমাণে। নিরীহ চা-শ্রমিকেরা তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতনে ঘরবাড়ি ছেড়ে পলাতক। কেউ কেউ অবশ্য পালাতে পারেননি। তাঁদের ওপর পাকিস্তানি সেনারা নির্যাতন চালাতে থাকে। অত্যাচারী পাকিস্তানি সেনাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ছিল ওই অপারেশন।

শেষ রাতে মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে একযোগে আক্রমণ চালান। পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ চলে। সাগরনাল চা-বাগানের যুদ্ধে আবদুল জব্বার যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হন। সেদিন যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রায় ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। আহত হয় অনেক। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কয়েকজন আহত হন। এর বেশি ক্ষয়ক্ষতি মুক্তিযোদ্ধাদের হয়নি।

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে মেজর চিত্তরঞ্জন দত্তের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) ভাষ্যে। সেখানে তিনি বলেন, 'প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়াউদ্দীন আহমদের (বীর উত্তম) নেতৃত্বে এবং অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর আমিনের (আমিনুল হক, বীর উত্তম, পরে ব্রিগেডিয়ার) নেতৃত্বে সিলেটের চা-বাগানগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। পরিকল্পনা ছিল চা-বাগানগুলো শত্রুমুক্ত করে আমরা সবাই মিলে সিলেটে অগ্রসর হব। প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট আঘাত হানে কেজুড়ীছড়া চা-বাগানে। একই সময় অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট আঘাত হানে ফুলতলা-সাগরনাল চা-বাগানের ওপর।'

আবদুল জব্বার চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীনে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। সেখানে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলায় যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল জব্বার, বীর প্রতীক

গ্রাম ভাটিয়া, সদর, কিশোরগঞ্জ। বাবা মো. আলী হোসেন, মা আনেছা খাতুন। স্ত্রী রওশন আরা আক্তার। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৭।

মুক্তিযোদ্ধাদের মূল দল আক্রমণের লক্ষ্যে রওনা হলো সীমান্তসংলগ্ন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটির উদ্দেশে। একই সময় আরেক দল রওনা হলো কাট অফ পার্টি হিসেবে। এই দলে আছেন আবদুল জব্বার। তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে মধ্যরাতে অবস্থান নিলেন সড়কের ধারে।

ভোর রাতে গোলাগুলির শব্দ শুনে আবদুল জব্বার ও তাঁর সহযোদ্ধারা সতর্ক হলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁদের মূল দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সীমান্তসংলগ্ন ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে। তাঁদের চোখ রাস্তার দিকে। ২০-২৫ মিনিট পর রাস্তায় গাড়ির শব্দ। মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পেলেন, তিনটি গাড়ি এগিয়ে আসছে। সেগুলো গুলির আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল তাঁদের সবার অস্ত্র। একটি গাড়ি ধ্বংস হলো মুক্তিযোদ্ধাদের পাতা মাইন বিস্ফোরণে। পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণের তেমন সুযোগ পেল না। হতাহত হলো অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের। ঘটেছিল কামালপুরের পাশে জামালপুর-বকশীগঞ্জ সড়কে। আবদুল জব্বারের দলনেতা ছিলেন আবদুল মান্নান (বীর বিক্রম)। তাঁর নেতৃত্বে আবদুল জব্বার এই অপারেশনসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। আবদুল মান্নানের ভাষ্যে শোনা যাক কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ :

'...অনেক যুদ্ধ হয় কামালপুর এলাকায়। কামালপুরের পরে একটি গ্রাম ধানুয়া কামালপুর। ওই গ্রামটির কন্টিনিউয়েশন ভারত সীমান্তের ওপারের গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। ধানুয়া কামালপুরের একটি কন্টিনিউয়েশন ছিল বকশীগঞ্জের দিকে। এই পথে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আমি চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ছয়-সাতটি পাকিস্তানি আর্মির গাড়ি মাইনের সাহায্যে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

'কামালপুরে এমন কোনো দিন ছিল না যে পাকিস্তানি সেনারা শান্তিতে বসবাস করতে পারত। অক্টোবর মাসের কোনো এক সময় ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালানো হলো। সেই আক্রমণে তাদের একটি কোম্পানি কামালপুরের পেছনে অ্যামবুশ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি কোম্পানিও তাদের সঙ্গে ছিল। কামালপুরের পাকিস্তানি ফোর্সকে সহায়তা করার জন্য বকশীগঞ্জ থেকে মর্টার নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তিনটি গাড়ি আসছিল। তখন রাস্তায় অ্যামবুশ করে গাড়িসমেত পাকিস্তানি সেনাদের খতম করা হয়।'

আবদুল জব্বার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে হাবিলদার ছিলেন। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসের স্টেশন সাপ্লাই ডিপোতে। ২৯ মার্চ সেনানিবাস থেকে পালিয়ে এসে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর প্রথমে ৫ নম্বর সেক্টরে, পরে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। ৫ নম্বর সেক্টরের বড়ছড়া সাবসেক্টরে থাকাকালে ৮ আগস্ট সাচনা-জামালগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল বাতেন, বীর প্রতীক

গ্রাম ছিটলক্ষ্মণপুর রাধানগর, ইউনিয়ন রামনাথপুর, উপজেলা বদরগঞ্জ, রংপুর। বাবা আবদুল কুদ্দুস সরকার, মা রাহেলা বেগম। স্ত্রী সাজেদা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩১। মৃত্যু ২০০৭।

সকাল থেকে আবদুল বাতেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অবস্থানগত এলাকা ঘিরে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। নায়েক শহীদ মেশিনগানম্যান। বাতেন তাঁর সহকারী। তাঁরা দুজন মেশিনগান দিয়ে অবিরাম গুলি করতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে। মেশিনগানের গুলিতে থেমে গেল পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা।

এ ঘটনা ঘটে ছাতকে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। ছাতক সিলেট জেলার অন্তর্গত। সুরমা নদীর তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর। নদীর পশ্চিম তীরে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। ছাতক শহর ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ঘিরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা।

১৪ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা ছাতকে আক্রমণ করেন। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলেন। কাট অফ পার্টিতে ছিলেন আবদুল বাতেন। তাঁর দলের নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট এস আই এম নূরুন্নবী খান (বীর বিক্রম, পরে লে. কর্নেল)। তাঁরা ছাতকের অদূরে হাসনাবাদ এলাকায় অবস্থান নেন, যাতে ওই দিক দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা ছাতকের অবস্থানে কোনোভাবেই রিইনফোর্সমেন্ট করতে না পারে।

এই যুদ্ধের ঘটনা শোনা যাক মুক্তিযোদ্ধা এস আই এম নূরুন্নবী খানের ভাষ্য থেকে। তিনি বলেন, '১৪ অক্টোবর ১৯৭১। তখন সকাল ৯টার মতো হবে। পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে প্রতীক্ষিত প্রথম আক্রমণটি এসে গেল। উত্তর কালারুখা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের সুপারিবাগানে ওদের একত্র হতে দেখলাম। দেখতে না দেখতেই পাকিস্তানি সেনারা অ্যাসল্ট লাইন করে আমাদের অবস্থানের দিকে দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। নায়েক শহীদের মেশিনগান অবস্থানটি ছিল আমার পাশেই। তাঁর সহকারী ছিল আবদুল বাতেন। শহীদকে মেশিনগানের গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিলাম। অন্যান্য সব অবস্থান থেকেও একযোগে গুলি ছোড়া শুরু হলো।

'পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল। অনেকগুলো লাশ মাঠে ফেলে রেখে ওরা পেছনে হটে গেল। সকাল ১০টার দিকে পাকিস্তানি সেনারা পুনরায় আক্রমণের চেষ্টা চালাল। এভাবে সারা দিন তারা অন্তত পাঁচ/ছয় বার আমাদের অবস্থানে আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণগুলো ছিল ভয়াবহ ধরনের। দু-তিনটি আক্রমণ নায়েক শহীদ ও আবদুল বাতেন প্রতিহত করেন। তাঁদের বীরত্বে আমরা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাই।'

আবদুল বাতেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মার্চের প্রথম দিকে তাঁদের বেশির ভাগকে সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। তবে তিনি হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানির সঙ্গে সেনানিবাসে ছিলেন। ৩০ মার্চ তাঁরা বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি যুদ্ধ করেন দিনাজপুর ও সিলেট জেলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল বাতেন খান, বীর প্রতীক

গ্রাম আড়াল, উপজেলা কাপাসিয়া, গাজীপুর।
বাবা সামসুদ্দিন খান, মা হাসুনি বেগম। স্ত্রী হেনা বেগম।
তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১১০।

সব বাধা উপেক্ষা করে আবদুল বাতেন খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও প্রতিরোধ শুরু করে। গোলাগুলিতে রাতের আকাশ লাল হয়ে ওঠে। তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। সকালে শত্রুসেনাদের ওপর তাঁরা বিপুল বিক্রমে চড়াও হন। তাঁদের বিক্রমে পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা পেছন দিকে সরে যায়। নতুন স্থানে তারা অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে বিরাট এলাকা।

পরে পাকিস্তানি সেনারা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে পাল্টা আক্রমণ চালায়। আবদুল বাতেন খানসহ মুক্তিযোদ্ধারা এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। সাহসের সঙ্গে তাঁরা পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করেন। পাকিস্তানিরা তাঁদের অবস্থানে ব্যাপক হারে গোলা ছোড়ে। বিস্ফোরিত গোলার ছোট-বড় স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হন তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা। কিন্তু তাঁরা দখল করা জায়গা থেকে সরে যাননি।

এ ঘটনা সালদা নদীতে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন সালদা নদী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে সালদা এলাকায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য পাকিস্তানিরা একপর্যায়ে সালদা রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি তৈরি করে।

মুক্তিযুদ্ধকালে সালদা এলাকায় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক দিন পরপর পাকিস্তানিদের আক্রমণ করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁরা বড় ধরনের আক্রমণ চালান। চূড়ান্ত আক্রমণের আগে পাকিস্তানিদের সব প্রতিরক্ষায় মুক্তিবাহিনীর মুজিব ব্যাটারির কামান দিয়ে অসংখ্য গোলা ছোড়া হয়। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষার, বিশেষত কয়েকটি বাংকারের, ব্যাপক ক্ষতি হয়।

সালদা নদী রেলস্টেশনের বাংকারগুলো ছিল রেলের বগি দিয়ে তৈরি। ওপরের স্তর যুদ্ধের জন্য। মধ্যম স্তর গোলাবারুদ রাখাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য। নিচের স্তর ছিল বিশ্রামের জন্য। মুক্তিবাহিনীর ছোড়া কামানের গোলায় দু-তিনটি বাংকার সম্পূর্ণ ধ্বংস ও কয়েকটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোলার আঘাতে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়।

আবদুল বাতেন খান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে। রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তিনি তাঁর ইউনিটের সঙ্গে শমশেরনগরে ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মেজর খালেদ মোশাররফের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে তিনি তাতে যোগ দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৌলভীবাজার জেলার কয়েক স্থানে সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে দুই নম্বর সেক্টরের সালদা নদী সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। ধনদইল গ্রাম, নয়নপুরসহ বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মজিদ মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণখান, সদর, গাজীপুর। বাবা মো. জনাব আলী, মা আয়েশা বেগম আহলাদী। স্ত্রী জরিনা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৫। গেজেটে নাম আবদুল মজিদ। মৃত্যু ২০০৫।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের (ব্যাটালিয়ন) সুবেদার মেজর ছিলেন আবদুল মজিদ মিয়া। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে এবং অধিনায়ক (কমান্ডিং অফিসার) ছিলেন বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল জলিল। ১৯৭১ সালের শুরুতে এই রেজিমেন্টকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়েছিল। সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে মার্চ মাসে রেজিমেন্টের অর্ধেক সদস্য ছুটিতে এবং আবদুল মজিদ মিয়াসহ বাকিরা যশোরের জগদীশপুরে বার্ষিক ফিল্ড এক্সারসাইজে ছিলেন।

২৯ মার্চ দুপুরে তলব পেয়ে রাত আনুমানিক ১২টায় তাঁরা সেনানিবাসে পৌঁছান। পরদিন সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১০৭ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার দুররানি রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টার্সে আসেন এবং রেজিমেন্ট অধিনায়ককে জানান, তাঁদের নিরস্ত্র করা হলো। এরপর তিনি অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে চলে যান।

এই খবর মুহূর্তেই বাঙালি সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে বিদ্রোহ করেন এবং অস্ত্রাগার ভেঙে যাঁর যাঁর অস্ত্র নিজ হাতে নিয়ে চারদিকে পজিশন নেন। খবর পেয়ে যশোর সেনানিবাসে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ বালুচ রেজিমেন্ট ও ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স তাঁদের আক্রমণ করে।

আবদুল মজিদ মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে ওই আক্রমণ প্রতিহত করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সকাল আটটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত কয়েকবার আক্রমণ করে। প্রতিবারই তাঁরা সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। যুদ্ধ চলাবস্থায় তিনি এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ (বীর বিক্রম, পরে মেজর) কয়েকবার অধিনায়ক রেজাউল জলিলের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু তিনি নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় আবদুল মজিদ মিয়া ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিনের ওপর যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের ভার দেন।

যশোর সেনানিবাসে তাঁদের তুলনায় পাকিস্তানি সেনা ছিল অনেক বেশি। হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, আবদুল মজিদ মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা বুঝতে পারেন, বেশিক্ষণ তাঁরা যুদ্ধ চালাতে পারবেন না। সে জন্য তাঁরা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

পাকিস্তানি সেনারা উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ—তিন দিক থেকে তাঁদের আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আক্রমণ না করলেও সেদিক থেকেও মাঝেমধ্যে গুলি ছুটে আসছিল। তাঁরা শেষ পর্যন্ত ওই দিক দিয়েই সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে চৌগাছায় একত্র হন। এরপর তাঁরা শুরু করেন যুদ্ধ।

প্রতিরোধযুদ্ধে আবদুল মজিদ মিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কারণ, তখন তাঁদের দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একমাত্র হাফিজ উদ্দিন ছাড়া আর কোনো সেনাকর্মকর্তা ছিলেন না। ফলে, তখন অনেক সময় নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ওপরও পড়ে। আবদুল মজিদ মিয়া প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মমিন, বীর প্রতীক

গ্রাম পিপুইয়া, ইউনিয়ন সহিলপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা।
বাবা আবদুল মোতালেব, মা তৈয়বুন নেছা। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩২৭। শহীদ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকায় আক্রমণের জন্য মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির নিয়ন্ত্রণ নেওয়াটা ছিল জরুরি। সামরিক দিক থেকে দাউদকান্দির অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য যৌথ বাহিনীর দুটি দল দাউদকান্দি অভিমুখে অভিযান শুরু করে। একটি দল চৌদ্দগ্রাম-পরিকোট-লাকসাম অক্ষ ধরে রওনা হয়।

অপর দল ৫ ডিসেম্বর রাজাপুর-জাফরগঞ্জ-চান্দিনা অক্ষ ধরে যাত্রা শুরু করে। ৭ ডিসেম্বর সকালে তারা জাফরগঞ্জে পৌঁছায়। এখানে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন আবদুল মমিনসহ স্থানীয় গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা। ওই দিনই তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইলিয়টগঞ্জের প্রতিরোধ ভেঙে চান্দিনার বেশির ভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ নেন।

এরপর যৌথ বাহিনী অগ্রসর হয় দাউদকান্দির দিকে। আর আবদুল মমিনসহ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা থাকেন ইলিয়টগঞ্জের প্রতিরক্ষায়। ১৩ ডিসেম্বর দাউদকান্দিতে যৌথ বাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী—এই দুই পক্ষের মধ্যে গুলি, পাল্টা গুলি ও আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে। এ দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্ন একটি অংশ হঠাৎ ইলিয়টগঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। আবদুল মমিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে সাহসের সঙ্গে প্রতিহত করেন। এদিকে ইলিয়টগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রান্ত হয়েছেন শুনে দাউদকান্দিতে অবস্থানরত মিত্রবাহিনীর একটি অংশ ইলিয়টগঞ্জে এগিয়ে এসে গোলাগুলি করতে থাকে। গোলন্দাজ দলও গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে।

মিত্রবাহিনীর এই গোলা এসে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। এতে আবদুল মমিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা পড়েন চরম সংকট ও বিভ্রান্তিতে। তাঁরা প্রথমে মনে করেছিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করেছে। সে জন্য তাঁরা নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে থেকে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পরে জানতে পারেন, মিত্রবাহিনী গোলাগুলি করছে। তখন তাঁরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে ছোটাছুটি করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

আবদুল মমিন যেখানে ছিলেন, সেখানে পাশেই ছিল একটি বড় ডোবা। তিনি সেই ডোবাকে নিরাপদ ভেবে সেখানে যাওয়ার সময় গোলার স্প্লিন্টার এসে লাগে তাঁর শরীরে। গুরুতর আহত হয়ে তিনি গড়িয়ে পড়েন ডোবার পানিতে। তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

আবদুল মমিন ১৯৭১ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ভারতে যান। প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরে। তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান, বীর প্রতীক

গ্রাম মোহাম্মদনগর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। বর্তমান ঠিকানা তেঁতুলিয়া, সদর, পঞ্চগড়। বাবা মো. শফিউল্লাহ, মা ফয়েজুননেছা। স্ত্রী তনজিনা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫৪।

আবদুল মান্নান ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে ঠাকুরগাঁও ৯ উইংয়ের (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) পঞ্চগড় কোম্পানি হেডকোয়ার্টার্সে সেপাই হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চের দিন কয়েক আগে তাঁকে চোপড়ামারী ক্যাম্পে বদলি করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আবদুল মান্নান ২৯ মার্চ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে দিনাজপুরের ভাতগাঁও সেতুতে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সেখানে তাঁরা টিকে থাকতে পারেননি। পরে তাঁরা কান্তা ফার্মে অবস্থান নেন।

৮ এপ্রিল সকাল থেকে ইপিআর সৈনিক রহমান, গাড়িচালক সাত্তার ও তিনি কান্তা ফার্মের সামনে টিলার মধ্যে এক বাংকার থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁদের গুলি শেষ হয়ে যায়। এ সময় গুলি সংগ্রহের জন্য বাংকার থেকে বের হলে তাঁর সহযোদ্ধা সাত্তার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। পরে রহমান ও তিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আটক করে।

পাকিস্তানি সেনারা তখনই তাঁদের হত্যা না করে প্রথমে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর রংপুর ক্যান্টনমেন্টে পাঠায়। ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে রংপুর উপশহরের এক পুকুরপাড়ে তাঁদের দুজনসহ অনেককে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে। এর আগে তাঁদের ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন।

আবদুল মান্নানের পিঠে ও হাতে গুলি লাগে। পিঠের গুলি বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। এরপর তিনি মড়ার মতো পড়ে থাকেন। তাঁর সহযোদ্ধা রহমানসহ সবাই ঘটনাস্থলেই মারা যান। পাকিস্তানি সেনারা চলে গেলে রাতে তিনি কোনো রকমে পাশের পাইলছড়া গ্রামে যান।

ওই গ্রামের রুস্তম আলী নামের এক মাওলানা স্থানীয়ভাবে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁকে গ্রামেই লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু এখানকার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হননি। তাঁর ক্ষতস্থানে পচন ধরে। হাঁটাচলা করার মতো শক্তিও ছিল না তাঁর। দুই মাস পর গ্রামের লোকজন তাঁকে ভারতের তরঙ্গপুর ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে গাড়িতে করে তেঁতুলিয়ায় পাঠালে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা সবাই মনে করেছিলেন, তিনি বেঁচে নেই।

সহযোদ্ধারা তাঁকে তেঁতুলিয়া হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তিন দিন চিকিৎসার পর তাঁকে ভারতের কল্যাণী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে বাগডোগরা সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে ভারতের লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এই হাসপাতালে থাকাবস্থায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার খবর পান তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মালিক, বীর প্রতীক

গ্রাম নগর, উপজেলা গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বাবা মোয়াজির আলী, মা হারী বিবি। স্ত্রী রেহেনা সিকদার। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২১। গেজেটে নাম আবদুল মালেক।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও চলাচল সীমিত রাখার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও রাতে মুজিবনগর এলাকায় আসত। তারা সারা রাত গোপনে কোনো স্থানে অবস্থান করত। কোনো কোনো দিন টহলও দিত।

আবদুল মালিক (আবদুল মালেক) ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রায়ই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতেন। তখন তাঁরা পাকিস্তানিদের আক্রমণ করতেন। আবার কোনো দিন তাঁরা ফাঁদ পাততেন। পাকিস্তানিদের বাগে পেলে অতর্কিতে আক্রমণ চালাতেন। এভাবে তাঁরা কয়েকবার গেরিলা অপারেশন করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা পাকিস্তানিদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি করেন।

২৫ নভেম্বর দুই পক্ষে তুমুল সম্মুখযুদ্ধ হয়। গোলাগুলিতে শান্ত এলাকা নিমেষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দলটি সেনা আর রাজাকার সমন্বয়ে মিশ্রিত দল ছিল। বেশ বড়। আবদুল মালিকসহ মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সীমান্ত থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী গোলাবর্ষণের মাধ্যমে তাঁদের সহযোগিতা করে।

প্রায় তিন ঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধ হয়। এরপর পাকিস্তানিরা পিছু হটে যায়। তবে দূর থেকে দুই পক্ষে পাল্টাপাল্টি গুলি অব্যাহত থাকে। আকস্মিক এ যুদ্ধে পাকিস্তানিদের দু-তিনজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। তিনজন সেনা ও আটজন রাজাকারকে মুক্তিযোদ্ধারা আটক করতে সক্ষম হন। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন।

সম্মুখযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবদুল মালিকসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আটক পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের সীমান্তের ওপারে নিয়ে যান। দূরে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে। তখন আবদুল মালিক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তাঁর পেটে গুলি লাগে।

মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত মুজিবনগর (১৯৭১ সালের আগে বৈদ্যনাথতলা, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর নামকরণ করা হয়)। এর অবস্থান জেলা সদরের দক্ষিণে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন।

আবদুল মালিক চাকরি করতেন ইপিআরের সিগন্যালসে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকার পিলখানা সদর দপ্তরে। ২৫ মার্চ রাতে আক্রান্ত হওয়ার পর আরও সাতজনের সঙ্গে কৌশলে পালাতে সক্ষম হন। এরপর যশোর হয়ে ভারতে যান। তাঁকে মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আবদুল মালিক পরে ৮ নম্বর সেক্টরের লালবাজার সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। অনেক যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। এর মধ্যে রতনপুর, বাগোয়ান বাগান, শিমুলতলার যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

২০ জুলাই তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মুজিবনগরে টহলরত ছিলেন। দুপুরে তাঁরা খবর পান, মুজিবনগরের কাছে বাগোয়ান বাগানে পাকিস্তানি সেনার একটি দল ঘোরাঘুরি করছে। তাঁরা দ্রুত সেখানে গিয়ে পাকিস্তানিদের আক্রমণ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। দুজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মালেক, বীর প্রতীক

রানীনগর, ঘোড়ামারা, সদর, রাজশাহী।
বাবা আবেদ আলী, মা ফেলি বেগম। স্ত্রী আম্বিয়া বেগম। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯৯।
মৃত্যু ২০১১।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিলেন পাইকপাড়ায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট মহাসড়কের পাশে পাইকপাড়া। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত।

বি দল নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিয়েছে—এ খবর পাওয়ার পর বাকি মুক্তিযোদ্ধারা হরষপুর-সরাইল হয়ে রওনা হন চান্দুরা অভিমুখে। তিনটি দল—এ, সি এবং ডি কোম্পানি। তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকল। ডি দলে আছেন আবদুল মালেক। তাঁদের বাঁ দিকে এ এবং সি দল।

যুদ্ধের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডি দল অগ্রসর হচ্ছে অন্য দুই দলের পেছনে। একদম সামনে সি দল। তাদের ওপর দায়িত্ব কৌশলে শাহবাজপুর সেতুর দখল নেওয়া।

এই অভিযানে বিকেলে এস ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহও (বীর উত্তম, পরে সেনাপ্রধান ও মেজর জেনারেল) মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁর অবস্থান ডি দলের কিছুটা সামনে। তাঁর ও ডি দলের মধ্যে ব্যবধান অল্প।

ডি দলের মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকলেন দৃপ্ত পদভারে। তাঁদের সামনে কে এম সফিউল্লাহ। কোথাও তাঁরা বাধা পাননি। বিকেলের দিকে তাঁরা পৌঁছে গেলেন ইসলামপুরের কাছে। অদূরে চান্দুরা। এ সময় সেখানে আকস্মিকভাবে হাজির হলো একদল পাকিস্তানি সেনা। হঠাৎ তাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

পাকিস্তানি সেনাদের এই উপস্থিতি ছিল একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত। আবদুল মালেকসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভেবে পাচ্ছিলেন না, এটা কীভাবে ঘটল। কেননা, তাঁদের পেছনে বি দল। তাদের ওপর দায়িত্ব অগ্রসরমাণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কে এম সফিউল্লাহ পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গোলাগুলি শুরু করল।

নিমেষে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। আবদুল মালেক ও তাঁর সহযোদ্ধারা পড়ে গেলেন উভয় সংকটে। একদিকে কে এম সফিউল্লাহ পাকিস্তানি সেনাদের আওতায়, অন্যদিকে তাঁরা ক্রসফায়ারের মধ্যে। আকস্মিকভাবে শুরু হওয়া যুদ্ধে ক্রসফায়ারে পড়ে আহত হয়েছেন তাঁদের অধিনায়ক এ এস এম নাসিমসহ কয়েকজন।

আবদুল মালেক বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হলেন তাঁর অন্য সহযোদ্ধারাও। এই যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন।

আবদুল মালেক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনর্গঠিত হয়ে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে তিনি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মালেক পাটোয়ারী

বীর প্রতীক

গ্রাম হাটপুকুরিয়া, ইউনিয়ন উত্তর পয়েলগাছা, বরুড়া, কুমিল্লা। বাবা মো. ফজর আলী পাটোয়ারী, মা কদরুন নেছা। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫৯। গেজেটে নাম আবদুল মালেক। শহীদ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১।

আবদুল মালেক পাটোয়ারীসহ মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক দিন ধরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। থেমে থেমে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

মুক্তিযোদ্ধারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের প্রতিরোধ করছে। মরিয়া তাদের মনোভাব। তিন-চার দিন ধরে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত আছে। মুক্তিযোদ্ধারা দুই-এক ঘণ্টা পর পর ঝোড়োগতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। আবার কখনো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করে। আবদুল মালেকসহ মুক্তিযোদ্ধারা এমন আক্রমণের জন্য সতর্কই ছিলেন। বিপুল বিক্রমে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। তখন দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হন। কিন্তু শহীদ হন আবদুল মালেকসহ কয়েকজন।

আবদুল মালেক নিজের অবস্থানে থেকে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ চলাবস্থায় একপর্যায়ে হঠাৎ তিনি গুলিবিদ্ধ হন। একঝাঁক গুলির কয়েকটি তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত হয়ে নিজের পরিখাতেই (ট্রেঞ্চ) ঢলে পড়েন তিনি। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করার আগেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বরে সাতক্ষীরা জেলার ভোমরায়। এর অবস্থান জেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত সীমান্তে। সড়কপথে ভোমরা খুলনা ও যশোরের সঙ্গে সংযুক্ত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৮ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনীর সহায়তায় সীমান্ত এলাকা থেকে চূড়ান্ত অভিযান শুরু করেন। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। যশোরে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের বেশির ভাগ খুলনা ও সাতক্ষীরায় পালিয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থান নেয়।

ভোমরা হয়ে খুলনা ও যশোর অভিমুখে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে আগে থেকেই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করেছিল। যশোর থেকে পালিয়ে যাওয়া সেনারা যোগ হওয়ায় তাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ভোমরায় দুই পক্ষ (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে ঘটিত যৌথ বাহিনী) ১১ ডিসেম্বর মুখোমুখি হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রতি ইঞ্চি ভূমি দখল রাখার জন্য সেখানে মরিয়া হয়ে লড়াই করে চলে। ফলে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর পক্ষে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোমরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আবদুল মালেক পাটোয়ারী চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন যশোর সেক্টরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ৮ নম্বর সেক্টরের ভোমরা সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস, দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মুকিত, বীর প্রতীক

২৭ নন্দনকানন, চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা ফ্ল্যাট-৫০৩, বাড়ি-১বি, সড়ক-৭৯, গুলশান-২, ঢাকা। বাবা আবদুল ওয়াদুদ, মা শামছুন নাহার। স্ত্রী নাজমা মুকিত। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩০৬।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনটি বিমান নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং। বিমানযোদ্ধারা মাত্র এক মাসের প্রস্তুতিতেই যুদ্ধযাত্রার জন্য তৈরি হন।

মুক্তিবাহিনীর তিনটি বিমানের একটি ছিল ডিসি-৩ বা ডাকোটা বিমান, দ্বিতীয়টি অটার বিমান, তৃতীয়টি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার। প্রতিটির জন্য তিনজন করে মনোনীত হন। আবদুল মুকিত, আবদুল খালেক ও আবদুস সাত্তারকে নির্বাচন করা হয় ডাকোটার জন্য।

সিদ্ধান্ত হয় যে আবদুল মুকিতরা ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে আক্রমণ চালাবেন। তারিখ নির্ধারিত হয় ২৮ নভেম্বর। পরে সেই তারিখ পিছিয়ে ৩ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়।

সবকিছু ঠিকঠাক। নভেম্বরের শেষে হঠাৎ তাঁদের অভিযান বাতিল করা হয়। ডাকোটা বিমানে অকটেন ১০০ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে ইঞ্জিনের পেছন দিয়ে যে ধোঁয়া বের হয়, তাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। রাতের বেলায় অনেক দূর থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। এ জন্য বিমানটি শত্রুর সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে, তাই সেটি দিয়ে সামরিক অভিযান বাতিল করা হয়।

প্রশিক্ষণ নিয়ে আবদুল মুকিত ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা অধীর অপেক্ষায় ছিলেন অভিযানে যাওয়ার জন্য। ঢাকায় দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনার জন্য আবদুল মুকিত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। প্রায় 'নিশ্চিত মৃত্যুর' এই অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ অভিযান তিনি পরিচালনা করতে পারেননি।

পরে ডাকোটা মুক্তিবাহিনীর পরিবহন বিমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুর্গম ঘাঁটিতে চলাচল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের কাজে সেটি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী (পরে জেনারেল) ও উপপ্রধান এ কে খন্দকার (বীর উত্তম, এয়ার ভাইস মার্শাল, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান, বর্তমানে মন্ত্রী) ওই বিমানে আলাদাভাবে কয়েকবার বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ফ্লাইট পরিচালনা করেন।

আবদুল মুকিত ১৯৭১ সালে পিআইএতে (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস) কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ চলাকালে অবতরণের সময় একবার তাঁর বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে তিনি আহত হন। সুস্থ হয়ে অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ সফলতার সঙ্গে শেষ করেন। কিন্তু তাঁকে যুদ্ধবিমান চালনার দায়িত্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়। তখন তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। পরে পিআইএতে যোগ দেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চট্টগ্রামে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। জুন মাসের মাঝামাঝি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় যান। সেখানে মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট নানা ধরনের সাংগঠনিক কাজে সম্পৃক্ত হন। পরে তিনি বিমান উইংয়ে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল লতিফ, বীর প্রতীক

গ্রাম মহেষপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা লিল মিয়া, মা গোলাপী খাতুন। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯২। শহীদ ২৩ অক্টোবর ১৯৭১।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা জেলার সীমান্তরেখায় সালদা নদী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। অদূরেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সালদা নদীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্থায়ী কোনো ঘাঁটি ছিল না। নদীর পূর্ব পার মন্দভাগ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। নদীর অপর পার মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে না থাকলেও তা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কাছাকাছি চাঁদলা গ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। মাঝেমধ্যেই তারা সেখান থেকে সালদা নদীর পাড়ে আসত। অস্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নজরদারির চেষ্টা করত। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতেন, যাতে তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান না করতে পারে। কারণ, সালদা নদী ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ পথ।

২১ বা ২২ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্টের একটি বড় দল সালদা নদীর অপর পাড়ে সমবেত হয়। তারা সেখানে বাংকার খনন করতে থাকে। এর কয়েক দিন আগে থেকেই তারা মন্দভাগ দখলের চেষ্টা করছিল। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক ধারণা করলেন, পাকিস্তানি সেনারা যেকোনো সময় মন্দভাগ আক্রমণ করতে পারে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন তা প্রতিহত করতে।

নির্দেশ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত প্রস্তুত হলেন। তাঁরা ছিলেন তিনটি দলে বিভক্ত। একটি দলে ছিলেন আবদুল লতিফ। ২৩ অক্টোবর রাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২৪ অক্টোবর) মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্ব দিকে পাহাড়ি এলাকায়, একটি দল সালদা নদী ও গুদামঘরের পশ্চিমে নদী অতিক্রম করে এবং অপর দল পাকিস্তানি সেনাদের পেছনে অবস্থান নেয়। তারপর তিন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সাঁড়াশি আক্রমণ করেন। তখন সেখানে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আবদুল লতিফ ছিলেন নদী অতিক্রমকারী দলে। তাঁরা সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি বাংকার ধ্বংস করেন। এরপর তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলেন সামনে। তখন হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গুলিতে তিনি শহীদ হন।

আবদুল লতিফ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। তখন তাঁর রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। মার্চ মাসে এই রেজিমেন্টের বেশির ভাগ সদস্য সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখান থেকে পালিয়ে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের মন্দভাগ ও সালদা নদী সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল লতিফ মজুমদার, বীর প্রতীক

গ্রাম জিরাইল, ইউনিয়ন দুর্গাপাশা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
বাবা তোলফে আলী মজুমদার, মা সখিনা বেগম।
স্ত্রী নূরজাহান বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৪। গেজেটে নাম আবদুল লতিফ।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। প্রায় দেড় মাস ধরে যুদ্ধ-উন্মাদনার মধ্যে আছেন আবদুল লতিফ মজুমদার ও তাঁর সহযোদ্ধারা। অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে বৃহত্তর সিলেট জেলার বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক যুদ্ধ করেছেন। তার পরও তাঁদের যুদ্ধ করার আগ্রহে ভাটা পড়েনি, বরং আরও বেড়েছে।

কানাইঘাট থেকে তাঁরা রওনা হন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সিলেট শহরের প্রতিরক্ষা অবস্থান অভিমুখে। ১৪ ডিসেম্বর শেষ রাতে সেখানে পৌঁছালেন। একটু পরে সকাল হলো। শীতকাল। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খালি চোখেই পাকিস্তানি সেনাদের তৎপরতা তাঁদের চোখে পড়ে। আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ চালালেন।

১৯৭১ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে আবদুল লতিফের দলনেতা (কোম্পানি কমান্ডার) লে. এম এ কাইয়ুম চৌধুরীর (পরে মেজর) ১৯৭৩ সালের বয়ানে। তিনি বলেন: 'আমরা শত্রুঘাঁটির মধ্য দিয়ে অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট শুরু করি। কানাইঘাট থেকে বিকেলে সিলেট অভিমুখে যাত্রা শুরু করে পরদিন বিকেল পাঁচটার সময় আমরা কেওয়াচরা চা-বাগানে ডিফেন্স নিই। আমরা জানতাম, সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিরাট একটা দুর্গে পরিণত করেছে। রাতের বেলা একটা প্যাট্রোল দল পাঠানো হয়েছিল শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

'সকালবেলা আমি আমার কোম্পানি নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কতক্ষণ ডিফেন্সে থাকি। সেদিন সেখানে অবস্থান করার পর সন্ধ্যায় আমরা এমসি কলেজ অভিমুখে যাত্রা করি। পরদিন ভোর চারটার সময় এমসি কলেজের টিলার ওপর এসে আমরা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করছিলাম। শত্রু কিন্তু আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে একটুও সজাগ ছিল না। তারা ডিফেন্সের মধ্যে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছিল।

'যথেষ্ট পাঞ্জাবি সেনা একসঙ্গে দেখে নিজেকে আর দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। পজিশন না নিয়েই ছয়টা মেশিনগান দিয়ে তিন দিক থেকে ফায়ার শুরু করলাম। শত্রুর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। ১৭ ডিসেম্বর বেলা ১১টা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলে। তার পরই আসে আত্মসমর্পণের পালা। পাকিস্তানি সেনারা তাদের সমস্ত হাতিয়ার আমাদের কাছে সমর্পণ করে।'

আবদুল লতিফ মজুমদার চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। ৩০ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট তাদের আক্রমণ করে। এ সময় তাঁরা যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হাকিম, বীর প্রতীক

গ্রাম মোহাম্মদপুর, উপজেলা হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
বাবা ফয়েজউল্লাহ মোল্লা, মা অজুফা খাতুন।
স্ত্রী জোবেদা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে ও পাঁচ ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৫। মৃত্যু ১৯৯৪।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর সদর থেকে স্বল্প প্রশিক্ষিত গেরিলা যোদ্ধাদের যাঁদের বাড়ি যে এলাকায়, তাঁদের সে এলাকায় পাঠানো হতো। এরই ধারাবাহিকতায় ৩ নম্বর সেক্টর থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠানো হয় নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায়। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি দলে বিভক্ত। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল হাকিম। তাঁরা দুঃসাহসিক কিছু অপারেশন চালান।

১৯৭১ সালে কালিয়াকৈরের বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান। গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াকৈর উপজেলা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের অবস্থান ছিল পুরাতন থানা কমপ্লেক্সে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এর অবস্থান। তাদের সহযোগী ছিল একদল রাজাকার। ২২ অক্টোবর সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা এক অপারেশন পরিচালনা করেন। সেদিন রাত আনুমানিক ১০টায় আবদুল হাকিমসহ মুক্তিযোদ্ধারা চাপাইর ব্যাপারীপাড়া হাইস্কুল থেকে তুরাগ নদ অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনা দলের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালান। এতে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত হয়ে পড়ে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হকচকিত অবস্থা কাটিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

এরপর দুই পক্ষে ব্যাপক পাল্টাপাল্টি গুলির ঘটনা ঘটে। কয়েক ঘণ্টা ধরে সেখানে যুদ্ধ চলে। আবদুল হাকিম ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা ব্যর্থ হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্রশস্ত্রে ও বিপুল রসদে সজ্জিত ছিল। তুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের রসদ ছিল কম।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি প্রায় শেষ হয়ে যায়। তখন পাকিস্তানিরা বেশ আধিপত্য বিস্তার করে। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানিদের পক্ষে চলে যায়। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। অবশেষে রাত চারটার দিকে তাঁরা পিছু হটে যান। তবে তাঁদের আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এবং রাজাকার দলের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা পরে খবর নিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের আক্রমণে পাঁচজন রাজাকার ও ছয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। আক্রমণের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড সঠিক নিশানায় পড়ে। বিস্ফোরণে দুটি বাংকার সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মাত্র দু-তিনজন আহত হন।

আবদুল হাকিম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশ ইউনিটে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে। পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। এপ্রিলে ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে তাঁকে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গাজীপুর জেলায় পাঠানো হয়। কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর এবং নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল হামিদ খান, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণ কবাই, ইউনিয়ন কবাই, উপজেলা বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। বাবা আরেফিন খান, মা আজিতুন নেছা। স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৯।

ভোররাতে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল একযোগে আক্রমণ করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে। একটি দলে আছেন আবদুল হামিদ খান। পাকিস্তানি সেনারাও বসে থাকল না। পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকল। সারা দিন যুদ্ধ চলল। আবদুল হামিদ খানসহ বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। যুদ্ধ চলতে থাকল। তিন দিন একটানা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেল। এ ঘটনা ঘটে হাতীবান্ধায় ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। হাতীবান্ধা লালমনিরহাট জেলার অন্তর্গত।

২৭ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালান। তখন পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। সারা দিন যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিকেলে গোলাগুলি বন্ধ করে দেন। এরপর পাকিস্তানি সেনারাও গোলাগুলি বন্ধ করে। সন্ধ্যার পর মুক্তিযোদ্ধারা আবার আকস্মিক আক্রমণ শুরু করেন। এতে পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও রাজাকাররা দিশাহারা হয়ে পড়ে। সাতটার পর থেকে যুদ্ধের গতি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকে। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের একদম কাছে চলে যান। তখন পাকিস্তানি আর্টিলারি ব্যাটারি মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগামী দলের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে।

আবদুল হামিদ খান এ সময় সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ব্যাপক গোলাবর্ষণে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হন। তখন তিনি সাহসের সঙ্গে তাঁর দলের সহযোদ্ধাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। তিন দিন যুদ্ধের পর হাতীবান্ধা মুক্ত হয়। হাতীবান্ধার যুদ্ধ ছিল খুবই ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ৩৫ থেকে ৩৬ জন শহীদ ও অনেকে আহত হন।

আবদুল হামিদ খান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর সেক্টরের ১০ নম্বর উইংয়ের (বর্তমান ব্যাটালিয়ন) অধীন চিলমারীতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের পাটগ্রাম ও মোগলহাট সাবসেক্টরে। মোগলহাট এলাকায় তিনি কয়েকবার অ্যামবুশ ও আকস্মিক আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একবার পাটেশ্বরীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করে তিনজন পাকিস্তানি সেনাকে জীবন্ত বন্দী করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সামাদ, বীর প্রতীক

বাড়ি ২১-বি, সড়ক ১০-এ, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা। বাবা এম এ শাকুর, মা সালিমা খাতুন। স্ত্রী শাহীন সামাদ। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৭। জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়ায়।

আবদুস সামাদ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুন মাসে ২ নম্বর সেক্টর থেকে ঢাকায় আসা ক্র্যাক প্লাটুনে যোগ দেন। কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। একটি অপারেশনে তিনি আহত হন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধারা দুঃসাহসী কয়েকটি অপারেশন চালান। এর মধ্যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (পরে শেরাটন, এখন রূপসী বাংলা) এবং ফার্মগেটে চালানো অপারেশনগুলো অন্যতম। তাঁরা দুবার ইন্টারকন্টিনেন্টালে অপারেশন চালান। প্রথমে জুনে, দ্বিতীয়বার ১১ আগস্ট। দ্বিতীয় অপারেশনের মূল নায়ক ছিলেন আবদুস সামাদ ও আবু বকর (পরে শহীদ ও মরণোত্তর বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত)।

এই অপারেশন করার জন্য আবদুস সামাদ ও আবু বকর সুযোগ খুঁজছিলেন। থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের একটা অফিস ছিল হোটেলের শপিং আর্কেডে। শপিং আর্কেডের কয়েকটি দোকানের নিয়নসাইন সামাদেরই করা। এ সূত্রে সামাদ খবর পান, ব্যবসায়িক মন্দার কারণে ওই অফিস হোটেলেরই ছোট এক কক্ষে স্থানান্তরিত হবে।

অন্য কেউ যাতে স্থানান্তরের কাজটা না নিতে না পারে, সে জন্য তিনি খুব কম দরে কাজটা নেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হোটেলে কয়েক দিন রেকি করেন। ১১ আগস্ট তাঁর কাজ শেষ হওয়ার কথা। ওই দিন সকালে তাঁদের এক সহযোদ্ধা বায়তুল মোকাররম মার্কেট থেকে একটি ব্রিফকেস কিনে আনেন। এর ভেতরে তাঁরা সাজিয়ে রাখেন ২৮ পাউন্ড পিকে ও ৫৫ মিনিট মেয়াদি টাইম বোমা। তারপর বিকেলে গাড়িতে চেপে রওনা হন আবদুস সামাদ, আবু বকর, মায়া (মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম) ও গাজী (গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক)। হোটেলের গাড়ি পার্কিংয়ে পৌঁছে আবদুস সামাদ ও বকর হোটেলের ভেতরে ঢোকেন। বাকি দুজন গাড়িতে স্টেনগান নিয়ে বসে থাকেন।

আবদুস সামাদ ও আবু বকর হোটেল লাউঞ্জে মূল দরজা দিয়ে না ঢুকে 'সুইস এয়ারের' অফিস কক্ষের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। এ ব্যাপারে সহায়তা করেন ওই অফিসেরই একজন বাঙালি কর্মী। ব্রিফকেসসহ দুজন সরাসরি প্রসাধনকক্ষে যান। আবদুস সামাদ বাইরে থাকেন কাভার হিসেবে। আর বকর একেবারে কোনার কক্ষে ঢুকে দরজা আটকে টাইম বোমা চালু করে ব্রিফকেস রাখেন কমোডের পেছনে। তারপর দরজা ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেই দেয়াল টপকে বেরিয়ে আসেন। এরপর দুজন সোজা চলে যান অপেক্ষমাণ গাড়ির কাছে। গাড়িতে ওঠামাত্র দ্রুত সেটি বেরিয়ে যায়।

ঠিক ৫৫ মিনিট পরই ঘটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। দুই দিন পর বিশ্বের সংবাদপত্রে রোমাঞ্চকর এই অপারেশনের খবর প্রকাশিত হয় বেশ গুরুত্ব সহকারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সালাম, বীর প্রতীক

গ্রাম ধুপাইল, উপজেলা লালপুর, নাটোর।
বাবা খন্দকার আবুল কাশেম, মা ফাতেমা বেগম।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৭। শহীদ ১৯৭১।

আবদুস সালাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নবীন সৈনিক ছিলেন। চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৭০ সালের শেষে যোগ দেন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। কয়েক মাস পর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তখন তিনি যুদ্ধে যোগ দেন।

প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে আবদুস সালাম প্রথমে যুদ্ধ করেন চট্টগ্রাম জেলার কালুরঘাটে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১১ এপ্রিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কালুরঘাটের পতন হলে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে অবস্থান নেন পটিয়ায়। এরপর সবাই বান্দরবান হয়ে রাঙামাটি যান। পরে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন মহালছড়িতে।

এই মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল)। তিনি মহালছড়িতে হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি দলে ভাগ করেন। প্রথম দল অবস্থান নেয় রাঙ্গামাটিতে। দ্বিতীয় দল বুড়িঘাটে, তৃতীয় দল রাঙামাটি বরকলের মধ্যবর্তী স্থানে এবং চতুর্থ দল কুতুবছড়ি এলাকায়।

আবদুস সালাম ছিলেন চতুর্থ দলে। এর দলনেতা ছিলেন সুবেদার মুত্তালিব। ১৮ এপ্রিল তাঁরা কুতুবছড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অ্যামবুশ করেন। এই অ্যামবুশে তাঁদের হাতে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

২৭ এপ্রিল মহালছড়ির পতন হলে মীর শওকত আলীর নেতৃত্বাধীন বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন রামগড়ে। এ সময় আবদুস সালামের দল হেঁয়াকোতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রামগড় রক্ষায় হেঁয়াকো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

২৯ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হেঁয়াকোতে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকেন। যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ৩০ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই হয়। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই করেও ব্যর্থ হন। সেদিন বিকেলেই হেঁয়াকোর নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানি সেনাদের হাতে চলে যায়।

এরপর আবদুস সালামসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে চলে যান। সেখানে পুনর্গঠিত হওয়ার পর জুলাই মাস থেকে তাঁরা যুদ্ধ করেন ৫ নম্বর সেক্টরে। এই সেক্টরে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর আবদুস সালাম এক যুদ্ধে শহীদ হন। কোন যুদ্ধে বা কত তারিখে তিনি শহীদ হয়েছেন, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু তাহের, বীর প্রতীক

গ্রাম বড় হলদিয়া, উপজেলা মতলব, চাঁদপুর।
বাবা গোলাম আহমেদ সিকদার, মা আমেনা বেগম।
স্ত্রী ফাতেমা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৪। মৃত্যু ২০০৮।

কুমিল্লা শহর ছিল ২ নম্বর সেক্টরের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। যোগাযোগের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিমানঘাঁটি, ময়নামতি সেনানিবাস এবং এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মুক্তিযুদ্ধকালে কৌশলগত দিক দিয়ে কুমিল্লার তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। যৌথ বাহিনীর দাউদকান্দি ও চাঁদপুরমুখী যেকোনো অভিযান পরিচালনার জন্য কুমিল্লাই ছিল একমাত্র পথ।

আবু তাহেররা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ৩ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের চিওড়া পৌঁছান। চিওড়া বাজারের উত্তর দিকে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি প্রতিরক্ষা। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে কোনো রকম প্রতিরোধ দূরের কথা, পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ৫ ডিসেম্বর প্রায় নির্বিঘ্নেই কুমিল্লা শহরের পূর্ব পাশে বালুতুফা পৌঁছান। পথে তাঁদের কোথাও তেমন যুদ্ধে জড়াতে হয়নি।

বালুতুফার অদূরেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা। পাকা বাংকারে পাকিস্তানি সেনারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অবস্থান করছিল। বাংকারগুলো ছিল ট্যাংকের গোলা প্রতিরোধে সক্ষম। সেখানে ছিল পাকিস্তানিদের তিন সারির প্রতিরক্ষা লাইন। সব মিলে দুর্ভেদ্য এক প্রতিরক্ষা। আবু তাহেররা মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় সেখানে আক্রমণ চালান। বিপুল বিক্রমে তাঁরা যুদ্ধ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে উচ্ছেদে তাঁরা ব্যর্থ হন।

যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মিত্রবাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে মাটি কামড়ে অবস্থান ধরে রাখে। পাকিস্তানিদের তুলনায় মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি ছিল অনেক কম। এত কম শক্তি নিয়ে সম্মুখযুদ্ধ করে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা ছিল বেশ দুরূহ।

এ অবস্থায় আবু তাহেরের অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নেন প্যাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ না করে তাদের পেছন দিয়ে কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হওয়ার। ৬ ডিসেম্বর আবু তাহেরসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রায় বোকা বানিয়ে এবং কোনো যুদ্ধ না করেই কুমিল্লা শহরে ঢুকে পড়েন। বালুতুফায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগামী দল কুমিল্লা বিমানবন্দরের দিকে অগ্রসর হয়।

এ দলে আবু তাহেরও ছিলেন। মিত্রবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁরা কুমিল্লা বিমানবন্দরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। তখন সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। তুমুল যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে আবু তাহের যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

আবু তাহের চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। পদবি ছিল হাবিলদার। ২৫ মার্চ তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মোতায়েন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি তেলিয়াপাড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, দাউদকান্দিসহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু তাহের মো. সালাহউদ্দীন

বীর প্রতীক

গ্রাম মসজিদা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা ফ্ল্যাট ২০৩, বাড়ি ১৫, সড়ক ১, চট্টগ্রাম। বাবা জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, মা আনোয়ারা বেগম। স্ত্রী দিলরুবা সালাহউদ্দীন। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০২।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ভোমরা সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত। সীমান্তরেখা বরাবর আছে একটি বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সাতক্ষীরা ও যশোর এলাকার কয়েক স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে একদল মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের মো. সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে ভোমরায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

২৮ মে শেষ রাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২৯ মে) প্রায় দুই কোম্পানি পাকিস্তানি সেনা মুক্তিবাহিনীর ভোমরা বাঁধের অবস্থানে আক্রমণ করে।

আবু তাহের মো. সালাহউদ্দীন সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রস্তুতই থাকতেন। পাকিস্তানি সেনাদের উপস্থিতি তিনি সঙ্গে সঙ্গে টের পান। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। এরপর দুই পক্ষে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তুলনায় তাঁরা ছিলেন প্রায় অর্ধেক। এতে সালাহউদ্দীন ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিচলিত হননি। তাঁরা অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনারা পিছিয়ে যায়।

কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুনরায় সংগঠিত হয়ে আবার আক্রমণ করে। এর মধ্যে নতুন কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা সেখানে আসে। তাতে পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সালাহউদ্দীন এবারও সহযোদ্ধাদের নিয়ে সফলতার সঙ্গে আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকজন সহযোদ্ধা বাঁধের ওপর থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গেরিলা কায়দায় সুইপিং গোলাগুলি শুরু করেন। এতে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টারত বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

২৯ মে থেমে থেমে সারা দিন যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একের পর এক আক্রমণ চালিয়েও আবু তাহের মো. সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দলকে বাঁধ থেকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। সারা দিনের এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ অনেকে নিহত এবং ব্যাটালিয়ন অধিনায়কসহ অসংখ্য ব্যক্তি আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে একজন শহীদ ও আট-নয়জন আহত হন। নিহত পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ পাকিস্তানি সেনারা উদ্ধার করতে পারেনি। মৃতদেহটি সালাহউদ্দীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেন।

আবু তাহের মো. সালাহউদ্দীন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে উপ-অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ২০৪ ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে। এর অবস্থান ছিল ঢাকা সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কয়েক দিন পর ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রতিরোধযুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর তিনি প্রথমে ৮ নম্বর সেক্টরের ভোমরা এলাকায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতৃত্ব দেন। পরে মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ পেলে ৫ নম্বর সেক্টরের বালাট সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

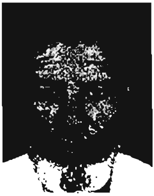

আবু মুসলিম, বীর প্রতীক

গ্রাম জারেরা, মুরাদনগর, কুমিল্লা। বাবা তালেব আলী সরদার, মা পেশকারের নেছা। স্ত্রী ফরিদা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৫১।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের প্রথমার্ধের একদিন। রাতে আবু মুসলিমসহ ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে রওনা হন লক্ষ্যস্থলে। তাঁদের দলনেতা মাহবুব রব সাদী (বীর প্রতীক)। তাঁদের সঙ্গে আছেন একজন পথপ্রদর্শক। তিনি সবার আগে। তারপর দলনেতা। তাঁর পেছনে মুক্তিযোদ্ধারা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যান।

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বলতে দু-তিনটি এলএমজি, বাকি সব স্টেনগান। তাঁরা কানাইঘাট থানা আক্রমণ করবেন। মৌলভীবাজার জেলার একদম উত্তরে এর অবস্থান। সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ থানা থেকে একটি পাকা সড়ক কানাইঘাট পর্যন্ত গিয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমানায় মিশেছে। থানায় তখন ছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ এবং কয়েকজন পুলিশ সদস্য। সব মিলিয়ে ৪৫ থেকে ৫০ জন।

চা-বাগানের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় আবু মুসলিমসহ মুক্তিযোদ্ধারা নিঃশব্দে পৌঁছান কানাইঘাটে। পাশেই সুরমা নদী। নদীতে পানিপ্রবাহের হালকা কুলকুল শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চারদিক সুনসান। ছোট্ট শহরের সবাই, এমনকি থানায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও পুলিশ সদস্যরাও ঘুমিয়ে। কেবল দু-তিনজন পুলিশ সদস্য পাহারায়।

যারা পাহারায় নিযুক্ত, প্রথমে তাদের বন্দী ও নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নেন দলনেতা সাদী। তিনি নিজেই একজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তা করতে যান। পাহারারত এক পুলিশ হঠাৎ গুলি ছোড়ে। এর শব্দে পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও পুলিশ সদস্যরা ঘুম থেকে জেগে গোলাগুলি শুরু করে।

আবু মুসলিম ও তাঁর সহযোদ্ধারা দলনেতার সংকেত বা নির্দেশের অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। নিমেষে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। তাঁদের আক্রমণে প্রথমেই নিহত হয় পাহারারত দুই পুলিশ সদস্য। এরপর আবু মুসলিম ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা গুলি করতে করতে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়েন থানার ভেতরে। তাঁদের আক্রমণে হতাহত হয় কয়েকজন পুলিশ।

আবু মুসলিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সাহস ও রণমূর্তি দেখে পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও পুলিশ সদস্যরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা প্রতিরোধ করা দূরে থাক, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে থানার পেছন দিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনা ও ইপিসিএএফের তিন সদস্যকে আটক করেন। পরে জীবিত অবস্থায় তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আবু মুসলিম ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের শেষে ভারতে যান। মে মাসে আসামের গোয়াহাটিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরে, পরে ২ নম্বর সেক্টরে। ২ নম্বর সেক্টরে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল বশার, বীর প্রতীক

গ্রাম চন্দ্রদিঘলিয়া, সদর উপজেলা, গোপালগঞ্জ। বাবা আবদুর রাজ্জাক, মা আঞ্জুমান নেছা। স্ত্রী সাহেদা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৭। গেজেটে নাম আবুল বাশার। মৃত্যু ২০০০।

জঙ্গলের ভেতরে আবুল বশাররা বিশ্রামে। তবে সতর্ক অবস্থায়। কেউ ঘুমিয়ে, কেউ জেগে। সবাই একসঙ্গে ঘুমাননি। পালা করে ঘুমাচ্ছেন। ভোর হয় হয়। এ সময় আবুল বশারদের অবস্থানে আকস্মিক আক্রমণ চালায় একদল পাকিস্তানি সেনা। শান্ত এলাকা হঠাৎ তীব্র গোলাগুলিতে প্রকম্পিত। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা হকচকিত। তবে দ্রুত তাঁরা নিজেদের সামলিয়ে নেন। যে যেভাবে পারেন, পাকিস্তানি আক্রমণ মোকাবিলা শুরু করেন।

আক্রমণকারী পাকিস্তানি সেনারা ছিল বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য। জীবনের মায়া তাদের ছিল না। মরিয়া মনোভাব নিয়ে তারা আক্রমণ করে। এ রকম অবস্থায় সম্মুখযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। আবুল বশারসহ মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্তু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পাকিস্তানিদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ব্যর্থ হন। ফলে তাঁরা চরম নাজুক অবস্থায় পড়েন।

শহীদ ও আহত হন আবুল বাশারের কয়েকজন সহযোদ্ধা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান (মরণোত্তর বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত) শহীদ হন। পরবর্তী অধিনায়কও (লিয়াকত আলী খান বীর উত্তম) গুরুতর আহত হন। এতে বশার দমে যাননি। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে তিনিও গুরুতর আহত হন।

পরে লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসানের (বীর প্রতীক, পরে মেজর) নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দল এসে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালায়। যুদ্ধের গতি ক্রমশ মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তে আসে। পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে হটে তাদের মূল অবস্থানে ফিরে যায়। সিলেট জেলার কানাইঘাটের গৌরীপুরে এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে সিলেট অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। তাঁরা প্রথমে চারগ্রাম দখল করেন। এরপর জকিগঞ্জ দখল করে কানাইঘাট দখলের জন্য ২৩-২৪ নভেম্বর গৌরীপুরে সমবেত হন। এর দুই মাইল দূরে কানাইঘাট ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা।

২৬ নভেম্বর ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী (৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট) তাদের মূল ডিফেন্সিভ পজিশন ছেড়ে পূর্ণ শক্তিতে হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। এতে নাজুক অবস্থায় পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানিতে ছিলেন আবুল বশার।

আবুল বশার চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাশেম, বীর প্রতীক

গ্রাম শাহবাজপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। বাবা সুরুজ মিয়া, মা রূপভানেছা। স্ত্রী লাইলি বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩০।

মুখোমুখি মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। মধ্যরাতে শুরু হলো প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় এক কোম্পানির মতো। ৯ নম্বর প্লাটুনে আছেন আবুল হাশেম। তাঁর দলনেতা সুবেদার আশরাফ আলী খান (বীর বিক্রম)। পাকিস্তানি সেনাদের প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তাঁরা ভোরবেলা দখল করলেন বিরাট এক এলাকা। পরদিন রাতে সেখানে আবার শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিতে পাল্টা আক্রমণ করে বসে। এ ঘটনা ঘটেছিল আজমপুরে ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বরের শেষ রাতে।

নভেম্বরের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র শুরু হয়ে যায় সর্বাত্মক যুদ্ধ। সীমান্ত এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল সমবেত হয় আখাউড়ার চারদিকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত আখাউড়া ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। রেলওয়ে জংশন। আখাউড়ার পার্শ্ববর্তী আজমপুরে অবস্থান নেয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানি।

আজমপুর রেলস্টেশনে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা ৩০ নভেম্বর মধ্যরাতে সেখানে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা সব বাধা বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করে আজমপুর রেলস্টেশন ও আশপাশের এলাকা ভোর হওয়ার আগেই দখল করে নেন। পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে যায়।

১ ডিসেম্বর শেষ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ নাজুক অবস্থার শিকার হন। আবুল হাশেমসহ তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও দখল করা এলাকা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে তাঁর প্লাটুন কমান্ডার শহীদ হলে তাঁদের প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন আবুল হাশেম সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে প্লাটুনের হাল ধরেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ এত প্রচণ্ড ছিল যে তাঁরা কৌশলগত কারণে পিছু হটে যান। পরদিন মুক্তিযোদ্ধারা আরও কয়েকটি দলের সম্মিলিত শক্তিতে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে চূড়ান্তভাবে আজমপুর রেলস্টেশন এলাকা পুনর্দখল করে নেন।

আবুল হাশেম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। ফেব্রুয়ারি মাসে ছুটিতে বাড়িতে এসে তিনি আর চাকরিতে যোগ দেননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। এ পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অপারেশন কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস। পরে যুদ্ধ করেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাশেম খান, বীর প্রতীক

গ্রাম সৈয়দাবাদ, উপজেলা কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা বাদশা মিয়া। মা আমেনা খাতুন।
স্ত্রী রাজিয়া বেগম। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৯।
গেজেটে নাম আবুল হাশেম। মৃত্যু ১৯৮৬।

মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। মধ্যরাতে তাঁরা সমবেত হন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সালদা নদী প্রতিরক্ষার তিন দিকে। আবুল হাশেম খান একটি দলের (কোম্পানি) উপদলের (প্লাটুন) নেতৃত্বে।

চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার ডাক। একটু পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে শুরু হয় গোলাবর্ষণ। গোলা আসে পেছন থেকে। মুক্তিযোদ্ধাদের গোলন্দাজ দল (মুজিব ব্যাটারি) কামানের গোলাবর্ষণ করে। ভারতীয় গোলন্দাজ দলও সীমান্ত এলাকা থেকে দূরপাল্লার গোলাবর্ষণ করে। শত শত গোলা এসে পড়ে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষায়।

গোলাবর্ষণের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা এমন যে অনেক দূরে থাকা আবুল হাশেম খানদের সবার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে ওঠে। বিকট শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। এত বড় প্রথাগত (কনভেনশনাল) আক্রমণ এর আগে সালদা নদীতে হয়নি। ব্যাপক গোলাবর্ষণে পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা প্রায় তছনছ ও বেশির ভাগ বাংকার ধ্বংস হয়ে যায়। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা।

AMARBOI.COM

গোলাবর্ষণ শেষ হলে আবুল হাশেম খান সহযোদ্ধাদের নিয়ে আবার এগিয়ে যান। তাঁদের লক্ষ্য সালদা নদী এলাকার নয়নপুর দখল করা। দ্রুত তাঁরা পৌঁছে যান লক্ষ্যস্থলের আনুমানিক ৪০০ গজ দূরে। ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। নিমেষে শুরু হয়ে যায় মেশিনগান, এলএমজি আর রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলি।

আবুল হাশেম খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। হতোদ্যম পাকিস্তানি সেনারা সকালে নয়নপুর থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় সালদা রেলস্টেশনে। কিন্তু একটু পর তাদের ওপর শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। পুনঃসংগঠিত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ ছিল বেশ জোরালো।

আবুল হাশেম খান সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর দলের অন্যান্য উপদলও আক্রমণ প্রতিহত করে। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ চলাবস্থায় একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন আবুল হাশেম খান। তাঁর পিঠে গুলি লাগে। এতে তিনি দমে যাননি। আহত অবস্থাতেই বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারেননি। অধিক রক্তক্ষরণে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

তখন সহযোদ্ধারা আবুল হাশেম খানকে ফিল্ড চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে পাঠানো হয় আগরতলায়। কিন্তু ক্রমে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়। এখানে তাঁর চিকিৎসা চলাকালে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

আবুল হাশেম খান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

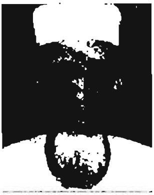

আবুল হাসেম, বীর প্রতীক

গ্রাম চর ফকিরা, ইউনিয়ন চাপরাশির হাট, উপজেলা কবিরহাট, নোয়াখালী। বাবা আলী আজম। স্ত্রী আরবের নেছা। তাঁদের পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৫। মৃত্যু ২০১১।

সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে আবুল হাসেম ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা তখন দিশেহারা। ঘণ্টা দেড়েক পর পাকিস্তানি সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সে সুযোগ দিলেন না। এ ঘটনা ঘটেছিল কানাইঘাটে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

কানাইঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত। কানাইঘাটে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী এই প্রতিরক্ষা অবস্থান দখলের দায়িত্ব ছিল নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর 'জেড' ফোর্সের ওপর। শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর সেই দায়িত্ব বর্তায়।

১ ডিসেম্বর ৪ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল একযোগে কানাইঘাটে অভিযান শুরু করে। একটি দল দরবস্ত-কানাইঘাট সড়কে আর অন্য দলটি কাট অফ পার্টি হিসেবে অবস্থান নেয় চরঘাট-কানাইঘাট সড়কে। ফলে দুই দিক থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাহায্য আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। দুটি দলই একযোগে আক্রমণ চালায়। মুক্তিবাহিনীর ওই দলে ছিলেন আবুল হাসেম।

২ ডিসেম্বর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা যে যার নির্দিষ্ট অবস্থানে চলে যান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের ওপর শুরু করে আর্টিলারির ব্যাপক গোলাবর্ষণ। বিরামহীন গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধারা সামনে এগিয়ে যান। সকাল হওয়ার আগেই তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। দেড় ঘণ্টা পর পাকিস্তানি সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের সে সুযোগ দেননি।

আনুমানিক সকাল সাতটা। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর্যুপরি আক্রমণ তখনো অব্যাহত। ১৫ মিনিট পর তাঁরা শত্রুপক্ষের ঘাঁটির ওপর সরাসরি আক্রমণ শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে অধিকাংশ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। বাদবাকি কিছু সৈন্য পালিয়ে সুরমা নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাদের শরীর। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই মুক্ত হয় কানাইঘাট। এই যুদ্ধে অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর ১১ জন শহীদ ও ২০ জন আহত হন। এই যুদ্ধে আবুল হাসেম অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম লোহাগড়া, উপজেলা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
বাবা আবু বকর, মা ফাতেমা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৬৩।
গেজেটে নাম আবুল হাশেম। শহীদ ২৮ আগস্ট ১৯৭১।

আবুল হোসেন (আবুল হাশেম) চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে ঢাকার পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টার্সে ঢাকা সেক্টরের অধীনে সিগন্যালম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পিলখানাতে ইপিআরের ১৩, ১৫, ১৬ উইং, হেডকোয়ার্টার্স উইং এবং সিগন্যাল উইংয়ের অবস্থান ছিল। সব মিলিয়ে প্রায় ২ হাজার ৫০০ ইপিআর সদস্য ছিলেন সেখানে। ২৫ মার্চ রাত ১২টায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট তাঁদের আক্রমণ করে। এতে অনেক ইপিআর সদস্য শহীদ হন। কিছু পালাতে সমর্থ হন। বাদবাকি সবাই বন্দী হন।

আবুল হোসেন পিলখানা থেকে পালাতে সমর্থ হন। এরপর তিনি বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে মুন্সিগঞ্জ হয়ে নিজ এলাকায় যান। সেখানে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর তিনি ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। পরে যুদ্ধ করেন নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে।

১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট হাসনাবাদে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক গেরিলাযুদ্ধে মো. আবুল হোসেন শহীদ হন। হাসনাবাদ চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত।

আবুল হোসেন একটি গেরিলাদলের সঙ্গে ছিলেন। এই দলের অবস্থান ছিল হাজীগঞ্জে। দলনেতা ছিলেন জহিরুল হক পাঠান। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন হাসনাবাদে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অ্যামবুশ করেন।

মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। একটি উপদলে ছিলেন আবুল হোসেন। ২৮ আগস্ট ভোরে তাঁরা হাসনাবাদ বাজারের কাছে গোপনে অবস্থান নেন।

সকাল নয়টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা তাদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পর তাঁরা মানুষের চিৎকার ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। তখন মুক্তিযোদ্ধারা সতর্ক হয়ে যান।

এর ৮-১০ মিনিটের মধ্যেই গুলি ছুড়তে ছুড়তে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ভেতর ঢুকে পড়ে। তাদের সঙ্গে ছিল অনেক রাজাকার। ৪০-৫০ গজের মধ্যে আসামাত্র গর্জে উঠল সব মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শুরু হলো প্রচণ্ড আক্রমণ।

মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশাহারা। তারা না পারছে পজিশন নিতে, না পারছে গুলি করতে। কারণ, তারা এসেছে নৌকায় করে। ১০-১২টি নৌকা। ৫-৭ মিনিট মুক্তিযোদ্ধারা একতরফা আক্রমণ চালালেন। নৌকায় শুধু চিৎকার ও কান্নার শব্দ।

এরপর পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। পাকিস্তানি সেনাদের দূরবর্তী অবস্থান থেকেও গোলা এসে সেখানে পড়তে থাকল। তারা খবর পেয়ে গোলাবর্ষণ করে।

মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। আবুল হোসেনও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হন। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার মিলে ৯-১০ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমির হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম নৈরাজপুর, ইউনিয়ন ফরহাদনগর, উপজেলা সদর, ফেনী। বর্তমান ঠিকানা কানাডা। বাবা দলিলুর রহমান, মা শরবত বিবি। স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯৭।

নিকষ অন্ধকার রাত। গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে পড়লেন আমির হোসেনসহ ১১ জন নৌ-কমান্ডো। তাঁরা গেলেন কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাড়ে জলদিয়া বাতিঘরে। নেমে পড়লেন সমুদ্রে। অদূরে ভাসমান অনেকগুলো জাহাজ। সেগুলোর কাছে যাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। ফলে তাঁদের সাঁতার কাটার বিরাম নেই। ওঠানামা করছে তাঁদের সবার পায়ের ফিনস। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কেটে গেল। নৌ-কমান্ডোরা মাথা তুললেন; দেখলেন, দূরত্ব এতটুকুও কমেনি। এর মধ্যে সমুদ্র আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। বাতাস বাড়ছে, তুঙ্গে উঠছে গর্জন। পাহাড়সমান উঁচু ঢেউ শোঁ শোঁ শব্দে গভীর সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন একে অন্যের কাছ থেকে। সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করছেন তীরে পৌঁছানোর। কিন্তু ব্যর্থ হলো তাঁদের সে চেষ্টা।

এ ঘটনা চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরে। নৌ-কমান্ডোদের দলনেতা ফারুক-ই-আজম (বীর প্রতীক) বহির্নোঙরে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তখন সেখানে অপেক্ষমাণ ছিল বেশ কয়েকটি জাহাজ। অপারেশনের জন্য স্থির হয় জোয়ার-ভাটার নির্দিষ্ট সময়। কিন্তু এ অভিযানের জন্য রেকিতে একটা বিরাট ভুল করে ফেলেন কমান্ডোরা। ভুলের ঘটনাটি ঘটে তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতেই। দূরত্বের সেই হিসাবই তাঁদের কাল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা আন্দাজ করেছিলেন, ওই দূরত্ব দেড়-দুই মাইলের বেশি হবে না। বাস্তবে সে দূরত্ব ছিল চার-পাঁচ গুণ বেশি।

AMARBOI.COM

আরেকটি ভুল তাঁরা করেন। ভাটার সময় টার্গেটের কাছে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল নৌকায় চেপে। কিন্তু নৌকা না পেয়ে তাঁরা সাঁতার কেটেই সেখান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত এক করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে ওই অপারেশন শেষ হয়। পানিতে হারিয়ে যাওয়ার পর তাঁরা জীবন্মৃত অবস্থায় তীরে পৌঁছান। আমির হোসেনসহ চারজন নদীর পশ্চিম মোহনায় মেরিন একাডেমি জেটির কাছে তীরে ভেসে ওঠেন অজ্ঞান অবস্থায়। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। জ্ঞান ফেরার পর পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ ও পাশবিক নির্যাতন করে। নির্মম নির্যাতনে একজন (মোহাম্মদ হোসেন, বীর প্রতীক) মারা যান। আমির হোসেনসহ তিনজন বেঁচে যান। পরে তাঁদের স্থানান্তর করা হয় ঢাকায়। ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁরা নির্মম নির্যাতনের শিকার হন।

আমির হোসেন ১৯৭১ সালে ফেনী কলেজে পড়াশোনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন প্রতিরোধযুদ্ধে। পরে ভারতে চলে যান। সেখানে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমির হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম বক্তানগর, ইউনিয়ন শিকারীপাড়া, উপজেলা নবাবগঞ্জ, ঢাকা। বাবা বাবর আলী, মা তসিরন নেছা। স্ত্রী রাহেলা খাতুন। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪৭। শহীদ ৪ অক্টোবর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে পরিবারের কাউকে না জানিয়ে একদিন রাতে আমির হোসেন বাড়ি থেকে চলে যান। তাঁর স্ত্রী ও বাবা-মা কেউ জানতেন না তিনি কোথায় গেছেন। অনেক দিন পর এক রাতে তিনি বাড়ি ফেরেন। তখন পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন যে তিনি গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে।

স্ত্রী, বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দু-তিন দিন থাকেন। তারপর বিদায় নিয়ে আবার যুদ্ধে যোগ দেন। তিনি নিজ এলাকায় যুদ্ধ করেন হালিম বাহিনীর অধীনে।

দুর্গম হরিরামপুর উপজেলায় (তখন থানা) ছিল বাহিনীর প্রধান ক্যাম্প। মানিকগঞ্জ জেলা এবং ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার যাঁরা ২ ও ৩ নম্বর সেক্টরে বা স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নেন, তাঁদের অনেকে বিভিন্ন সময়ে এই বাহিনীতে যোগ দেন।

১৯৭১ সালের ৪ অক্টোবর বেলা আনুমানিক দুইটায় আমির হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা হালিম বাহিনীর একটি গোপন উপক্যাম্পে (সাদাপুর) ছিলেন। তখন ক্যাম্পে দুপুরের খাবার খাওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় খবর আসে, পাশের সমসাবাদ গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল ও রাজাকাররা এসেছে। আমির হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে ওই গ্রামে যান এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। তাঁদের আকস্মিক আক্রমণে পাঁচ-ছয়জন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার হতাহত হয়।

AMARBOI.COM

এরপর দুই পক্ষে সামনাসামনি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার বেশি ছিল। অস্ত্রশস্ত্রেও তারা এগিয়ে ছিল। মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান লক্ষ্য করে পাল্টা আক্রমণ করে। একপর্যায়ে আমির হোসেনের বুকে তিন-চারটি গুলি লাগে। গুরুতর আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

সহযোদ্ধারা দ্রুত আমির হোসেনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তখন সহযোদ্ধারা স্থানীয় গ্রামবাসীর সহায়তায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কাছে পাঠান। কিন্তু পথেই তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যায়।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার আমির হোসেনকে খেতাব প্রদান করলেও তিনি যে শহীদ, গেজেটে এর উল্লেখ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলমগীর সাত্তার, বীর প্রতীক

গ্রাম গোপালপুর, কালকিনী, মাদারীপুর। বর্তমান ঠিকানা ১৪৭/৬ মণিপুরী পাড়া, ঢাকা। বাবা কাজী আবদুর রউফ, মা নূরজাহান বেগম। স্ত্রী তাহমিনা সাত্তার ও সাইদা সাত্তার। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩০৫। গেজেটে নাম কাজী আবদুল সাত্তার।

ঘন গাছপালায় এক পাহাড়ি এলাকায় ডাকোটা বিমান নিয়ে নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ নিলেন আলমগীর সাত্তার (কাজী আবদুস সাত্তার)। স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে রপ্ত করলেন রাতের আঁধারে আধুনিক দিকদর্শন যন্ত্র ছাড়াই বিমান চালনা এবং শত্রুর রাডার ফাঁকি দিয়ে মাত্র ২০০ ফুট উচ্চতায় বিমান নিয়ে উড়ে যাওয়ার কৌশল। আরও প্রশিক্ষণ নিলেন, কেমন করে শত্রুবিমানের আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়, কত দূর থেকে রকেট ছুড়তে হয়, কীভাবে নিশানা লক্ষ্য করে বোমা ফেলে কত কোণে ডাইভ দিতে হয়, বিমানে থাকা মেশিনগান থেকে কীভাবে নিশানা স্থির করে গুলি ছুড়তে হয় ইত্যাদি। আলমগীর সাত্তার দক্ষতার সঙ্গে সব প্রশিক্ষণ শেষ করলেন।

প্রশিক্ষণ শেষে আলমগীর সাত্তার অপেক্ষা করতে থাকেন অভিযানে যাওয়ার জন্য। ডাকোটা বিমান নিয়ে আক্রমণ করবেন। এই বিমান নিয়ে আক্রমণ পরিচালনার জন্য মনোনীত হয়েছেন আরও দুজন—আবদুল মুকিত (বীর প্রতীক) ও আবদুল খালেক (বীর প্রতীক)। সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাঁরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে আক্রমণ চালাবেন।

সবকিছু ঠিকঠাক। হঠাৎ তাঁদের মিশন বাতিল হলো। অকটেন ১০০ এই বিমানের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ইঞ্জিনের পেছন দিয়ে যে ধোঁয়া বের হয়, তাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। রাতের আঁধারে অনেক দূর থেকে সেই স্ফুলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্ফুলিঙ্গের কারণে বিমান শত্রুদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। তাই এই বিমান দিয়ে সামরিক অভিযান বাতিল করা হলো।

ডাকোটা বিমান দিয়ে ঢাকায় সামরিক অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে আলমগীর সাত্তার ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অভিযান তিনি করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর ওপর প্রদত্ত অন্য দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। ডাকোটা বিমান পরে মুক্তিবাহিনীর পরিবহন বিমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ বিমান মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দুর্গম ঘাঁটিতে চলাচল ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী (পরে জেনারেল) এই বিমানে করে বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শনে যেতেন। মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এ কে খন্দকারও (বীর উত্তম, পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) দুইবার ওই বিমানে রণাঙ্গন পরিদর্শন করেন। তখন আলমগীর সাত্তার দক্ষতার সঙ্গে বিমান পরিচালনা করে তাঁদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যান।

আলমগীর সাত্তার বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসে (পিআইএ) যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসে ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে যান। সেখানে মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। কিন্তু স্থলযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। পরে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলিমুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম রত্নপুর, উপজেলা আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
বাবা আবদুল করিম হাওলাদার, মা আমেনা বেগম।
স্ত্রী রাজিয়া বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২১। মৃত্যু ২০১০।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিক। বৃহত্তর বরিশাল জেলার ঝালকাঠি, নলছিটি ও রাজাপুর এলাকায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধারা যৌথভাবে ভান্ডারিয়া থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল ঝালকাঠির গাবখান চ্যানেলের তীরে সেহাঙ্গল গ্রামে মিলিত হয়। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আলিমুল ইসলাম (ওরফে জহিরুল ইসলাম)।

মুক্তিযোদ্ধাদের সেহাঙ্গল গ্রাম থেকে ভান্ডারিয়া থানা আক্রমণে যাওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট দিন (তারিখ জানা যায়নি) তাঁরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। খবর আসে, গাবখান চ্যানেলের কাউখালী প্রান্ত থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি গানবোট সেহাঙ্গলের দিকে এগিয়ে আসছে। ফলে আলিমুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা ভান্ডারিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন। তাঁরা দ্রুত অবস্থান নেন সেহাঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশপাশে। গানবোটটি তাঁদের অবস্থানের কাছে আসামাত্র তাঁরা গানবোট লক্ষ্য করে একটি দুই ইঞ্চি মর্টার ছোড়েন। নিখুঁত নিশানায় সেটি গানবোটে পড়ে, কিন্তু সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। এরপর পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের পাল্টা আক্রমণ করে।

পাকিস্তানিরা গানবোট থেকে একের পর এক শেল ছোড়ে। সেখানে ছিল অনেক খেজুরগাছ। শেলের আঘাতে কয়েকটি বড় খেজুরগাছ ভেঙে পড়ে। একটির ভাঙা অংশ একজন মুক্তিযোদ্ধার গায়ের ওপর পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এ ছাড়া শেলের স্প্লিন্টারের আঘাত ও গুলিতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পেছনে চলে যান। আকস্মিক এই বিপর্যয়ে আলিমুল ইসলাম মনোবল হারাননি, বিচলিতও হননি। তাঁর দলের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মাটি কামড়ে নিজেদের অবস্থানে থেকে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি আক্রমণ মোকাবিলা করেন।

দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। এর মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধারাও পুনরায় সংগঠিত হয়ে আক্রমণে অংশ নেন। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাঁরা সবাই সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন পাল্টা তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা আর টিকতে পারেনি। একপর্যায়ে বেশ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা পিছু হটে পালিয়ে যায়। এদিন যুদ্ধের একপর্যায়ে আলিমুল ইসলামও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া শেলের স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হন।

আলিমুল ইসলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তাঁর ইউনিটের অবস্থান ছিল ঢাকা সেনানিবাসে। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে তিনি আড়াই মাসের ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাবসেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলিমুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম কালিগাপুর, ইউনিয়ন খাগড়হর, সদর, ময়মনসিংহ।
বাবা ইসকান্দার আলী, মা নজিরননেছা।
স্ত্রী মাজেদা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২০।

সীমান্ত এলাকা থেকে দিনের বেলা মাধবপুর অভিমুখে রওনা হন আলিমুল ইসলামসহ ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের লক্ষ্য, সড়কে চলাচলরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ি অ্যামবুশ করা।

২৩ মে বেলা আনুমানিক দুইটায় আলিমুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা ওই সড়কের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান। তাঁরা সেখানে দুটি ট্যাংক-বিধ্বংসী মাইন পেতে আড়ালে পাকিস্তানি সেনাবাহী গাড়ির জন্য অপেক্ষায় থাকেন। এরপর সময় গড়ায়। কিন্তু সেদিন পাকিস্তানিদের কোনো গাড়ি আসেনি। মুক্তিযোদ্ধারা এতে হতাশ হননি। রাতে তাঁরা অ্যামবুশস্থলেই থাকেন।

পরদিন বেলা আড়াইটা পর্যন্ত গাড়ি আসেনি। এরপর তাঁরা বেশির ভাগ দুপুরের খাবার খেতে বসেন। বাকিরা থাকেন সতর্ক অবস্থায়। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের বিরাট এক কনভয় তাঁদের অ্যামবুশস্থলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। খাবার ফেলে তাঁরা দ্রুত নিজ নিজ অবস্থানে যান। আলিমুল ইসলামসহ তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা ছিলেন একদম সামনে। তাঁদের ওপর দায়িত্ব ছিল মাইন বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম গোলাগুলি শুরু করার।

জিপ, লরি ও পিকআপ মিলে পাকিস্তানি ওই কনভয়ে মোট ২২টি গাড়ি ছিল। এই সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর দলনেতা ও পেছনে থাকা সহযোদ্ধারা অনুমান করতে পারেননি। এতে আলিমুল কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। কারণ, সংখ্যায় তাঁরা মাত্র ২২ জন আর পাকিস্তানিদের সংখ্যা তাঁদের চেয়ে সাত-আট গুণ বেশি। পাল্টা আক্রমণে তাঁদের সবার মারা পড়ার আশঙ্কাই ছিল বেশি। কিন্তু তার পরও তিনি বিচলিত হননি।

এর মধ্যে পাকিস্তানিদের একদম সামনের গাড়ি (জিপ) সেতুর বিকল্প রাস্তা দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাড়িটিও যায়। চতুর্থটি ছিল পিকআপ ভ্যান। সেটি যাওয়ার সময় তাঁদের পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হয়। পিকআপটি উড়ে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গাড়িরও একই ভাগ্য ঘটে। পেছনের গাড়িগুলো থেমে যায়।

এ সময় আলিমুল ইসলামসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্র গর্জে ওঠে। তাঁদের গোলাগুলিতে হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। অক্ষত পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। পাকিস্তানিরা অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করেন। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ধাওয়া করে। কিন্তু তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

আলিমুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৮ মার্চ যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর 'এস' ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আকবর, বীর প্রতীক

গ্রাম ফালগুনকরা, উপজেলা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বাবা সৈয়দ আলী, মা আমেনা বেগম। স্ত্রী রোকেয়া বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৫। শহীদ অক্টোবর/ নভেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছিলেন আলী আকবর। কৃষিকাজ করে সংসার চলছিল। মুজাহিদ বাহিনীর অনিয়মিত সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণও নেওয়া ছিল তাঁর।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আলী আকবর নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। ২৬ মার্চেই যুদ্ধে যোগ দেন।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় অনেকের মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ নেওয়া ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আলী আকবরসহ প্রায় ৩০ জন মুজাহিদ স্থানীয় আবদুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে সংগঠিত হন। ২৫ মার্চের পর তাঁরা চৌদ্দগ্রাম বাজার, বাতিসা, ফালগুনকরাসহ একাধিক স্থানে বড় বড় গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেন। পরে তাঁরা স্থানীয় থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। থানা থেকে অস্ত্র সংগ্রহে আলী আকবর সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

মে মাসের মাঝামাঝি তাঁরা চৌদ্দগ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সম্মুখযুদ্ধ করেন। এরপর আরও কয়েক দফা সেখানে যুদ্ধ হয়। বেশির ভাগ যুদ্ধই ছিল রক্তক্ষয়ী। কয়েক দিনের যুদ্ধে তাঁদের হাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩০-৩৫ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর সাত-আটজন শহীদ হন। ৩০ মের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিপুল শক্তি নিয়ে তাঁদের ওপর আক্রমণ শুরু করলে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হন। তাঁদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। এরপর আলী আকবর ভারতে গিয়ে পুনঃসংগঠিত হন। পরে ২ নম্বর সেক্টরের অধীন রাজনগর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে লাকসামের বাগমারা রেলসেতু ধ্বংসের অপারেশন অন্যতম। এই অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে আলী আকবরের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ ও আহত হন। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান।

অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে কুমিল্লার মিয়াবাজার এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়াবহ এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অংশ নেন আলী আকবর। প্রচণ্ড যুদ্ধে দুই পক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় বাধ্য হয়ে তাঁরা পিছু হটেন। পিছু হটে ভারতে যাওয়ার সময় তাঁরা নোয়াবাজারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অ্যামবুশে পড়েন। তখন তাঁদের কাছে তেমন গুলি-গোলা ছিল না। এই অবস্থায় তিনি ও আরেকজন সহযোদ্ধাদের বলেন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে। তাঁরা দুজন পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁদের গুলি শেষ হয়ে যায়। তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে তাঁরা শহীদ হন। পরে সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে গ্রামের বাড়িতে পাঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আকবর আকন, বীর প্রতীক

গ্রাম গৌরীপুর, উপজেলা ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর। বর্তমান ঠিকানা মুসলিমপাড়া, প্রথম লেন, দক্ষিণ ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর। বাবা আসমত আলী আকন, মা আয়েশা খানম। স্ত্রী হাসিনা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮২। মৃত্যু জানুয়ারি ২০১২।

কয়েক দিন ধরে সেনানিবাসের ভেতরটা থমথমে। অবাঙালি সেনাসদস্যরা বাঙালিদের কেন জানি এড়িয়ে চলছে। সেনানিবাসে বাঙালিও তেমন নেই। বেশির ভাগ অবাঙালি। বাঙালি বলতে আছেন আলী আকবর আকনসহ আনুমানিক ১৬০ জন। কর্মকর্তা বলতে ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল), সুবেদার মেজর হারিছ মিয়া (বীর প্রতীক) ও তিনি।

সেনানিবাসের বাইরে কী ঘটছে, সেটা আলী আকবর আকন ও তাঁর সহযোদ্ধারা তেমন জানেন না। ২৮ মার্চ আলী আকবর আকন ও তাঁর সহযোদ্ধারা জানতে পারলেন দেশের কিছু ঘটনা। এরপর ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে তাঁরা কয়েকজন আলোচনা করলেন। সবাই বিদ্রোহ করে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে একমত হলেন। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁরা পেলেন না।

৩১ মার্চ রাতে আলী আকবর আকনদের অতর্কিতে আক্রমণ করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট গোলন্দাজ বাহিনী। আলী আকবর আকন ও তাঁর সহযোদ্ধারা সতর্কই ছিলেন। তাঁরাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন। দুই পক্ষে গুলি-পাল্টা গুলি চলতে থাকল। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে আলী আকবর আকনদেরই বেশি ক্ষয়ক্ষতি হলো। কয়েকজন শহীদ ও আহত হলেন।

সকালবেলা গোলাগুলির মাত্রা কমে গেল। তিনি ধারণা করলেন, পাকিস্তানি সেনারা আবার সন্ধ্যায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবে। সেই আক্রমণে তাঁদের টিকে থাকতে হবে। তিনি সহযোদ্ধাদের গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে বললেন। বেলা আনুমানিক পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা। আলী আকবর দুরবিন দিয়ে আড়াল থেকে দেখতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাদের তৎপরতা। ঠিক তখনই পাকিস্তানি অবস্থান থেকে ছুটে এল একঝাঁক গুলি। একটি গুলি বিদ্ধ হলো তাঁর বুকে। তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল স্টেনগান ও দুরবিন।

তীব্র যন্ত্রণায় আলী আকবর আকনের মুখটা নীল হয়ে গেল। তবে দমে গেলেন না। সাহসও হারালেন না। সেখানে তাঁর কোনো সহযোদ্ধা নেই। তাঁরা জানেনও না তিনি আহত। অনেক কষ্টে সেখান থেকে ফিরে গেলেন সহযোদ্ধাদের কাছে।

আলী আকবর আকন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে তাঁরা পালিয়ে গিয়ে সমবেত হন বদরগঞ্জে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় ভারতে। চিকিৎসা নিয়ে আবার যোগ দেন যুদ্ধে। কিন্তু প্রত্যক্ষযুদ্ধে তিনি আর অংশ নিতে পারেননি। পরে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আশরাফ, বীর প্রতীক

কাশর, সদর, ময়মনসিংহ। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ৫, সড়ক ১১, মোহাম্মদী হাউজিং, মোহাম্মদপুর। বাবা মোহাম্মদ আলী হায়দার, মা আমিনা খাতুন। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৬।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক। একদিন রাতে আলী আশরাফসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা আকস্মিক আক্রমণ চালান সাদুল্লাপুর থানায়। গাইবান্ধা জেলার একটি উপজেলা সাদুল্লাপুর। আক্রমণের শুরুতেই থানায় অবস্থানরত বাঙালি-অবাঙালি পুলিশ প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, সবাই পালিয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হলো প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি। হস্তগত হওয়া সেইসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা রওনা হলেন হাইড আউটের উদ্দেশে। তখন ভোরের আলো কেবল ফুটতে শুরু করেছে। তাঁদের হাইড আউট মোল্লার চরে। থানা সদর থেকে বেশ দূরে। সকাল হওয়ার আগেই ফিরতে হবে সেখানে।

থানা আক্রমণের সাফল্যে মুক্তিযোদ্ধারা উৎফুল্ল। ফেরার সময় তাঁদের জন্য বিপদ অপেক্ষা করছে, সেটা তাঁরা বুঝতেও পারলেন না। বল্লমজাড় গ্রামে পৌঁছামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা পড়ে গেলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অ্যামবুশে। আকস্মিক আক্রমণে তাঁরা দিশাহারা। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা অসংগঠিত অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন।

আলী আশরাফ ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা গুলি করতে করতে পিছু হটছিলেন, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেননি। তাঁদের দিকে ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে এলএমজির গুলি। তিনজনই গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

এ অবস্থায় তাঁদের পক্ষে আর পশ্চাদপসরণ করা সম্ভব হয়নি। কয়েকজন গ্রামবাসীর সহায়তায় আশ্রয় নেন একটি বাড়িতে। গৃহকর্তা ও অন্যরা তাঁদের খুব সহায়তা করেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। কিছুক্ষণ পর রক্তের দাগ দেখে ওই বাড়িতে হাজির হলো একদল পাকিস্তানি সেনা। তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন। পাকিস্তানি সেনারা আলী আশরাফের দুই সহযোদ্ধা ইসলামউদ্দিন ও ওমর ফারুককে তখনই হত্যা করে। এই দুজন ছিলেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর এয়ারম্যান। আর আলী আশরাফকে পাকিস্তানি সেনারা আটক করে গাইবান্ধায় নিয়ে যায়।

পরে আলী আশরাফ ঘটনাচক্রে বেঁচে যান। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে গাইবান্ধায় তাদের যে ক্যাম্পে নিয়ে যায়, সেই ক্যাম্পের একজন ক্যাপ্টেন ছিল তাঁর পরিচিত। ওই ক্যাপ্টেন তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এরপর তাঁকে নাটোর জেলে পাঠানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৩ ডিসেম্বর তিনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে জেল থেকে পালিয়ে যান।

আলী আশরাফ চাকরি করতেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকায়। তখন তাঁর পদবি ছিল করপোরাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে পালিয়ে ময়মনসিংহ হয়ে ভারতে যান। সেখানে তিনি যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন। পরে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সে। এরপর তাঁকে ১১ নম্বর সেক্টরের মানকারচর সাবসেক্টরে পাঠানো হয়। কিন্তু সাদুল্লাপুর ছাড়া আর কোনো অপারেশন বা যুদ্ধে তিনি অংশ নিতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম মুক্তারনগর, উপজেলা শিবালয়, মানিকগঞ্জ।
বাবা এ বি এম রাফিউদ্দিন, মা সুলতানা রাজিয়া।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩১১।
গেজেটে নাম মোহাম্মদ জিয়া।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যে মাস থেকে পাকিস্তানের সামরিক সরকার বারবার প্রচার করছিল, বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। কোনো যুদ্ধ-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। বিদেশিরা যাতে এ প্রচারের ফাঁদে না পড়েন, সে জন্য মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিনসহ চারজন ৯ জুন ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দুঃসাহসিক একটি অপারেশন করেন।

হোটেলের গেটে প্রহরারত পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আলী আহমদ জিয়াউদ্দিনসহ তিনজন গাড়ি থেকে নেমে চারটি গ্রেনেড ছোড়েন। তখন পোর্চে দাঁড়ানো ছিল বিদেশি প্রতিনিধিদের ব্যবহৃত গাড়িবহর। সেগুলো দু-তিন মিনিট আগে বিদেশি প্রতিনিধিদের নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে। প্রথম ও চতুর্থ গ্রেনেড ছোড়েন আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন। প্রথম গ্রেনেড বিস্ফোরণে বহরের শেভ্রোলেট গাড়িটি কয়েক ফুট ওপরে উঠে নিচে পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেনেড ছোড়েন যথাক্রমে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী ও হাবিবুল আলম।

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল এবং পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদানকারী কনসোর্টিয়ামের চেয়ারম্যান তখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তাঁরা উঠেছিলেন ইন্টারকন্টিনেন্টালে। উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিরূপণ ও বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যাচাই করা। ঢাকায় তাঁদের অবস্থানের সময় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে। এই অপারেশনের বিশদ বর্ণনা আছে আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিনের সহযোদ্ধা হাবিবুল আলমের ইংরেজিতে লেখা *ব্রেভ অব হার্ট* বইয়ে।

AMARBOI.COM

আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে ভারতে যান। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন।

মুক্তিযোদ্ধা আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধকালে কয়েকজন সহযোদ্ধা মিলে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা সবাই নিজ নিজ এলাকায় যাবেন। সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে সামাজিক ও কৃষি উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। স্বাধীনতার পর তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাঁর এ অঙ্গীকার রক্ষা করেন। এ কাজে এখনো তিনি আত্মনিবেদিত।

স্বাধীনতার প্রায় ২১ বছর পর ১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা ও পদক প্রদান করে। পরবর্তী সময়ে আরও দুবার এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলী আহমেদ জিয়াউদ্দিন কোনো সংবর্ধনায় যোগ দেননি এবং পদকও গ্রহণ করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশরাফুল হক, বীর প্রতীক

৪১ বাদুড়তলা, কান্দিরপাড়, সদর, কুমিল্লা।
বাবা হাবিবুল হক, মা আঞ্জুমান আরা বেগম।
স্ত্রী শাহীন সুলতানা। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫০। মৃত্যু ১৯৯৬।

বাংলাদেশের ভেতরে প্রাথমিক অবস্থান থেকে রাতে আশরাফুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা রওনা হন লক্ষ্যস্থল অভিমুখে।

তাঁরা আটগ্রাম ডাকবাংলোতে আক্রমণ করবেন। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত আটগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধকালে সেখানে সরকারি ডাকবাংলোতে ছিল পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও তাদের সহযোগী কিছু রাজাকার। সব মিলিয়ে ৫৫-৬০ জন।

রাত একটায় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল অবস্থান নেয় কারাবাল্লা গ্রামে। বাকি দুই দল স্রোতস্বিনী কুশিয়ারা নদী অতিক্রম করে রাত যখন দুইটা, তখন একটি দল ডান দিকে এবং অপর দল বাঁ দিকে এগিয়ে যায়। আশরাফুল হক তাঁর দল নিয়ে ডান দিকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হেঁটে একসময় নিঃশব্দে এবং নির্বিঘ্নেই পৌঁছান লক্ষ্যস্থল ডাকবাংলোর কাছে। জিরো আওয়ার অর্থাৎ আক্রমণের নির্ধারিত সময় ছিল রাত চারটা। তার আগেই তাঁদের সব প্রস্তুতি শেষ হয়।

ভারত থেকে দূরপাল্লার গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ামাত্র আশরাফুল হক সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেন। অন্যান্য দলও একই সময় আক্রমণ শুরু করে। গুলির খই ফুটতে থাকে ডাকবাংলো ঘিরে।

প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা এবং ইপিসিএএফরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। রাজাকাররা শুরুতেই পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনা এবং ইপিসিএএফরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করেও ব্যর্থ হয়। তিন ঘণ্টা পর তাদের সেই প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। এরপর তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যেই নিহত হয় তাদের অনেকে। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে শত্রুদের ১৮টি মৃতদেহ পান। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের।

আটগ্রাম ডাকবাংলোর যুদ্ধ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিরাট এক সাফল্য। অবশ্য এই সাফল্য ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আটজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হন। আর আহত হন আশরাফুল হকসহ সাতজন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আধা ঘণ্টা বা এর কিছু আগে তাঁর কোমরে শেলের স্প্লিন্টার লাগে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত পাঠিয়ে দেন ভারতে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা হয় প্রথমে গুয়াহাটি হাসপাতালে, এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুস্থ হয়ে ৩ ডিসেম্বর তিনি পুনরায় যুদ্ধে যোগ দেন।

আশরাফুল হক ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরের জালালপুর সাবসেক্টরসহ সিলেটের বিভিন্ন জায়গায়। যুদ্ধে তিনি বরাবর পুরোভাগে থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ আলী মোল্লা, বীর প্রতীক

গ্রাম ঘোষের চর, সদর, গোপালগঞ্জ। বাবা কালু মোল্লা। স্ত্রী হাসিনা বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২০৭। গেজেটে নাম আসাদ আলী। মৃত্যু ১৯৮৯।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় তখন। ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বর। মুক্তিবাহিনীর ছোট একটি দল চৌগাছার হিজলীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি টহলদলকে অ্যামবুশ করে। আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলে ছিলেন আসাদ আলী মোল্লা।

চৌগাছা যশোর জেলার অন্তর্গত এবং হিজলী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত-ঘেঁষা এলাকা। এখানে আছে একটি সীমান্ত চৌকি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হিজলীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিয়মিত আনাগোনা ছিল। সেদিন আসাদ আলীসহ মুক্তিযোদ্ধারা সকালে সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানে গোপনে অবস্থান নেন। সকাল নয়টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদল অ্যামবুশস্থলে হাজির হলে আসাদ আলীসহ মুক্তিযোদ্ধা সবার অস্ত্র গর্জে ওঠে। তীব্র গোলাগুলির মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই টহলদলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনারা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে।

আক্রান্ত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য পাশের ঘাঁটি থেকে দ্রুত সাহায্য চলে আসে। এরপর পাকিস্তানি সেনারাই মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র দলটি বেশ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এ সময় আসাদ আলী অত্যন্ত ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। চরম বিপদেও তিনি ভেঙে পড়েননি।

আসাদ আলী তখন সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। এর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর বয়রা সাবসেক্টরে পৌঁছে যায় তাঁদের সংকটের খবর। সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন দল এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি সাপোর্টও তাঁরা পান। তখন পাকিস্তানি সেনারা পুনরায় চাপের মধ্যে পড়ে। দিশাহারা অবস্থায় তারা সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ ও নিজেদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে কোনো রকমে পালিয়ে যায়। যুদ্ধে সেদিন আসাদ আলীদের দলের একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও কয়েকজন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছয়-সাতজন নিহত ও আহত হয় অনেকে।

আসাদ আলী ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে যশোর সেক্টরের ৪ নম্বর উইংয়ের অধীনে যাদবপুরে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭ মার্চ যাদবপুর ক্যাম্পে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন সাদেক (৪ নম্বর উইংয়ের সহকারী কমান্ডার) এসে তাঁদের অস্ত্র জমা দিতে বলে। তখন তাঁরা বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেন। সেদিন ক্যাপ্টেন সাদেক ও তার দলবল তাঁদের হাতে মারা পড়ে। এরপর বিভিন্ন স্থানে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

আসাদ আলী প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। একটি ছোট দলের নেতৃত্বে ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বেশির ভাগ যুদ্ধেই তিনি পুরোভাগে থাকতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদ হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম কুসুমপাড়া, উপজেলা পটিয়া, চট্টগ্রাম। বাবা আছাদ আলী মাস্টার, মা জমিলা খাতুন। স্ত্রী মতিয়া খানম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৫।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী দুপুরে একযোগে আক্রমণ চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি বড় দলের নেতৃত্বে আহমেদ হোসেন। তাঁদের বেশির ভাগই ইপিআর সদস্য। চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি—মেশিনগানের অবিরাম গুলি, ট্যাংকের ঘড়ঘড় শব্দ, কামান-মর্টারের গোলাবর্ষণ। মহা এক ধ্বংসযজ্ঞ।

ডানে-বাঁয়ে প্রায় আধা মাইলের বেশি এলাকাজুড়ে চলছে যুদ্ধ। আহমেদ হোসেনের ওপর তাঁদের মূল আক্রমণকারী দলকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব। এ ছাড়া পাকিস্তানি সেনারা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়লে বা পেছন থেকে প্রতি-আক্রমণের চেষ্টা চালালে তাদের আটকাতে হবে। তা না হলে যুদ্ধে বিজয় কষ্টকর হয়ে পড়বে। এ দায়িত্বটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আহমেদ হোসেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেই দায়িত্বটা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনাদের বেশ কয়েকটি প্রতি আক্রমণ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। তাঁর ও সহযোদ্ধাদের বীরত্বে ব্যর্থ হয়ে গেল পাকিস্তানি সেনাদের সব প্রচেষ্টা।

বিকেলের দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। পিছিয়ে যেতে থাকে তারা। মিত্রবাহিনীর ট্যাংকগুলো ঢুকে পড়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। দখল হয়ে গেল শত্রুর একটি বড় ঘাঁটি। এ ঘটনা ঘটে ময়দানদিঘিতে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর।

AMARBOI.COM

ময়দানদিঘি পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার অন্তর্গত। বোদা-পঞ্চগড় সড়কের পাশে তার অবস্থান। পঞ্চগড় দখল করার পর মুক্তিযোদ্ধারা ময়দানদিঘি আক্রমণ করেন। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দুর্ভেদ্য বাংকার ও প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল।

ময়দানদিঘি আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীও যোগ দেয়। মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ছিল কয়েকটি ট্যাংক। মুক্তিযোদ্ধাদের মূল শক্তি ছিলেন ইপিআর সদস্যরা। সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা ৭০ থেকে ৭৫ জন। আর ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা। সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা ২০০। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলেন। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আহমেদ হোসেন।

চাকরি করতেন তিনি ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঠাকুরগাঁও ইপিআর উইংয়ে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের ভজনপুর সাবসেক্টরে। রানীর বন্দর, চাম্পাতলী, খানসামা, পঞ্চগড়, নুনিয়াপাড়াসহ আরও কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ২৮ জুলাই নুনিয়াপাড়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তিনি আহত হন। সুস্থ হয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম পশ্চিম কধুরখিল, উপজেলা বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
বাবা আবদুল আলী, মা আমাতুন নূর বেগম।
স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও সাত মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২০।
গেজেটে নাম আহমাদুর রহমান। মৃত্যু ২০০৬।

আহমেদুর রহমানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা গভীর রাতে ভারত থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভেতরে এলেন। তাঁরা সীমান্তসংলগ্ন এক গ্রামে ফাঁদ পাতলেন। তারপর তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাদের জন্য। ভোর ছয়টায় একসঙ্গে গর্জে উঠল তাঁদের সবার অস্ত্র। এ ঘটনা বরণীর। ১৯৭১ সালের ৩ অক্টোবর। বরণী যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার অন্তর্গত।

আহমেদুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনা একটা ডায়েরিতে লিখে গেছেন। তাতে বরণীর যুদ্ধের বিবরণ আছে। তিনি লিখেছেন, '...অক্টোবরের ৩ তারিখের আর একটি অপারেশনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। জায়গার নাম ছিল বরণী। আমরা খবর পেলাম পাকবাহিনী সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই আমরা বরণীর উদ্দেশে রওনা দেই। তখন আমাদের কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা (খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম, পরে কর্নেল)। আমরা সেখানে ভোর তিনটার সময় অ্যামবুশ নেই। তারপর কমান্ডারের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। নির্দেশ পাই সকাল ৬টায়। আমাদের সবার অস্ত্র গর্জে ওঠে। শত্রুদের পক্ষ থেকেও আমাদের দিকে গুলি আসতে থাকে। আমাদের হঠাৎ আক্রমণে শত্রুরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আমরা সেখানে ছিলাম ৩০ জনের মতো। শত্রু ছিল অনেক। কয়েক প্লাটুন। আড়াই ঘণ্টার মতো যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আমি আহত হই। গোলার টুকরা আমার রানে (উরু) লাগে। আহত হওয়া সত্ত্বেও আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাই। হানাদাররা (পাকিস্তানি সেনা) যেহেতু সংখ্যায় অনেক বেশি, তারা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। আমরা তাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে গুলি করতে করতে পিছু হটি। সেখানে আমাদের এক ইপিআর সেনা শহীদ হন।'

আহমেদুর রহমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের ৪ নম্বর উইংয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। এ সময়ের কিছু বর্ণনাও আছে তাঁর ডায়েরিতে। তিনি লিখেছেন, '...আমি তখন ইপিআরের ৪ উইংয়ের সৈনিক হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্তবর্তী যাদবপুরে। ২৭ মার্চ হবে, আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে আসে অবাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন সাদেক (সহকারী উইং কমান্ডার)। ক্যাম্পে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত লাল সবুজ পতাকা দেখে সে আমাদের খুব গালি গালাজ করতে থাকে। আমাদের একজন (সিপাহি আশরাফ) প্রতিবাদ করলে ক্যাপ্টেন সাদেক তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে। আশরাফ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমরা সকলেই প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মজিদ মোল্লা। তিনি ইশারা করা মাত্র আমরা ক্যাপ্টেন সাদেককে লক্ষ্য করে গুলি করি। সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসান উল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম আহমেদপুর, উপজেলা সোনাগাজী, ফেনী।
বাবা আমিন উল্লাহ, মা জরিফা খাতুন।
স্ত্রী নূরজাহান বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৮। মৃত্যু ২০০৭।

মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলের একটি উপদলের দলনেতা আহসান উল্লাহ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজের কাছে থাকা ছোট রেডিওটা অন করলেন। নব্ ঘুরিয়ে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র ধরলেন। এই কেন্দ্র থেকে একটি গান বাজার কথা। সেটা শুধু তিনিই জানেন। টিকটিক করে সময় গড়াতে লাগল। উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছেন তিনি। ঠিক যখন সাড়ে সাতটা, তখন তিনি শুনতে পেলেন তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত গান।

আহসান উল্লাহ। দ্রুত সহযোদ্ধা নৌ-কমান্ডোদের একত্র করে জানালেন, আজ রাতেই চালাতে হবে তাঁদের প্রতীক্ষিত অপারেশন। তারপর আবেগময় কণ্ঠে সবাই শপথবাক্য পাঠ করলেন। এরপর সারা দিন গোপন শিবিরে উৎকণ্ঠায় কাটল। রাতে রওনা হলেন লক্ষ্যস্থলের দিকে। গোপন শিবির থেকে লক্ষ্যস্থল পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরের পথ।

তাঁরা লক্ষ্যস্থলে যখন পৌঁছালেন, তখন ভোর সাড়ে চারটা। তাঁর সহযোদ্ধারা দ্রুত বুকে মাইন বেঁধে নিলেন। তারপর পায়ে ফিনস পরে নিঃশব্দে নেমে পড়লেন পানিতে। পশুর নদীর বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে জাহাজ। পানিতে নেমে নৌ-কমান্ডোরা ছড়িয়ে পড়লেন জাহাজগুলো লক্ষ্য করে। কোনো জাহাজের জন্য দুজন, কোনো জাহাজের জন্য একজন।

নদীতে বড় বড় ঢেউ। বিশাল একেকটা ঢেউ শোঁ শোঁ শব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে নৌ-কমান্ডোদের নাক ও মুখের ওপর দিয়ে। অন্যদিকে বন্দরের সার্চলাইটের আলো সমানে ঘুরছে নদীর ওপর। কোনো কোনো জাহাজের সার্চলাইটও জ্বালানো। আলোর ঝলকানির মধ্যেই তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকেন।

এসব কিছু উপেক্ষা করে নৌ-কমান্ডোরা সফলতার সঙ্গে বেশির ভাগ জাহাজে লিমপেট মাইন সংযুক্ত করলেন। তারপর সময়ক্ষেপণ না করে সাঁতার কেটে চলে গেলেন নিরাপদ স্থানে। তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা বা পৌনে ছয়টা। মাঝনদীতে প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটল বিকট শব্দে। দু-তিন মিনিট পর আরেকটি। তারপর নদীতে শুরু হলো লঙ্কাকাণ্ড। একনাগাড়ে সাত-আট মিনিট ধরে একটির পর একটি মাইনের বিস্ফোরণ। ৩৫-৪০টি মাইনের কান-ফাটানো শব্দে বন্দরে অবস্থানরত আতঙ্কিত পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি করতে লাগল।

এ ঘটনা ঘটেছিল মংলা বন্দরে ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট রাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ১৬ আগস্ট)। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোদের অপারেশন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দুঃসাহসিকতাপূর্ণ এই অভিযান তখন গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। মংলা বন্দরে আহসান উল্লাহর নেতৃত্বে ৪০ জন নৌ-কমান্ডো অংশ নেন।

আহসান উল্লাহ চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে ফ্রান্সের তুলঁ নৌঘাঁটিতে প্রশিক্ষণে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসে তাতে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইবনে ফজল বদিউজ্জামান, বীর প্রতীক

গ্রাম কলেজ রামদিয়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
বাবা ফজলুর রহমান, মা হাজেরা রহমান। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ২০। শহীদ ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত। মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার ডাক। রাতে যুদ্ধবিরতির সময় পরিশ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্রাম নিচ্ছেন। কেউ আধা ঘুমে, কেউ জেগে, এ সময় হঠাৎ তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি সেনারা। নিমেষে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড যুদ্ধ।

ইবনে ফজল বদিউজ্জামান এতে বিচলিত হননি। সাহসের সঙ্গে তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। মুহুর্মুহু শেল ও রকেট এসে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আহতের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলে।

আক্রমণের প্রচণ্ডতায় মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন। কেউ কেউ পিছু হটে যান। এই পরিস্থিতিতে অধিনায়কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে ফজল বদিউজ্জামান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেন। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াই চালিয়ে সহযোদ্ধাদের মনে সাহস ফিরিয়ে আনেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় সহযোদ্ধারা পুনরায় সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের বীরত্বে থেমে যায় বেপরোয়া পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। যুদ্ধ চলতে থাকে। দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্ত হয় আজমপুর রেলস্টেশনসহ বিরাট এক এলাকা। পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দিকে।

যুদ্ধের একপর্যায়ে ইবনে ফজল বদিউজ্জামান অগ্রভাগে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। হতোদ্যম পাকিস্তানি সেনারা তখন পিছু হটছে। এ সময় হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া বোমা পড়ে তাঁর পাশে। স্প্লিন্টারের আঘাতে শহীদ হন তিনি।

এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর। ঘটে আখাউড়া রেলজংশনের কাছে আজমপুর রেলস্টেশনের অবস্থানে। অদূরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা। আখাউড়া-আজমপুর ১৯৭১ সালে সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই এলাকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নবীন সেনা কর্মকর্তা (লেফটেন্যান্ট) ইবনে ফজল বদিউজ্জামান ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ২৯ ক্যাভেলরি (লঙ্কার) ইউনিটে। এর অবস্থান ছিল রংপুর সেনানিবাসে। ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে কর্মরত বাঙালি দুজন সেনা কর্মকর্তা ছাড়া তাঁকেসহ অন্যান্য বাঙালি সেনাকর্মকর্তাকে বন্দী এবং বেশির ভাগকে পরে হত্যা করে। তবে তাঁকে হত্যা করেনি। ২ আগস্ট তিনি সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধীন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনি ব্রাভো কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশতিয়াক হোসেন, বীর প্রতীক

৩৯ এ লিচু বাগান রোড, জোয়ার সাহারা, ঢাকা। বর্তমান ঠিকানা ৪৮ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা। বাবা ডা. আফজাল হোসেন, মা রেজিয়া হোসেন। স্ত্রী শিলা রায়ান। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭৯।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে নভেম্বর মাসের শুরু থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেন। মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় তাঁরা চৌগাছার গরীবপুরে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর একটি দলে ছিলেন ইশতিয়াক হোসেন (হিদি)।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত অন্যতম সফল অভিযান ছিল গরীবপুরের যুদ্ধ। যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন বিশেষত ৮ নম্বর সেক্টরে আনুষ্ঠানিক বা চূড়ান্ত যুদ্ধের সূচনা হয়। যৌথ বাহিনীর সমন্বিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে ২৪ নভেম্বর চৌগাছা মুক্ত হয়। এ ঘটনা ছিল ৮ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিরাট সাফল্য।

২০ নভেম্বর ইশতিয়াক হোসেনসহ মুক্তিবাহিনীর একদল মুক্তিযোদ্ধা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে গরীবপুরে অবস্থান নেন। তাঁরা সকালে বয়রা এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করে নৌকায় কপোতাক্ষ নদ অতিক্রম করেন।

সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁরা গরীবপুর গ্রামে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল মিত্রবাহিনীর ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। গ্রামের কাঁচা রাস্তা ও খেতের ওপর দিয়ে মিত্রবাহিনীর পিটি ৭৬ ট্যাংক গরীবপুরে পৌঁছায়। এ ঘটনা পাকিস্তানি সেনারা আশা করেনি। তারা বিস্মিত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১০৭ ব্রিগেডের অধিনায়ক (ব্রিগেডিয়ার মালিক হায়াত) তার বাহিনীকে অবিলম্বে যৌথ বাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেয়।

২১ নভেম্বর ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যৌথ বাহিনীকে আক্রমণ করে। তখন চারদিক ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। এর সুযোগ নিয়ে তারা উঁচু ধানখেত ও নদীতীরের আড়ালে অবস্থান নিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালায়। তাদের অগ্রবর্তী দল মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর প্রতিরক্ষা ভেদ করে। ইশতিয়াক হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধারা এবং মিত্রবাহিনীর যোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ শুরু করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে ওই এলাকা কনভেনশনাল (প্রথাগত) ব্যাটলফিল্ডে পরিণত হয়।

একপর্যায়ে দুই পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তাঁদের সাহসিকতায় থেমে যায় পাকিস্তানি সেনাদের গরীবপুর পুনর্দখলের প্রচেষ্টা। এই যুদ্ধে ইশতিয়াক হোসেন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ২৪ নভেম্বর গরীবপুরসহ চৌগাছার একাংশ এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

ইশতিয়াক হোসেন ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ চৌগাছা-মাসলিয়া ও বেনাপোল আক্রমণ এবং ভাটিয়াপাড়ার (গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত) যুদ্ধ। ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ এম রাশেদ চৌধুরী, বীর প্রতীক

সোনাইমুড়ী, উপজেলা হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। বাবা শাহাব উদ্দিন আহমেদ। স্ত্রী মমতাজ চৌধুরী। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। বর্তমানে পলাতক।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব গোলন্দাজ বাহিনী (আর্টিলারি) ছিল না। এ সময় ভারত মুক্তিবাহিনীকে কয়েকটি ৩.৭ ইঞ্চি প্যাক হাউইটজার (ফিল্ড আর্টিলারি গান) দেয়। সেই অস্ত্র দিয়ে মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের জন্য ফিল্ড আর্টিলারি ব্যাটারি (গোলন্দাজ দল) গঠন করা হয়।

এর নাম দেওয়া হয় মুজিব (বা ১ ফিল্ড) ব্যাটারি। এতে অন্তর্ভুক্ত হন এ এম রাশেদ চৌধুরী। তিনি সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পান। মুজিব ব্যাটারিতে ছিল ছয়টি কামান। আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট দিয়ে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেন। মুজিব ব্যাটারি প্রথম যুদ্ধে অংশ নেন অক্টোবর মাসে।

১৪ অক্টোবর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সালদা নদী প্রতিরক্ষায় প্রথাগত আক্রমণ (কনভেনশনাল অ্যাটাক) চালায়। চূড়ান্ত আক্রমণের আগে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে মুজিব ব্যাটারির কামান দিয়ে অসংখ্য গোলা ছোড়া হয়। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা। সে জন্য কামানগুলো পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার চারদিকে বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে গোলা ছোড়া হয়।

AMARBOI.COM

এই আক্রমণে এ এম রাশেদ চৌধুরীও অংশ নেন। তাঁর নেতৃত্বে একটি উপদল কামান দিয়ে সালদা নদীর বায়েক এলাকায় গোলা বর্ষণ করে। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কয়েকটি বাংকারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেখানে মাটির ওপরে ও নিচে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের তিন স্তরের বাংকার।

বাংকারগুলো ছিল রেলের বগি দিয়ে তৈরি। ওপরের স্তর যুদ্ধের জন্য, মধ্যম স্তর গোলাবারুদ রাখাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য, নিচের স্তর ছিল বিশ্রামের জন্য। রাশেদ চৌধুরীর দলের ছোড়া কামানের গোলায় দু-তিনটি বাংকার সম্পূর্ণ ধ্বংস ও কয়েকটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ আক্রমণে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়।

রাশেদ চৌধুরীর দলের গোলাবর্ষণের পর মূল আক্রমণকারী দলের মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধ চলাবস্থায়ও রাশেদ চৌধুরী ও তাঁর সহযোদ্ধারা গ্রিড রেফারেন্স (শত্রুর নতুন অবস্থান সম্পর্কে তথ্য) অনুযায়ী গোলা বর্ষণ করেন। এতেও পাকিস্তানি সেনাদের বেশ ক্ষতি হয়।

এ এম রাশেদ চৌধুরী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুন-জুলাই মাসে ভারতে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দলে অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর পরিচালনায় মুজিব ব্যাটারি বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে গোলা বর্ষণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ এস এম এ খালেক, বীর প্রতীক

শিয়ালকাঠি, উপজেলা ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।
বাবা মো. সোনাম উদ্দীন। স্ত্রী রমিজা খালেক।
তাঁদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০৪।
১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত।

এ এস এম এ খালেক ১৯৭১ সালে বৈমানিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসে (পিআইএ)। ২৫ মার্চ করাচি থেকে বিমান চালিয়ে ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড দেখে তাঁর মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তিনি তাঁর সন্দেহের কথা সবাইকে বলেন এবং সতর্ক করে দেন। সে রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

কয়েক দিন পর ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে যোগ দেন প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে। আগরতলায় থাকাকালে তাঁর দেখা হয় আরও কয়েকজন বৈমানিকের সঙ্গে। তাঁরা আলোচনা করতে থাকেন, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া যায়। সেখানে তাঁরা নানা ধরনের সাংগঠনিক কাজ করতে থাকেন।

একজন বৈমানিক হিসেবে তাঁর জন্য উপযুক্ত হচ্ছে বিমানের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আঘাত করা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সে ব্যবস্থা হয়নি। সেপ্টেম্বরে মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব বিমান উইং গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলে এ এস এম এ খালেককে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে তিনটি বিমান দেয়। এর একটি ছিল ডিসি-৩ বা ডাকোটা। এই বিমানের জন্য নির্বাচিত হন এ এস এম এ খালেক, আবদুস সাত্তার (বীর প্রতীক) এবং আবদুল মুকিত (বীর প্রতীক)।

কিলোফ্লাইট নামের অন্তরালে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের জন্মলগ্নে যে নয়জন বৈমানিক অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁদের ছয়জনই ছিলেন বেসামরিক বৈমানিক। বিমান চালনার অভিজ্ঞতা থাকলেও তাঁদের সামরিক বিমানের সাহায্যে যুদ্ধ করার বা বিমান থেকে বোমা ফেলার কায়দাকানুন জানা ছিল না। সে জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে এ এস এম এ খালেক রপ্ত করেন বিমান নিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল। বিশেষত, রাতে আধুনিক দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ছাড়াই বিমান চালনা এবং শত্রুর রাডার ফাঁকি দিয়ে মাত্র ২০০ ফুট উচ্চতায় ওড়ার কৌশল। আধুনিক কোনো ধরনের দিকনির্দেশনা যন্ত্র ছাড়া রাতের আঁধারে শুধু কম্পাসের সাহায্যে বিমান চালনার পারদর্শিতা অর্জন একজন বৈমানিকের জন্য বিরাট সাফল্য। তিনি তা সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে এ এস এম এ খালেক অপেক্ষা করতে থাকেন অভিযানে যাওয়ার। সিদ্ধান্ত হয়, ডাকোটা বিমান নিয়ে এ এস এম এ খালেকরা ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে আক্রমণ চালাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অভিযান তাঁরা করতে পারেননি। পরে ওই বিমান ব্যবহৃত হয় দুর্গম ঘাঁটিতে চলাচলে বা সরঞ্জামাদি পরিবহনে। দক্ষতার সঙ্গে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কে এম আতিকুল ইসলাম

বীর প্রতীক

গ্রাম উত্তর নোয়াগাঁও, মুরাদনগর, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা কানাডা। বাবা এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, মা নসিবা খাতুন। স্ত্রী মারুফা ইসলাম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪৯।

মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার অন্তর্গত লাতু রেলস্টেশন। অবস্থান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। ১৯৭১ সালে এখানে পাকিস্তানি সেনারা ঘাঁটি করে। ১০ আগস্ট মুক্তিবাহিনী এ ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এ কে এম আতিকুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা বিকেলে একযোগে আক্রমণ করেন। এরপর দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত বা আহত হয়। ১৫ মিনিট পর পাকিস্তানি সেনারা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। সন্ধ্যা সাতটার পর সব সেনা ঘাঁটি ছেড়ে চলে যায়। ঘাঁটি দখল করে মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে উড্ডীন পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান এবং অবস্থান নেন।

এদিকে লাতুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট যাতে না আসতে পারে, সে জন্য মুক্তিবাহিনীর একটি দল কাট অফ পার্টি হিসেবে নিয়োজিত ছিল। তাঁরা বড়লেখা থেকে রিইনফোর্স হিসেবে আগত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ফলে লাতু ঘাঁটি দখলকারী মুক্তিযোদ্ধারা বেশ সংকটে পড়েন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন এ দল লাতুতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক শেলিং শুরু করে। এ কে এম আতিকুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা এতে বিচলিত হননি। সাহসের সঙ্গে তাঁরা পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। তখন তাঁদের অধিনায়ক বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যান। ঘাঁটি দখল করে তাঁরা তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হলেও এ ঘটনা পাকিস্তানিদের মনোবলে যথেষ্ট চিড় ধরায়। পাকিস্তানিরা পাঁচজনের লাশ এবং বিপুল গোলাবারুদ ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল।

লাতুতে ব্যর্থ হলেও এ কে এম আতিকুল ইসলামরা লুবাছড়ায় ব্যর্থ হননি। এ যুদ্ধের বর্ণনা আছে মেজর সি আর (চিত্তরঞ্জন) দত্তের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল) বয়ানে। তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাদী (মাহবুব রব সাদী বীর প্রতীক) তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে লুবাছড়া চা-বাগানে আক্রমণ চালান। দুই দিন তুমুল যুদ্ধের পর লুবাছড়া-কারবালা আমাদের হস্তগত হয়। পরে পাকিস্তানিরা বারবার চেষ্টা চালিয়েছে লুবাছড়া দখল করতে। কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি।

'এ যুদ্ধে কয়েকজন বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁদের বীরত্বসূচক খেতাব দেওয়ার জন্য আমি সিএনসির (মুক্তিবাহিনীর প্রধান) কাছে সুপারিশ করেছিলাম।'

এ কে এম আতিকুল ইসলাম ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে যান। প্রশিক্ষণ নিয়ে ৪ নম্বর সেক্টরের বড়পুঞ্জি ও জালালপুর সাবসেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কে মাহবুবুল আলম, বীর প্রতীক

থানা বোয়ালিয়া, রাজশাহী। বর্তমান ঠিকানা ই-৩, ক্যাপ্টেন শামসুল হক খান সড়ক, হেতেম খান, রাজশাহী। বাবা মুলতান উদ্দিন আহমেদ, মা নূর মহল খাতুন। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬৪। গেজেটে নাম এ কে এম মাহবুবুর রহমান।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। ভারতে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে খবর গেল, চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাকিস্তানি সেনারা জাঁকজমকপূর্ণভাবে তা উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওই এলাকা মুক্তিবাহিনীর ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাবসেক্টরের আওতাধীন। সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর গিয়াস উদ্দিন (বীর বিক্রম, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) সিদ্ধান্ত নিলেন, ওই দিন চাঁপাইনবাবগঞ্জে বড় ধরনের একটি অপারেশনের।

শুরু হলো প্রস্তুতি। এই অপারেশনের জন্য মনোনীত করা হলো এ কে মাহবুবুল আলমসহ ৮৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের প্রত্যেকের চোখে জিঘাংসা আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দলে বিভক্ত করা হলো। প্রথম গ্রুপে ২০ জন। দ্বিতীয় গ্রুপে ৩৫ জন। তৃতীয় গ্রুপে ৩১ জন।

দ্বিতীয় গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হলেন এ কে মাহবুবুল আলম। তাঁদের ওপর দায়িত্ব হরিপুর সেতুতে আক্রমণ করা। সেখানে প্রহরারত পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের হত্যা বা বন্দী করে সেতু উড়িয়ে দেওয়া, যাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহীর একমাত্র সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

এ কে মাহবুবুল আলমসহ ৮৬ জন মুক্তিযোদ্ধা কয়েকটি নৌকায় ভারত থেকে সকালে রওনা হলেন টার্গেটের উদ্দেশে। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছালেন টার্গেটের দুই মাইল দূরত্বে।

রাত নয়টায় তাঁরা অতি সন্তর্পণে কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হলেন হরিপুর সেতুর কাছে। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। তবে তারকারাশির মিটিমিটি আলো পানিতে পড়ে চারদিক কিছুটা আলোকিত করে রেখেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা কোনো শব্দ না করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। ১০০ গজের মধ্যে যাওয়ামাত্র শত্রুর দিক থেকে আওয়াজ এল 'হল্ট', 'হ্যান্ডস আপ'। এ কথা শেষ না হতেই গুলি শুরু হলো।

মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন। শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেতুর দখল চলে এল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। সেদিন যুদ্ধে এ কে মাহবুবুল আলমসহ কয়েকজন যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁদের আক্রমণে নিহত হয় দুই পাকিস্তানি সেনা। দুজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে হারিয়ে যায়। আহত একজনসহ ১১ জন পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগী জীবন্ত ধরা পড়ে।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা এক্সপ্লোসিভ লাগাতে শুরু করলেন সেতুতে। রাত আনুমানিক ১২টা পাঁচ মিনিট। গগনবিদারী আওয়াজে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল সেতু।

এ কে মাহবুবুল আলম ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৭ নম্বর সেক্টরের লালগোলা সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনামুল হক গাজী, বীর প্রতীক

গ্রাম বাসাবাড়ি, ইউনিয়ন আটজুরি, মোল্লারহাট, বাগেরহাট। বাবা আবদুল হাকিম গাজী, মা ফুলজান বিবি। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৩। গেজেটে নাম এনামুল হক। শহীদ ১৭ নভেম্বর ১৯৭১।

ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে এনামুল হক গাজীসহ মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ভাগের দিকে। তাঁরা খবর পেয়েছেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল এসেছে। সেনাবাহিনীর ওই দলটিকে তাঁরা আক্রমণ করবেন। একটু পরই তাঁরা মুখোমুখি হলেন পাকিস্তানি সেনাদের।

কাছাকাছি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারাও ছিল সতর্ক। তারা পাল্টা গুলিবর্ষণ করে।

এনামুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করেন। একপর্যায়ে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা ঝোড়োগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাদলের একাংশের ওপর।

সাহসী এনামুল হক এ সময় আরও এগিয়ে যান। তখন হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন তিনি। আহত হয়েও দমে যাননি। যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। তাঁর অদম্য মনোবলে সহযোদ্ধারা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হন। কিন্তু মারাত্মক আহত এনামুল হক একটু পরে ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৭ নভেম্বরের, কাশীপুরে। ঘটেছিল কাশীপুর যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অদূরে। কপোতাক্ষ নদ কাশীপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। সেখানে নদের ওপর একটি সেতু আছে। চৌগাছা থানার পশ্চিমে সীমান্ত এলাকায় যেতে হলে এই সেতু দিয়েই যেতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সামরিক কৌশলগত কারণে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, উভয়ের কাছেই কাশীপুর ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাশীপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো ঘাঁটি ছিল না। অদূরে ঝিকরগাছা থানায় (বর্তমানে উপজেলা) ছিল তাদের ঘাঁটি। সেখানে নিয়োজিত ছিল ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট এবং ২২ এফএফ রেজিমেন্ট।

কাশীপুর অনেকটা মুক্ত এলাকার মতো ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র একটি দল কাশীপুরে গোপনে অবস্থান করত। পাকিস্তানি সেনারা ঝিকরগাছা থেকে আসত সেখানে। এলাকার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য টহল দিয়ে চলে যেত। মুক্তিযোদ্ধাদের বড় দল সুযোগ বুঝে প্রায়ই সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করত। ১৯৭১ সালে কাশীপুরে অসংখ্যবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একপর্যায়ে তারা হতাহত সেনাদের নিয়ে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ এনামুল হকের মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করেন কাশীপুরেই।

এনামুল হক গাজী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১-এ ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম সদর উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম বাইরপাড়া, উপজেলা লোহাগড়া, নড়াইল।
বাবা সাদাত হোসেন, মা আবেদা আকতার।
স্ত্রী নাসরিন জাহান। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৯।

মুক্তিযুদ্ধকালে অমরখানা ও জগদলহাটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ছিল মুখোমুখি অবস্থানে। জুলাই মাস থেকে প্রায় দিন এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কখনো পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের, কখনো মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করতেন। তখন দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হতো। তবে কেউ কাউকে নিজেদের অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি। এভাবে যুদ্ধ চলে নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত।

এক দল (প্রায় তিন কোম্পানি) মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি অবস্থানে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য ২২ নভেম্বর রাতে সমবেত হন চাওয়াই নদীর পূর্ব তীরে। রাত দুইটায় তাঁরা আক্রমণ চালান। এমন আক্রমণের জন্য পাকিস্তানিরা প্রস্তুতই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে তাদের আর্টিলারি। শুরু হয় নিরাপদ বাংকার থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ।

এম সদর উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার মধ্যে ঢুকে পড়েন। একনাগাড়ে দুই-আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা অমরখানা থেকে জগদলহাটে পালিয়ে যায়। ভোরের আগেই মুক্ত হয়ে যায় অমরখানা।

অমরখানা দখলের পর মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুতি নেন জগদলহাট আক্রমণের। সেখানে তাঁরা আক্রমণ চালান। এ যুদ্ধে রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলম। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'সকাল নটার দিকে এলেন সদরুদ্দিন সাহেব। একটা জিপে চড়ে। চোখ লাল। অবিন্যস্ত অগোছালো চেহারা। কাঁধে স্টেনগান। বোঝাই যায় সারা রাত ঘুমাননি। ফ্রন্ট আর রেয়ার, সম্ভবত এই নিয়েই কেটেছে তাঁর সারা রাত।

'...পাক বাহিনী প্রায় ছয় মাস অনেকটা সুইসাইড স্কোয়াডের মতো মাটি কামড়ে পড়ে ছিল এ জায়গাটায় (অমরখানা)। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে মুখর ছিল জায়গাটা। বিচ্ছিন্নভাবে বহুবার আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সরানো যায়নি। কখনো এখান থেকে উন্মত্ত হাতির মতো একরোখা ভঙ্গিতে পাক বাহিনী এগিয়ে গেছে ভজনপুর-দেবনগর মুক্তিফৌজের অবস্থানের দিকে। কখনো অমরখানায় ভারতীয় অবস্থানের দিকে।...শতসহস্র কামান-মর্টারের গোলা বর্ষিত হয়েছে তাদের ওপর। এর মধ্যেও টিকে ছিল ওরা।'

এম সদর উদ্দিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকা এয়ার বেসে। তখন তাঁর পদবি ছিল স্কোয়াড্রন লিডার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৪ মে ভারতে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। পরে তাঁকে ভজনপুর সাবসেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এম সদর উদ্দিন অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করেন। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অ্যামবুশ, রেইড, ডিমোলিশন, আকস্মিক আক্রমণসহ নানা ধরনের অপারেশন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম হামিদুল্লাহ খান, বীর প্রতীক

গ্রাম মেদেনীমণ্ডল, উপজেলা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
বাবা দবির উদ্দীন খান, মা জসিমুন নেছা।
স্ত্রী রাবেয়া সুলতানা খান। তাঁদের তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৮০। মৃত্যু ৩০ ডিসেম্বর ২০১১।

মুক্তিযুদ্ধকালে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও চর রাজীবপুর এলাকা নিয়ে ছিল মুক্তিবাহিনীর মানকারচর সাবসেক্টর। এ সাবসেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন এম হামিদুল্লাহ খান।

রৌমারীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কখনোই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এম হামিদুল্লাহ খানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা সুসংহতভাবে এ এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। এ এলাকায় বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে চিলমারীর যুদ্ধ অন্যতম। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। এর ঘটনা শোনা যাক তাঁর বয়ান থেকে :

'অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে চিলমারী আক্রমণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় আক্রমণে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা ৩৫ ভাগ নেওয়া হবে ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়াদের মধ্য থেকে। ৪০ ভাগ সেক্টরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে। বাকি ২৫ ভাগ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, যাঁরা নিজ উদ্যোগে অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুন।

'নির্ধারিত দিন ভোর চারটায় ২৬ মিমি সংকেত পিস্তলের মাধ্যমে আমি আকাশের দিকে গুলি করে যুদ্ধ শুরুর যুগপৎ সংকেত দিই। মুহূর্তেই প্রলয়কাণ্ড ঘটে। গোলাগুলিতে সমগ্র চিলমারীর আকাশ রক্তিম হয়ে ওঠে। চারদিকে নারী-পুরুষের ক্রন্দন রোল পড়ে। ট্রেঞ্চে এবং বাংকারে শত্রুবাহিনী এবং তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে একযোগে গোলাগুলি চলে।

'এ সময় আমি রিইনফোর্সমেন্ট এবং গাইডসহ এক স্থান থেকে আরেক স্থান পর্যবেক্ষণের কাজে বেরিয়ে পড়ি। কাভারের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার চেয়ে এ রকম মুভমেন্টে বিপদের আশঙ্কা বেশি। আমার জীবনে এমন উত্তেজনাকর, উন্মাদনাপূর্ণ, বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতি এর আগে কখনো আসেনি। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্থিরচিত্ত থেকে নির্লিপ্তভাবে সহযোদ্ধাদের মনের সাহস বাড়িয়ে তুলতে অগ্রসর হতে হবে, এটাই স্মরণে রেখেছি।

'সকাল ছয়টার আগেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী ইপিসিএএফ ও রাজাকাররা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ শুরু করে। পাকিস্তানিদের একমাত্র ওয়াপদা ঘাঁটি ছাড়া সব ঘাঁটির পতন হয় ছয়টার মধ্যেই। চিলমারীর বেশির ভাগ এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।'

এম হামিদুল্লাহ খান চাকরি করতেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকায়। মে মাসে ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পরে তাঁকে মানকারচর সাবসেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৫ নভেম্বরের পর থেকে ১১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এম হামিদুল্লাহ খান অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম হারুন-অর-রশিদ, বীর প্রতীক

গ্রাম কাটিরহাট, হাটহাজারী উপজেলা, চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৪১৫, সড়ক ৩০, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা। বাবা মোহাম্মদুল হক, মা জরিনা বেগম। স্ত্রী লায়লা নাজনীন। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৯।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার উত্তরে কালাছড়া চা-বাগান। ১৯৭১ সালে এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘাঁটি করে। ৩ আগস্ট রাতে মুক্তিবাহিনীর দুটি দল (দুই কোম্পানি) এখানে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে সার্বিক নেতৃত্ব দেন এম হারুন-অর-রশিদ। মেজর মুহাম্মদ আইন উদ্দিনের (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) বয়ানে এই যুদ্ধ: 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণের জন্য নিয়মমাফিক এক ব্যাটালিয়ন শক্তি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লেফটেন্যান্ট হারুন সাহস করে প্রস্তুতি নেন। তাঁর অধীনে দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি একটি কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব দেন হাবিলদার হালিমকে। অপর কোম্পানি তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকে। তবে দুই কোম্পানির সার্বিক নেতৃত্বই তাঁর হাতে ছিল।

'একদিন রাতে তাঁরা দুটি দলে ভাগ হয়ে পাকিস্তানি অবস্থানে আঘাত হানেন। হাবিলদার হালিমের দলের একজন যোদ্ধা প্রথমেই শহীদ হওয়ায় তাঁরা আর সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি (হালিম) নিজেও শহীদ হন।

'লেফটেন্যান্ট হারুন তাঁর কোম্পানি নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্প আক্রমণ করেন। তাঁর দলের আক্রমণে পাকিস্তানি অনেক সেনা হতাহত হয়। কিছু পাকিস্তানি সেনা বাংকারে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা বাংকারে গ্রেনেড চার্জ করে তাদের হত্যা করেন।

'এরপর লেফটেন্যান্ট হারুন হালিম কোম্পানির লক্ষ্যস্থলে আক্রমণ করেন। সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের পর্যুদস্ত করে স্থানটি দখল করেন। কালাছড়া থেকে একটি এলএমজিসহ প্রায় ১০০ অস্ত্র এবং ২৭ জন পাকিস্তানি সেনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। আমাদের দুজন শহীদ ও সাতজন আহত হন। এর পর থেকে কালাছড়া সব সময় মুক্ত ছিল। পাকিস্তানিরা পরবর্তী সময়ে আর কখনোই কালাছাড়া চা-বাগানের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি।'

এম হারুন-অর-রশিদ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মেজর শাফায়াত জামিলের (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল) নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করেন। এতে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য।

প্রতিরোধযুদ্ধের পর মে মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যায় ঘটনা। আগে খবর পেয়ে হারুন-অর-রশিদ কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে আখাউড়া-মুকুন্দপুর রেলপথের এক স্থানে বিস্ফোরক বসিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি রসদবাহী ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। ট্রেনটি আসামাত্র তাঁরা বিস্ফোরণ ঘটান। এতে রেলবগি ও রেলপথের একাংশের ব্যাপক ক্ষতি হয়, নিহত হয় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা।

এম হারুন-অর-রশিদ পরবর্তী সময়ে ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। তাঁর যুদ্ধ এলাকা ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়ার একাংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল

বীর প্রতীক

গ্রাম কাজলা, উপজেলা পূর্বধলা, নেত্রকোনা। বাবা মহিউদ্দিন তালুকদার, মা আশরাফুন নেছা। স্ত্রী রওশন হোসেন। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১০। গেজেটে নাম ওয়ারেসাত হোসেন।

রাতের অন্ধকারে ওয়ারেসাত হোসেন বেলালসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা এগিয়ে যেতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে। তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর ভুল নির্দেশনায় তাঁরা ঢুকে পড়লেন বিপজ্জনক স্থানে। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ চালাল। প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যে তাঁরা যে যেভাবে পারলেন পজিশন নিলেন। একই সময়ে শুরু হলো ভারত থেকে গোলাবর্ষণ। সেগুলো তাঁদের অবস্থানেই পড়তে থাকল। নিমেষে মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন হতাহত হলেন। চরম সংকটময় এক মুহূর্ত। ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করলেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁর প্রচেষ্টায় বেঁচে গেল অনেক মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ। এ ঘটনা ঘটে হালুয়াঘাটে ১৯৭১ সালের জুন মাসে।

হালুয়াঘাট ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত। জেলা সদরের উত্তরে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। সেখানে আছে সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি)। ১৯৭১ সালে এই বিওপিতে ছিল একদল পাকিস্তানি সেনা। তারা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। জুন মাসের একদিন মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল সেখানে আক্রমণ করে। একটি দলে ছিলেন ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল। তিনি ছিলেন ওই দলের সহ-দলনেতা। তাঁর বড় ভাই শাখাওয়াত হোসেন বাহার (বীর প্রতীক) ছিলেন দলনেতা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের অন্ধকারে ওয়ারেসাত হোসেন বেলালরা সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে যেতে থাকেন। কথা ছিল তাঁরা আক্রমণ শুরু করার আগে সেখানে ভারত থেকে আর্টিলারি গোলাবর্ষণের। গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ামাত্র তাঁরা আক্রমণ শুরু করবেন।

কিন্তু পথপ্রদর্শকের ভুলে ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের একদম কাছে চলে যান। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে আক্রমণ করে। একই সময় শুরু হয় গোলাবর্ষণ। সেই গোলা এসে পড়ে তাঁদের ওপরই। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ ও ভারত থেকে আসা নিজেদের গোলায় মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন। এ সময় ওয়ারেসাত হোসেন বেলালদের থাকার কথা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে দূরে। নিজেদের গোলায় এবং পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তখনই শহীদ হন। ওয়ারেসাত হোসেন বেলালের পাশেই ছিলেন তাঁদের দলের একজন এলএমজিম্যান। তিনি তাঁর চোখের সামনেই শহীদ হন। জীবন-মৃত্যুর ওই সন্ধিক্ষণে ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেঁচে যায় অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ।

ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল ১৯৭১ সালে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মাকে চিঠি লিখে কাউকে না জানিয়ে ভারতে যান। ত্বরায় প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের ঢালু ও মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির আহম্মদ, বীর প্রতীক

গ্রাম মোবারকঘোনা, ইউনিয়ন ধূম, উপজেলা মিরসরাই, চট্টগ্রাম। বাবা বদিউর রহমান, মা সুফিয়া খাতুন। স্ত্রী বিবি ফাতেমা। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭২।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব গোলন্দাজ বাহিনী (আর্টিলারি) ছিল না। এ সময় ভারত মুক্তিবাহিনীকে কয়েকটি ৩.৭ ইঞ্চি প্যাক হাউইটজার (ফিল্ড আর্টিলারি গান) প্রদান করে। তা দিয়ে মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের জন্য ফিল্ড আর্টিলারি ব্যাটারি (গোলন্দাজ দল) গঠন করা হয়।

এর নাম দেওয়া হয় মুজিব (বা ১ ফিল্ড) ব্যাটারি। এতে অন্তর্ভুক্ত হন কবির আহম্মদ। তিনি একটি কামান পরিচালনার দায়িত্ব পান। ১৪ অক্টোবর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সালদা নদী প্রতিরক্ষায় প্রথাগত আক্রমণ (কনভেনশনাল অ্যাটাক) চালায়। চূড়ান্ত আক্রমণের আগে পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে মুজিব ব্যাটারির কামান দিয়ে অসংখ্য গোলা ছোড়া হয়। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা। সে জন্য কামানগুলো পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার চারদিকে বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে গোলা ছোড়া হয়।

এই আক্রমণে কবির আহম্মদও অংশ নেন। তিনি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কামান দিয়ে সালদা নদীর বায়েক এলাকায় গোলাবর্ষণ করেন। সঠিক নিশানায় গোলাবর্ষণ করার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বায়েক এলাকার প্রতিরক্ষার বিশেষত কয়েকটি বাংকারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেখানে মাটির ওপরে ও নিচে ছিল পাকিস্তানিদের তিন স্তরের বাংকার।

AMARBOI.COM

বাংকারগুলো ছিল রেলের বগি দিয়ে তৈরি। ওপরের স্তর যুদ্ধের জন্য। মধ্যম স্তর ব্যবহার করা হতো গোলাবারুদ রাখার পাশাপাশি অন্যান্য কাজে। নিচের স্তর ছিল বিশ্রামের জন্য। কবির আহম্মদের দলের ছোড়া কামানের গোলায় দু-তিনটি বাংকার সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং কয়েকটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোলার আঘাতে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়।

বায়েক এলাকায় কবির আহম্মদের দলের নিখুঁত গোলাবর্ষণের পর মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানিদের ওপর। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলা অবস্থায়ও তিনি গ্রিড রেফারেন্স (শত্রুর নতুন অবস্থান সম্পর্কে তথ্য) অনুযায়ী গোলাবর্ষণ করেন। এতেও পাকিস্তানি সেনাদের বেশ ক্ষতি হয়। একপর্যায়ে পাকিস্তানিরা বায়েক থেকে পিছু হটে যায়।

কবির আহম্মদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিটে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) ক্যাম্বেলপুরে কর্মরত ছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে তিন মাসের ছুটিতে বাড়ি আসেন। এপ্রিল মাসে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁকে হরিণা ক্যাম্পের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দলে অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর পরিচালনায় মুজিব ব্যাটারি বিভিন্ন জায়গায় থাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে বেশ কয়েকবার গোলাবর্ষণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করম আলী হাওলাদার, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন ভরপাশা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
বাবা গোলাম আলী হাওলাদার, মা লতিফুন্নেছা।
স্ত্রী খোদেজা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৬। মৃত্যু ১৯৮৮।

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বাহাদুরাবাদ নৌবন্দর। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল ৩১ বালুচ রেজিমেন্ট।

৩১ জুলাই মুক্তিবাহিনীর একটি দল (তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) বাহাদুরাবাদ ঘাটে আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনীর এই দলে ছিলেন করম আলী হাওলাদার। তিনি ছিলেন মূল আক্রমণকারী দল ডি কোম্পানিতে এবং একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে।

তাঁরা সেদিন নির্ধারিত সময়ে (শেষ রাতে) ঘাটের রেললাইনের জংশন পয়েন্টে অবস্থান নেন। এরপর সবার আগে করম আলী হাওলাদার তাঁর দল নিয়ে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যান। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল জেনারেটরবাহী রেলওয়াগন ও এর আশপাশের ছোট ছোট বাংকারে আক্রমণ করে সেগুলো ধ্বংস করা।

ঘটনাচক্রে তখন ওয়াগনের চারদিকের বাংকারে পাকিস্তানি সেনারা ছিল না। তারা লাইনের অপর পাশে ডিউটি শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই সময় লাইনের ওপর একটি যাত্রীবাহী রেলের সানটিং চলছিল। সানটিং ইঞ্জিন সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করম আলী হাওলাদার সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে যান এবং প্রথমে জেনারেটরবাহী রেলওয়াগন, পরে সানটিং ইঞ্জিনের ওপর রকেট নিক্ষেপ করেন।

করম আলী হাওলাদারের ছোড়া রকেট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। প্রথম রকেটের আঘাতেই জেনারেটরটি অকেজো হয়ে যায়। গোটা এলাকা অন্ধকারে ঢেকে যায়। গোলার শব্দ পেয়ে তাঁদের অন্যান্য উপদলও আক্রমণ শুরু করে। আচমকা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। বাঁচার জন্য অনেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার না জানায় তারা নদীতে ডুবে মারা যায়। পরে করম আলী হাওলাদার রকেট লঞ্চার থেকে রকেট ছুড়ে নদীতে থাকা সব নৌযান—বার্জ, পন্টুন, টাগ ও লঞ্চ ধ্বংস করেন। সেগুলো রকেটের আঘাতে ফুটো হয়ে পানিতে ডুবে যায়।

করম আলী হাওলাদার চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন সৈয়দপুর সেনানিবাসে অবস্থিত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মার্চে এই রেজিমেন্টকে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। তাঁর কোম্পানি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ীতে ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে করম আলী হাওলাদার যুদ্ধে যোগ দেন। ২৮ মার্চ রংপুর থেকে আসা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তিনি অ্যামবুশ করেন। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী আকমল আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম যশাতুয়া, ইউনিয়ন রতনপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা সাতগড়া, রংপুর। বাবা আকামত আলী, মা মরিয়ম খাতুন। স্ত্রী খোদেজা বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮১।

মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। তাঁদের নেতৃত্বে কাজী আকমল আলী। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি সহযোগী কয়েকজন। প্রচণ্ড আক্রমণে দিশাহারা পাকিস্তানি সেনারা। কয়েক ঘণ্টার প্রচণ্ড যুদ্ধে নিহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তারা পালাবার পথ খুঁজে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। এ ঘটনা ঘটে নরসিংদী জেলার মনোহরদীতে, ১৯৭১ সালের ২০ বা ২১ অক্টোবর।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়োজিত ছিল কয়েকজন বাঙালি ইপিআর সদস্য। আক্রমণের আগে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে হাত করেন ওই ইপিআর সদস্যদের। বাঙালি ইপিআররা প্রতিশ্রুতি দেন মুক্তিযোদ্ধারা যখন আক্রমণ চালাবেন, তখন তাঁদের পক্ষে থাকার। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা কাজী আকমল আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প অবরোধ করেন। যুদ্ধ শুরু হলে বাঙালি ইপিআর সদস্যরা পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। বাঙালি ইপিআররা পক্ষ ত্যাগ করায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধা ও পক্ষত্যাগী ইপিআর সদস্যদের সম্মিলিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

কয়েক ঘণ্টা ধরে সেখানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ জন সেনা নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ১১ জন। জীবিত পাকিস্তানি সেনাদের মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে পাঠানোর সময় পথিমধ্যে ক্রুদ্ধ জনতা কয়েকজনকে পিটিয়ে হত্যা করে। চারজনকে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। মনোহরদীর যুদ্ধে কাজী আকমল আলী যথেষ্ট কৌশলী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

কাজী আকমল আলী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে কিছুদিনের জন্য ভারতে আশ্রয় নেন। পরে মুক্তিবাহিনীর ৩ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স থেকে তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল পাঠানো হয় দেশের অভ্যন্তরে। তিনি তাঁর দল নিয়ে নরসিংদী ও এর আশপাশের এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানে দুঃসাহসিক কয়েকটি অপারেশন করেন। উপর্যুপরি অ্যামবুশ পরিচালনা করে পাকিস্তানি সেনাদের বিপর্যস্ত করেন। তিনি বেশির ভাগ সময় সহযোদ্ধাদের নিয়ে দেশের অভ্যন্তরেই অবস্থান করতেন। তাঁর অধীনে ছিল প্রায় ১০০ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা বেশির ভাগ ছিলেন গণবাহিনীর যোদ্ধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী মোরশেদুল আলম, বীর প্রতীক

গ্রাম নিলাখাদ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবদুল জব্বার, মা মরিয়ম বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৯। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশির ভাগ এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে। সীমান্তের অল্প কিছু এলাকা এখনো তাদের দখলে। এ রকমই একটি এলাকা চণ্ডীদার। সেখানে তখনো রয়ে গেছে একদল পাকিস্তানি সেনা। মরিয়া তাদের মনোভাব। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার (বর্তমানে উপজেলা) অন্তর্গত চণ্ডীদার।

ফলে সেখানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। কাজী মোরশেদুল আলমসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা রওনা দিলেন চণ্ডীদারে। তাঁরা মুখোমুখি হলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর। মুখোমুখি হওয়া মাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের ওপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। তাঁরা অত্যন্ত বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। দিনের আলোয় দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখে। কয়েক ঘণ্টা মরণপণ লড়াই করেও কাজী মোরশেদুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধকৌশল পাল্টান। পরে তাঁরা পুনরায় সংগঠিত ও কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে নতুন করে আক্রমণ চালান।

মুক্তিযোদ্ধাদের উপদলের একটি দল সামনে থেকে আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে। আরেক দল অপর পাশ থেকে স্মোক গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধূম্রকুণ্ডলীর সৃষ্টি করে পেছনে সরে যায়। এই সুযোগে আত্মঘাতী উপদল সৃষ্ট ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালায়। কাজী মোরশেদুল আলমসহ কয়েকজন ছিলেন এই দলে। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতায় শত্রুসেনাদের মনোবলে চিড় ধরে। তখন তারা কিছুটা পশ্চাদপসরণ করে নতুন জায়গায় অবস্থান নেয়। কাজী মোরশেদুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা ধাওয়া করে নতুন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন।

বিপর্যস্ত পাকিস্তানি সেনারাও মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। অমিত সাহসী কাজী মোরশেদুল আলম পাকিস্তানি সেনাদের গুলিবৃষ্টি উপেক্ষা করে কিছুটা এগিয়ে যান। খুব কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করার আগেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

যুদ্ধ শেষে সহযোদ্ধারা শহীদ মোরশেদুল আলমকে সমাহিত করেন কুল্লাপাথরে।

কাজী মোরশেদুল আলম ১৯৭১ সালে উচ্চমাধ্যমিকের শেষবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ভারতে যান। প্রশিক্ষণ নিয়ে যোগ দেন ২ নম্বর সেক্টরে। পরে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুদ্দুস মোল্লা, বীর প্রতীক

গ্রাম কাইতমারা, উপজেলা মুলাদী, বরিশাল।
বাবা ফজলে আলী, মা আমেনা বেগম। বিবাহিত।
নিঃসন্তান। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮৪। মৃত্যু ১৯৯২।

কুদ্দুস মোল্লা (সোনামদ্দীন) ১৯৭১ সালের আগে পেশায় ডাকাত ছিলেন। এ অপরাধে তিনি দু-তিনবার ধরা পড়েন এবং জেলও খাটেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ডাকাতি ছেড়ে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন।

২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে বরিশালে আক্রমণ করে। কামানের গর্জন, গানবোটের শেলিং আর মর্টারের শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে। তখন কুদ্দুস মোল্লা তাঁর দলবলসহ নিজ এলাকায় ছিলেন। তিনি খবর পান, পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল মাদারীপুর থেকে গৌরনদী হয়ে বরিশালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধারা গৌরনদীর উত্তরে কটকস্থলে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিয়েছেন। তিনি দলবলসহ তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

দুপুরে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বড় দল উপস্থিত হয়। এ সময় দুই পক্ষে পাল্টাপাল্টি গুলির ঘটনা ঘটে। সেনাবাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে কুদ্দুস মোল্লার দল ও স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধারা তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রতিরোধযোদ্ধা শহীদ হন।

এরপর কুদ্দুস মোল্লা উপলব্ধি করেন, প্রশিক্ষণ ছাড়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ভারতে যান। আর ডাকাতি করবেন না অঙ্গীকার করার পর তাঁকে এবং তাঁর দলবলকে মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি জুলাই মাসে দেশে ফেরেন।

কুদ্দুস মোল্লা পরে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাবসেক্টর এলাকায় যুদ্ধ করেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের (বীর উত্তম, পরে মেজর) অধীনে ছিলেন। হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বাবুগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে মুলাদী থানার ছবিপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

একদিন আড়িয়াল খাঁ নদ দিয়ে দুটি ফ্ল্যাট জাহাজে করে পাকিস্তানি সেনাদের অনুগত কয়েকজন বাঙালি পুলিশ কোথাও যাচ্ছিল। কুদ্দুস মোল্লা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় তাঁর দলবল নিয়ে নদীর সুবিধাজনক এক স্থানে ওই ফ্ল্যাট জাহাজে ঝটিকা আক্রমণ করেন। তখন দুই পক্ষে বেশ কিছুক্ষণ পাল্টাপাল্টি গুলির ঘটনা ঘটে। শেষে শত্রুপক্ষ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ১১টি অস্ত্র তাঁর হস্তগত হয়।

পরে কুদ্দুস মোল্লা বাবুগঞ্জ থানা আক্রমণ করেন। থানায় কিছু পাকিস্তানি সেনা ছিল। ফলে তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেননি। পাল্টা আক্রমণে তিনি পিছু হটে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এম আবু বাকের, বীর প্রতীক

গ্রাম মাছুমাবাদ, উপজেলা রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা সড়ক ২০, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা। বাবা কে এম আবদুল্লাহ, মা সুলতানা আবদুল্লাহ। স্ত্রী নাজমা আক্তার। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯।

গভীর রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে আছেন কে এম আবু বাকের। তিনিই তাঁদের দলনেতা। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেললেন। এর মধ্যে ভোর হলো। আবছা আলোয় বুঝতে পারলেন আঁকাবাঁকা পথে তাঁরা বেশি দূর এগোতে পারেননি। খুব সকালে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এ সময় তাঁদের সামনে হঠাৎ হাজির হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদল। একসঙ্গে এত মুক্তিযোদ্ধা দেখে পাকিস্তানি সেনাদের চক্ষু তো চড়কগাছ। মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করার আগেই ভয় পেয়ে তারা আত্মসমর্পণ করল। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে ঘটেছিল ভানুগাছের কাছাকাছি।

ভানুগাছ মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বৃহত্তর সিলেটকে মুক্ত করার জন্য সীমান্ত এলাকা থেকে শমশেরনগর-মৌলভীবাজার ও সিলেট অক্ষরেখা ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। ৩০ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে তাঁরা অভিযান শুরু করেন। কমলগঞ্জ হয়ে কেরামতনগর মুক্ত করার জন্য তাঁরা এগোতে থাকেন ভানুগাছের দিকে। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলায় মুক্তিযোদ্ধারা সময়মতো ভানুগাছে পৌঁছাতে পারেননি।

AMARBOI.COM

কেরামতনগরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল বেশ শক্তিশালী। কে এম আবু বাকেরের নেতৃত্বাধীন দলের ওপর কেরামতনগরের আউট পোস্ট দখলের দায়িত্ব ছিল। তিনি তাঁর দল নিয়ে দিনের বেলাতেই সেখানে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারাও তাঁদের পাল্টা আক্রমণ করে। শুরু হয় দুই পক্ষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও বীরত্বে হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা একপর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সহজেই কেরামতনগর দখল করেন।

এই যুদ্ধে কে এম আবু বাকের কৌশলী ভূমিকা পালন করে পাকিস্তানি সেনাদের তাক লাগিয়ে দেন। তারা ভাবতেই পারেনি দিনের বেলায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের এভাবে আক্রমণ করবে। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিবাহিনীর সাতজন আহত হন।

কে এম আবু বাকের ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁকে প্রথমে বাংলাদেশ ওয়ার ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি জেড ফোর্সের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধ করেন। ধামাই চা-বাগান, সোনারুপা ও ফুলতলায় তাঁর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এম রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম গোপালনগর, উপজেলা ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
বাবা আজাদ আলী খান (ওরফে আসাদ আলী খান),
মা মোছা. রাবেয়া খানম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮০। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেছেন কে এম রফিকুল ইসলামসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। সাহসের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করছেন কে এম রফিকুল ইসলাম। এ সময় হঠাৎ কয়েকটি গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা হরিশংকর গ্রামে ঘটে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

হরিশংকর গ্রাম কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত এলাকা থেকে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হলে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপনা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তখনো কুষ্টিয়া জেলার ব্যাপক অংশ ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে। বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনা।

সীমান্ত থেকে দৌলতপুর হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল এগিয়ে যাচ্ছিল কুষ্টিয়া জেলা সদর অভিমুখে। কিন্তু পথিমধ্যে হরিশংকর গ্রামে তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন। সেখানে ছিল একদল পাকিস্তানি সেনা। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ করেন। তখন সেখানে দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কে এম রফিকুল ইসলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। পরে পাকিস্তানি সেনারা হরিশংকর গ্রাম থেকে চলে যায়। তখন সহযোদ্ধারা গ্রামবাসীর সহায়তায় কে এম রফিকুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করে সমাহিত করেন।

কে এম রফিকুল ইসলাম চাকরি করতেন পানি উন্নয়ন বোর্ডে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ভেড়ামারা গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পে মেকানিক হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এপ্রিল মাসের শেষে ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৮ নম্বর সেক্টরের শিকারপুর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি একটি গেরিলাদলের সদস্য ছিলেন। তাঁর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আবুল কালাম। কুষ্টিয়া জেলার খোকসা, কুমারখালী, মিরপুর, দৌলতপুর ও ভেড়ামারা উপজেলা নিয়ে ছিল ওই সাবসেক্টর। এই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৯ বালুচ রেজিমেন্ট সামরিক প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশন ও সম্মুখযুদ্ধে কে এম রফিকুল ইসলাম যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

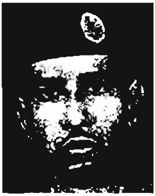

খায়রুল বাশার খান, বীর প্রতীক

গ্রাম গোপীনাথপুর, উপজেলা কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা আমীর আলী খান, মা ফিরোজা বেগম। স্ত্রী জোবেদা বাশার। তাঁদের চার ছেলেমেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭২। গেজেটে নাম খায়রুল বাশার। মৃত্যু ২০০৭।

২৮ জুলাই ১৯৭১। খায়রুল বাশার খানসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রাতে ভারত থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢোকেন। দুই-তিন দিনের মধ্যেই তাঁরা একটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাবেন। রাতের বাস্তব অবস্থা দেখার জন্য তাঁরা নিঃশব্দে ওই ঘাঁটির কাছে যান। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ (বীর উত্তম ও শহীদ)। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে। অন্ধকারে ভুলক্রমে তাঁরা চলে যান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লিসনিং পোস্টের কাছে। তাঁদের দেখে একজন পাকিস্তানি সেনা 'হল্ট' বলে চিৎকার করে ওঠে। বাশারের দলনেতা সালাহউদ্দীন ওই পাকিস্তানি সেনাকে জাপটে ধরে ধরাশায়ী করেন। তাঁদের এক সহযোদ্ধার গুলিতে ওই পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। সেখানে থাকা আরেক পাকিস্তানি সেনাকেও তাঁরা হত্যা করেন। এরপর তাঁরা ভারতে ফিরে যান।

নির্ধারিত দিন (৩০ জুলাই শেষ রাত, তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ৩১ জুলাই) মুক্তিবাহিনীর দুটি কোম্পানি (ব্রাভো ও ডেলটা দল) সেখানে আক্রমণ করে। ডেলটা দলে ছিলেন খায়রুল বাশার।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ দল মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করে। নির্ধারিত সময় শুরু হয় গোলাবর্ষণ। কিন্তু সেগুলোর কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে পড়ে। এতে হতাহত হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রাকৃতিক বাধা এবং নতুন এ বিপর্যয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। খায়রুল বাশারসহ তাঁর সহযোদ্ধারা এতে দমে যাননি। মনের জোর ও অদম্য সাহসে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা অধিনায়কের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। সমন্বিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরে। পাকিস্তানি সেনারা সামনের প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে শেলপ্রুফ বাংকারে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে।

অদম্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা গুলির মধ্যেই সামনে এগিয়ে যান। বাংকার অতিক্রম করে তাঁরা মূল প্রতিরক্ষার (কমিউনিটি সেন্টার) মধ্যে ঢুকে পড়েন। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত সফল হননি। আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এ ঘটনা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কামালপুর বিওপিতে। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কামালপুর গ্রামের মাঝামাঝি বিওপির অবস্থান। সেদিন যুদ্ধে খায়রুল বাশারসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা সাহসের সঙ্গে পার হয়ে মূল প্রতিরক্ষায় ঢুকে পড়েন। তাঁর দুই পাশের অনেক সহযোদ্ধা মাইন ও গুলির আঘাতে শহীদ ও আহত হন।

খায়রুল বাশার খান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর সেক্টরের ৫ নম্বর উইংয়ে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর ভারতে যান। পরে জেড ফোর্সের অধীন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়াসউদ্দিন, বীর প্রতীক

৩৬/১ তল্লা রোড, তল্লা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
বাবা সামসুদ্দীন আহমেদ, মা আম্বিয়া খাতুন।
স্ত্রী খুরশিদা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩০৭। মৃত্যু ২০০৪।

২৬ অক্টোবর ১৯৭১। গিয়াসউদ্দিন খবর পান তাঁদের অবস্থানস্থলের দিকে নদীপথে এগিয়ে আসছে একটি পাকিস্তানি গানবোট। তিনি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ এলাকায় যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলাদলের দলনেতা। তাঁদের অবস্থান ছিল মেঘনা-শীতলক্ষ্যা নদীর মোহনার কলাগাছিয়ায়।

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গানবোট কখনো দিনে, কখনো রাতে ওই এলাকায় টহল দিত। গিয়াসউদ্দিন সহযোদ্ধাদের নিয়ে এর আগেও পাকিস্তানি গানবোটে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। কয়েকবার প্রস্তুতি নিয়ে নদীর তীরে অপেক্ষা করেছেন। ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যার পরও তিনি খাবার-দাবার সেরে সহযোদ্ধাদের নিয়ে সারা রাত নদীর তীরে অপেক্ষা করেন। কিন্তু গানবোট আসেনি।

গিয়াসউদ্দিনসহ পরিশ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা তখন শিবিরে বিশ্রামরত। তাঁদের মধ্যে তিনিসহ ৩০ জন দ্রুত তৈরি হয়ে আরআর (রিকোয়েললেস রাইফেল) গানসহ পুনরায় অবস্থান নেন নদীর তীরের সুবিধাজনক স্থানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গানবোটটি তাঁদের অস্ত্রের আওতার মধ্যে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে তাঁদের আরআর গানসহ অন্যান্য সব অস্ত্র।

গিয়াসউদ্দিন তিনজন সহযোদ্ধার সহযোগিতায় নিখুঁত নিশানায় গানবোট লক্ষ্য করে তিনটি আরআর গোলা নিক্ষেপ করেন। তাতে গানবোটটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একদিকে হেলে পড়ে। ডেকে থাকা পাকিস্তানি সেনারা ছোটাছুটি শুরু করে। এ সময় তাঁর দুঃসাহসী কয়েকজন সহযোদ্ধা এগিয়ে গিয়ে নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে গুলি করেন। তাঁদের গুলিতে নিহত হয় দুজন পাকিস্তানি সেনা।

এরপর গিয়াসউদ্দিন আরআর গানের আরও কয়েকটি গোলা ছুড়ে গানবোটটি পুরোপুরি ধ্বংসের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তুমুল গোলাগুলির শব্দ শুনে মুন্সিগঞ্জ টার্মিনাল থেকে সেখানে আরেকটি গানবোট দ্রুত চলে আসে। ওই গানবোট নদীতে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিয়ে তাঁদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলি শুরু করে।

গিয়াসউদ্দিন ১৯৭১ সালে পড়াশোনার পাশাপাশি পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গেও ছিলেন যুক্ত। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য সিদ্দিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন অপারেশন (১০ আগস্ট), লাঙ্গলবন্দের সেতু অপারেশন (আগস্টের মাঝামাঝি), ফতুল্লায় আক্রমণ।

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার অন্তর্গত লাঙ্গলবন্দের সেতু। মুক্তিযুদ্ধকালে চারজন পাকিস্তানি ও দুজন বাঙালি ইপিআর ওই সেতুতে পাহারা দিতেন। দুই ইপিআর তাঁদের সহযোগিতা করেন। গভীর রাতে গিয়াসউদ্দিন ২২ জন সহযোদ্ধা নিয়ে সেখানে আক্রমণ করেন। পাকিস্তানিরা পাল্টা প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। চারজনই নিহত হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরক দিয়ে সেতু ধ্বংস করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ, বীর প্রতীক

গ্রাম চান্দপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। বাবা বাদশা মিয়া, মা চান্দ বানু। স্ত্রী সাবিহা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭৪। গেজেটে নাম গিয়াস উদ্দিন। মৃত্যু ২০০৪।

তখন গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের অবস্থান ছিল কুমিল্লার হোমনায়। ওই এলাকা দিয়ে ঢাকাগামী মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচল নিরাপদ করার জন্য সেক্টর সদর দপ্তর থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ আসে। হোমনা থানায় মোতায়েন ছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তাদের সহযোগিতা করত থানার পুলিশ। থানার চারদিকে বাংকার এবং প্রতি বাংকারে ছিল এলএমজি। এ ছাড়া দাউদকান্দি থেকেও লঞ্চযোগে পাকিস্তানি সেনারা আসত। তবে তারা টহল দিয়ে চলে যেত।

তথ্যানুসন্ধানের পর গিয়াস উদ্দিন সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১ জুলাই মধ্যরাতে সেখানে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁরা ছিলেন অল্প কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তবে বেশির ভাগই সাহসী ও দুর্ধর্ষ। অস্ত্রশস্ত্রও ছিল উন্নত মানের। আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এলএমজি দিয়ে গুলি করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

থানায় অবস্থানরত সব পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ যুদ্ধে নিহত হয়। সেদিন গিয়াস উদ্দিন ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। বিশেষত, তাঁর রণনৈপুণ্য ও শৌর্যের ফলেই পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং তাদের সবাই নিহত হয়।

এর কয়েক দিন পর (৬ জুলাই) গিয়াস উদ্দিন জয়পুর গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালান। দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত মাসিমপুর বাজারের আধা মাইল পশ্চিমে জয়পুর। গুপ্তচর মারফত সেদিন সকালে তিনি খবর পান, পাকিস্তানি সেনারা দুটি লঞ্চযোগে ওই এলাকায় আসছে। খবর পেয়েই সহযোদ্ধাদের নিয়ে গোমতীর শাখানদীর পাড়ে তিনি ফাঁদ পাতেন।

সকাল ১০টায় লঞ্চ দুটি ওই শাখানদীতে আসে। তখন গিয়াস উদ্দিন ও অন্যরা একযোগে আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়। এরপর সেনারা লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তাঁদের আক্রমণে ২০-২২ জন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়েছে।

গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১৯ সিগন্যাল কোরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। তিনি কমান্ডো বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্যারাট্রুপার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা সেনানিবাস থেকে কৌশলে পালিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ২ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন হোমনা, দাউদকান্দি ও গজারিয়া থানায় যুদ্ধ করেন। ৯ নভেম্বর দাউদকান্দির পঞ্চবটীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর বাঁ পায়ে গুলি লাগে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া, বীর প্রতীক

তেবাড়িয়াপাড়া, সলিমাবাদ, উপজেলা নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
বাবা একাব্বর আলী ভূঁইয়া, মা সাহেরা খাতুন।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫৩।
শহীদ ১৪ এপ্রিল ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে একদল মুক্তিযোদ্ধা চম্পাতলীতে অবস্থান নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলে ছিলেন গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া। তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন ইপিআরের সদস্য। ৯ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা চম্পাতলীতে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে দশমাইলে অবস্থান নেন। দশমাইল টি জংশন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও পিছে পিছে আসে এবং সেখানে পুনরায় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। চলে পরদিন পর্যন্ত। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন।

এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে অবস্থান নেন ভাতগাঁওয়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানেও আক্রমণ করে। ট্যাংক ও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্রের গোলাগুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা ক্রমশ সংকটময় হয়ে পড়ে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। তার পরও তাঁরা ভাতগাঁওয়ে অবস্থান করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁদের পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য খানসামার দিকে এগোচ্ছে। তখন তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এক দল অবস্থান নেয় খানসামার কাছে, অপর দল ভাতগাঁওয়েই থাকে। গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া যান খানসামায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি সেনারা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পিছু হটে যায়। সেগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব কিছুটা পূরণ হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ভাতগাঁওয়ে ফিরে যান।

এদিকে পাকিস্তানি সেনারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে একদল দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরের পাশ দিয়ে এবং অপর দল সোজা পাকা রাস্তা হয়ে ভাতগাঁও সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

১৪ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রসররত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। তখন কান্তজির মন্দির ও ভাতগাঁও এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়াসহ মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়াসহ তিনজন শহীদ এবং ১০-১২ জন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরও বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতগাঁও প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ভারতে চলে যান। গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া ও অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মরদেহ স্থানীয় গ্রামবাসী পরে সেখানেই দাফন করেন।

গুল মোহাম্মদ ভূঁইয়া ইপিআরে সেপাই পদে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর সেক্টরের অধীন ঠাকুরগাঁও ৯ উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক

নারায়ণগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা গাজী ভবন, ৪ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা। বাবা গোলাম কিবরিয়া গাজী, মা সামসুননেছা বেগম। স্ত্রী হাসিনা গাজী। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩০৮। গেজেটে নাম মোহাম্মদ গাজী।

রামপুরা ডিআইটি সড়ক থেকে তিনটি রিকশা রওনা হয় উলনের পথে। আলো নেই। অসমান কাঁচা রাস্তা। সামনের কিছু দূর যাওয়ার পর গোলাম দস্তগীর গাজী ও নীলু পেছনে তাকিয়ে দেখেন বাকি দুই রিকশা নেই। নানা ঘটনার পর তাঁরা আবার একত্র হয়ে রওনা হন। একসময় দৃষ্টিগোচর হয় লক্ষ্যস্থল উলন বিদ্যুৎকেন্দ্রের (সাবস্টেশন) আলো।

রওনা হওয়ার সময় তাঁরা ঠিক করে রেখেছিলেন, লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি যাওয়ার পর প্রথম রিকশা আগে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফটকে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিকশায় থাকা মুক্তিযোদ্ধারা ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে চালককে দাঁড়াতে বলবেন। চালকেরা তাঁদের চালাকি বুঝতে পারেননি বা কাউকে চিনতেও পারেননি। প্রথম রিকশা আগে ফটকের সামনে যায়।

ফটকে তখন পাহারায় ছিল একজন রাইফেলধারী পুলিশ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের একজন নিরাপত্তা প্রহরী। তারা দুজন রিকশা দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। গোলাম দস্তগীর গাজী ও নীলু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলন্ত রিকশা থেকে লাফিয়ে নেমে চোখের পলকে তাদের দিকে স্টেনগান তাক করে ধরেন। তারপর নিচু গলায় গাজী বলেন, 'হ্যান্ডস-আপ, খবরদার, চেঁচামেচি করবে না।'

গাজী ফটকে প্রহরারত পুলিশের কাছ থেকে জেনে নেন বাকি পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা কে কোথায়। সে জানায়, ১৫-১৬ জন পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী একটি বড় ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছে। তাদের সবাইকে তাঁরা নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করান। তাদের নিরস্ত্র করে নীলু ও মতিন (দুই) পাহারায় থাকেন। গাজী ও মতিন (এক) স্টেনগান হাতে এগিয়ে যান ট্রান্সফরমারের দিকে।

ট্রান্সফরমার ছিল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। প্রায় দোতলাসমান উঁচু ট্রান্সফরমার। অপারেটর রুমের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হতো। গাজী, মতিন (এক) ও আরও দুই সহযোদ্ধা ভেতরে ঢুকে ট্রান্সফরমারের গায়ে পিকে (বিস্ফোরক) লাগান।

সেদিন ক্র্যাক প্লাটুনের মুক্তিযোদ্ধারা উপদলে বিভক্ত হয়ে ঢাকায় একযোগে কয়েকটি অপারেশন করেন। গোলাম দস্তগীর গাজীরা বিস্ফোরক লাগানোর কয়েক মিনিট পর দেখা যায়, বিদ্যুচ্চমকের মতো এক ঝলক আলো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা রামপুরা এলাকা। তারপর নিকষ কালো অন্ধকারে আকাশে ফণা তুলে দাঁড়ায় আগুনের লেলিহান শিখা। ট্রান্সফরমার পুরোপুরি ধ্বংস ও ঢাকা শহরের একাংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ১৯ জুলাই।

গোলাম দস্তগীর গাজী ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে যান। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। অপারেশনে তিনি পুরোভাগে থাকতেন। তিনি যেসব অপারেশনে অংশ নিয়েছেন তার মধ্যে গ্যানিজ ও দাউদ পেট্রল পাম্প অপারেশন উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম মোস্তফা, বীর প্রতীক

গ্রাম কালারুখা, সদর উপজেলা, সিলেট।
বাবা ইব্রাহিম আলী, মা আয়েশা বেগম।
স্ত্রী খায়রুন নেছা। তাঁদের দুই মেয়ে ও আট ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৪। মৃত্যু ২০০০।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এ সময় সীমান্তের ওপারে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে গুপ্তচর মারফত খবর আসে, নাগেশ্বরী থেকে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা শেষ রাতে গাড়িতে করে ভুরুঙ্গামারী আসবে। রাতে সাধারণত পাকিস্তানি সেনারা খুব কম চলাচল করে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মনে হয় এ খবর সঠিক। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশের। শিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে বাছাই করে দ্রুত প্রায় ৭০ জনের একটি দল গঠিত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক নেতৃত্বে থাকেন গোলাম মোস্তফা ও আখতারুজ্জামান মণ্ডল।

মুক্তিযোদ্ধারা অ্যামবুশের স্থান নির্ধারণ করেন নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারীর মাঝামাঝি আন্ধারীঝাড় নামক স্থানকে। সেখানে উত্তর দিকে বাঁশঝোপের কাছে পাকা সড়কে তাঁরা অ্যান্টিট্যাংক মাইন বসানোর সিদ্ধান্ত নেন।

মধ্যরাতে সড়কে মাইন স্থাপন করা হয়। গোলাম মোস্তফাসহ মুক্তিযোদ্ধারা অদূরে অপেক্ষায় থাকেন। মাইন বিস্ফোরিত হওয়ামাত্র তাঁরা পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ চালাবেন। ভোর চারটা বা সাড়ে চারটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা দূরে একটি গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখতে পান।

এর আড়াই-তিন মিনিটের মধ্যে গগনবিদারী গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। চারদিকের মাটি কেঁপে ওঠে। বিকট শব্দে মুক্তিযোদ্ধা সবাই মনে করেন তাঁদের কানের পর্দা ফেটে গেছে। আকাশ ভেঙে পড়েছে। বাঁশঝোপসহ আশপাশের গাছগাছালিতে থাকা পাখিরা ভয়ে কিচিরমিচির করে আকাশে উড়ে যায়।

গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। কিন্তু পাকিস্তানিদের দিক থেকে কোনো প্রতি-উত্তর নেই। গোলাম মোস্তফাসহ কয়েকজন এগিয়ে যান। তখন আকাশ কিছুটা ফরসা হয়ে এসেছে। দূরের অনেক কিছু চোখে পড়ে, তাঁরা দেখেন, ঘটনাস্থলে বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে গাড়ি বা পাকিস্তানি সেনাদের কোনো চিহ্ন নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখেন, একটু দূরে খেতে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন গাড়ির কিছু অংশ ও খণ্ডিত একটি হাত। এর সঙ্গে পোশাকের অংশও আছে।

মুক্তিযোদ্ধারা পরে খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই জিপে একজন ক্যাপ্টেনসহ সাত-আটজন ছিল। মাইনের আঘাতে জিপসহ সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১ আগস্টের।

গোলাম মোস্তফা চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর সেক্টরের ১০ উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। তিস্তা সেতুর যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভুরুঙ্গামারীতে সমবেত হন। ভুরুঙ্গামারীর পতন হলে ভারতে যান।

ভারতে তিনি কিছুদিন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর প্রথমে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ, পরে মোগলহাট সাবসেক্টরে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম হোসেন মোল্লা, বীর প্রতীক

গ্রাম তুলাতুলি, সদর, কুমিল্লা। বাবা মো. আফসার উদ্দিন মোল্লা, মা মমিনজান বেগম। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৭। গেজেটে নাম গোলাম হোসেন। ১৯৮১ সালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সিলেট জেলার জৈন্তাপুর থানার অন্তর্গত একটি জায়গা তামাবিল। সীমান্তের ওপারে ভারতের ডাউকি। তামাবিলের পশ্চিমে জাফলং। ১৯৭১ সালের প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে সিলেট অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ অবস্থান নেন ডাউকিতে। কয়েকটি দলে বিভক্ত এসব যোদ্ধার বেশির ভাগই ইপিআর সদস্য। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন গোলাম হোসেন মোল্লা।

অন্যদিকে, তামাবিল ও জাফলংয়ে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই সীমান্ত পেরিয়ে তামাবিল ও জাফলংয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতেন। ২৫ জুন মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি দল তামাবিলে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। এতে সার্বিক নেতৃত্ব দেন বি আর চৌধুরী (তখন সুবেদার মেজর)। একটি দলের নেতৃত্ব দেন গোলাম হোসেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে। ব্যতিব্যস্ত পাকিস্তানি সেনারা পেছনে সরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। গোলাম হোসেন তাঁর দল নিয়ে তখন ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপর। তাঁর সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব হয়ে যায়।

মুক্তিয়োদ্ধাদের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন ও তছনছ হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা। এরপর সেনারা পালাতে শুরু করে। যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। তারা ফেলে যায় সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যসামগ্রী। মুক্তিযোদ্ধারা সেগুলো ডাউকিতে নিয়ে যান। এই যুদ্ধে গোলাম হোসেন অসাধারণ রণকৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মূলত তাঁর রণকৌশলের জন্যই পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এর কয়েক দিন পর গোলাম হোসেন একদল মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে জৈন্তাপুরে পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করেন। সহযোদ্ধাদের নিয়ে একদিন রাতে তিনি ডাউকি থেকে রওনা দেন। সীমান্ত অতিক্রম করে শেষ রাতে পৌঁছান জৈন্তাপুরে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলের চলাচলপথের এক জায়গায় তাঁরা গোপনে অবস্থান নেন। সকাল হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাদের টহলদল সেখানে হাজির হওয়ামাত্র তাঁরা আক্রমণ করেন। এতে হতাহত হয় অনেক সেনা।

গোলাম হোসেন মোল্লা চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন সিলেট সেক্টরে। পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট তাঁদের আক্রমণ করলে তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেন। মুক্তিযোদ্ধারা ৪ এপ্রিল সিলেট শহরের টিবি হাসপাতালে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্ব দেন গোলাম হোসেন। এখানে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। পরাজিত পাকিস্তানি সেনারা অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে খাদিমনগরে পালিয়ে যায়। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরে যুদ্ধ করেন ৫ নম্বর সেক্টরের ডাউকি সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদ মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম গুয়াগাছিয়া, উপজেলা গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। বাবা ফজর আলী বেপারী, মা হাসেবান বিবি। স্ত্রী কাছমেরি খানম। তাঁদের পাঁচ ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬০। ১৯৭৭-এ ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেনা বিদ্রোহের পর নিখোঁজ।

সহযোদ্ধাদের নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করছেন চাঁদ মিয়া। এ সময় তাঁর চোখের সামনে গুলিবিদ্ধ হলেন তাঁর নিজের দলের অধিনায়ক। রণক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব তখন তাঁর ওপর। সাহসের সঙ্গে নিজের দলের দায়িত্ব তিনি পালন করে চললেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিজেও আহত হলেন। আহত চাঁদ মিয়া দমে গেলেন না। জ্ঞান থাকা পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে চললেন। এ ঘটনা ঘটেছিল আখাউড়ায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ২ ডিসেম্বর আখাউড়ায় সারা দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে চাঁদ মিয়ার কোম্পানির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান পাকিস্তানি সেনাদের গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে শহীদ হন।

চাঁদ মিয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বি কোম্পানির সিনিয়র জেসিও (সুবেদার) ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে তাঁর কোম্পানির অবস্থান ছিল গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে। তাঁদের অধিনায়ক ছিলেন একজন পাকিস্তানি (পাঞ্জাবি)। বাঙালি কোনো সেনা কর্মকর্তা কোম্পানিতে ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি সাহসী এক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বেই বি কোম্পানির বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করেন। তাঁদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য কোম্পানির সদস্যরাও অনুপ্রাণিত হন। চাঁদ মিয়া সমরাস্ত্র কারখানার অস্ত্রাগারের প্রধান দরজা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে থাকা অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছাত্র-জনতার মধ্যে বিতরণ করেন।

AMARBOI.COM

পরে চাঁদ মিয়া তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সমবেত হন তেলিয়াপাড়ায়। সেখান থেকে তাঁদের পাঠানো হয় রামগড়ে। সেখানে তিনি তাঁর দল নিয়ে হাটহাজারী, নাজিরহাট, ফটিকছড়ি ও মানিকছড়ি এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে অংশ নেন। পরে কিছুদিন ৩ নম্বর সেক্টরে এবং এরপর এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া (পরে মেজর জেনারেল) তাঁর *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস* গ্রন্থে চাঁদ মিয়ার বীরত্বের কথা তুলে ধরে লিখেছেন, '...সকাল সাতটার দিকে শত্রুরা প্রায় ৩০-৪০ জন সৈন্য নিয়ে আগের মতো সুবেদার চান (চাঁদ) মিয়ার অবস্থানের দিকে টহল দিতে বেরুল। শত্রুরা কাছাকাছি পৌঁছামাত্র চান মিয়ার পুরো দলটা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করল। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ হলো। চান মিয়াদের তীব্র গুলিবর্ষণে ভয়ার্ত হয়ে অনেকগুলো মৃত সৈনিককে ফেলে পাক সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকির হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম চর পদ্মা, উপজেলা মুলাদী, বরিশাল।
বাবা আক্কেল আলী, মা হাসেন বানু।
স্ত্রী জাহানারা হোসেন। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২২।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জাকির হোসেন বলেন, 'আমার দিনক্ষণ মনে নেই। আমাদের ক্যাম্পে সিদ্ধান্ত হলো পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প আক্রমণের। সেই ক্যাম্প ছিল যশোর বা পাশের মাগুরা জেলার মধ্যে। জায়গাটার সঠিক নাম আমার এখন মনে নেই। একদিন আমরা ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধা রাতে রওনা হলাম সেই ক্যাম্পের উদ্দেশে। শেষ রাতে ক্যাম্প ঘেরাও করে আক্রমণ করলাম। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো দুই পক্ষে। ওদের বেশ কিছু সেনা মারা গেল। আমাদের পক্ষেও কয়েকজন শহীদ ও আহত হলেন।

'ঘণ্টা খানেক বা তারও বেশি সময় যুদ্ধ করার পর সকাল হয়ে গেল। আমরা পিছু হটে একটা আমবাগানে আশ্রয় নিই। রাতে সেই বাগানে পাকিস্তানি সেনাদের একজন এল একটা পত্র নিয়ে। সে এসেছে আমার কাছেই। পত্র পাঠিয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের ওলদাত খান নামের এক হাবিলদার। সে আমার প্রশিক্ষক ছিল। লিখেছে, "তুমি আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছ, আমি তোমার ওস্তাদ। তুমি আমাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করে আমাদের কয়েকজন সৈন্য মেরে ফেলেছ। তুমি গাদ্দার। তোমার হিম্মত থাকলে কাল আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসো।"

'এই চিঠি পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল দুই-তিনদিন পর পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে আবার আক্রমণ চালানোর। চিঠি পাওয়ার পর সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আমরা পরদিন সকালেই আবার সেখানে আক্রমণ করি। আমাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকজন নিহত হয়। দুজন পাকিস্তানি সেনাকে আমরা জীবিত আটক করি। তাদের পরে হত্যা করা হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে। এরপর তাদের বিমান এসে আমাদের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। তখন আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। বিমান হামলায় এবং পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে আমাদের কয়েকজন সহযোদ্ধা শহীদ হন। অনেকে আহত হন।

'যুদ্ধের পর আমরা যারা বেঁচে যাই, তারা ভারতে চলে যাই। কিছুদিন পর আমি জানতে পারি, পাকিস্তানি সেনারা ওই স্থান থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়েছে।'

জাকির হোসেন চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা উইংয়ের (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মনিরুজ্জামানের (বীর বিক্রম) নেতৃত্বে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর ভারতে আশ্রয় নেন। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। চৌগাছা, ছুটিপুর, হিজলি ও বেনাপোলসহ আরও কয়েক, জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল কবির, বীর প্রতীক

গ্রাম ফাল্গুনকড়া, উপজেলা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা। বাবা সিরাজুল ইসলাম মজুমদার, মা শামসুন নাহার (টুনি)। স্ত্রী শামিমা ইসলাম। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৯। গেজেটে নাম জামাল।

জামাল কবির ১৯৭১ সালে কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে তিনি কালবিলম্ব না করে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধের পর ভারতের আগরতলায় যান। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দারের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর নিহত) সঙ্গে। ক্যাপ্টেন হায়দার তাঁকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রশিক্ষণ চলাবস্থায় জামাল কবির কিশোরগঞ্জে যান। তিনি সেখান থেকে ক্যাপ্টেন হায়দারের বাবা-মা ও বোন লেফটেন্যান্ট ডা. সিতারা বেগমকে (বীর প্রতীক, পরে ক্যাপ্টেন) ভারতে নিয়ে যান। প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তিনি প্রথম অপারেশন করেন কুমিল্লায়। পরবর্তী সময়ে তিনি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানির অধীনে যুদ্ধ করেন।

জামাল কবির প্রথম অপারেশন করেন ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে। এটি ছিল গেরিলা অপারেশন। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন বাহার উদ্দিন রেজা (বীর প্রতীক), সাকি চৌধুরী ও তাহের নামে একজন। তাঁরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে শহরের কেন্দ্রে গ্রেনেড ছোড়েন। প্রচণ্ড শব্দে তা বিস্ফোরিত হয়। প্রায় একই সময়ে অন্যান্য উপদলও বিভিন্ন স্থানে গ্রেনেড ছোড়ে।

প্রতিটি স্থানেই ছিল পাকিস্তানি সেনা বা তাদের সহযোগী। বিস্ফোরিত গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের আঘাতে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগী হতাহত হয়। এই অপারেশন ছিল কুমিল্লায় অবস্থানরত পাকিস্তানিদের জন্য বিরাট এক ঝাঁকুনি। কারণ এ সময় কুমিল্লা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিল। বিস্ফোরণের শব্দে সেদিন গোটা শহর কেঁপে ওঠে। লোকজন চারদিকে ছোটাছুটি করে নিরাপদ স্থানে যায়। দু-তিন দিন শহর প্রায় জনশূন্য ছিল। তখন অনেক লোক শহর ছেড়ে চলে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামিলউদ্দীন আহসান, বীর প্রতীক

গাবতলী, বগুড়া। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ৪৩৫, সড়ক ৩০, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা মুহাম্মদ জসিমউদ্দীন, মা হুসন আরা জেসমিন। স্ত্রী বীথি জামিল। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪।

শীতের রাত। ঘন কুয়াশায় ঢাকা প্রান্তর। তখন রমজান মাস। মুক্তিযোদ্ধারা মধ্যরাতে সেহরি খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের উদ্দেশে। তাঁদের নেতৃত্বে জামিলউদ্দীন আহসান (জামিল ডি আহসান)। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র তারা গোলাগুলি শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ করলেন।

এর মধ্যে ভোরের আলো ফুটেছে। জামিলউদ্দীন আহসান ৭ নম্বর প্লাটুন নিয়ে ৮ নম্বর প্লাটুনের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা মর্টার, রকেট লঞ্চার দিয়ে সালদা নদীর অন্য পাশে রেলস্টেশন ও নয়নপুর বাজারে আক্রমণ চালালেন। ৮ নম্বর প্লাটুনের মেশিনগান পাকিস্তানি সেনাদের রেলস্টেশনের মেশিনগান পোস্ট অকার্যকর করে দিল। মুক্তিবাহিনীর মর্টার ও আর্টিলারি 'মুজিব ব্যাটারি'র অবিরাম ও অব্যর্থ শেলিং তাদের তটস্থ করে ফেলল।

ক্রমেই বেলা বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। তারা অবস্থান ছেড়ে পালাতে শুরু করল। জামিলউদ্দীন আহসান দেখতে পেলেন, আহত ও নিহত সেনাদের নিয়ে শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ধাওয়া করতে পারলেন না। কারণ, মাঝে নদী। তিনি মুক্তিবাহিনীর অন্য দলকে জানালেন পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করার জন্য। সম্মিলিত সাঁড়াশি আক্রমণে দুপুরের মধ্যেই সালদা নদী ও নয়নপুর বাজার এলাকা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল।

এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ১৯ নভেম্বরে সালদা নদীতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত সালদা নদী। ১৯৭১ সালের জুন-জুলাই থেকে এখানে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩০ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট মুখোমুখি শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল। দুই অবস্থানের মধ্যে ছিল সালদা নদী ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ। মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সেদিনকার যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অসংখ্য সদস্য হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাঁচজন পাকিস্তানি সেনার মৃতদেহ উদ্ধার ও তিনজন রাজাকারকে বন্দী করেন। অনেক অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ তাঁরা দখলে নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে এলএমজিম্যান সিরাজ শহীদ এবং একজন আহত হন।

জামিলউদ্দীন আহসান ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেলাঘরে গিয়ে তাতে যোগ দেন। জুনের শেষে প্রথম বাংলাদেশ ওয়ারকোর্সে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রশিক্ষণ শেষে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে ৩ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। এ সময় চুনারুঘাট চা-বাগানের যুদ্ধে অংশ নেন। পরে ২ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি ও নাজিরহাটে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহাঙ্গীর হোসেন, বীর প্রতীক

দিনারের পোল, ইউনিয়ন চর কাউয়া, সদর, বরিশাল।
বাবা আবদুল মজিদ মোল্লা, মা ফাতেমা বেগম।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৬০।
শহীদ মার্চ ১৯৭১। গেজেটে শহীদ দেখানো হয়নি।

জাহাঙ্গীর হোসেন ১৯৬৯ সালে ইপিআরে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে নবীন সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন রামগড়ে।

২৫ মার্চ মধ্যরাতেই রামগড়ে অবস্থানরত বাঙালি ইপিআর সদস্যরা চট্টগ্রাম থেকে ওয়্যারলেসে মেসেজ পেয়ে বিদ্রোহ করেন। ২৬ মার্চ সকালে তাঁরা কুমিরায় অবস্থান নেন। সেখানে ২৬-২৮ মার্চ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে জাহাঙ্গীর হোসেন শহীদ হন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ড ও ভাটিয়ারির মাঝামাঝি কুমিরা। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার অন্তর্গত। চট্টগ্রামের জিরো পয়েন্ট থেকে কুমিরার দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রাথমিক প্রতিরোধে কুমিরা স্থানটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেখানে তিন দিন ধরে যুদ্ধ হয়।

চট্টগ্রামে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম, পরে মেজর) ২৬ মার্চ সকালে জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি দল কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি রামগড়ে অবস্থানরত ইপিআরদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে বলেন। তাঁর নির্দেশ পেয়ে ইপিআর সদস্যরা দ্রুত ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর সেতুর দিকে রওনা হন। কিছুদূর যাওয়ার পর ইপিআর সদস্যরা জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা শুভপুর সেতু অতিক্রম করে চলে গেছে। তখন তাঁরা দ্রুত কুমিরায় পৌঁছে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। সন্ধ্যার দিকে সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল হাজির হয়।

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের বিভিন্ন স্থানে ছিল ব্যারিকেড। পাকিস্তানি সেনারা ব্যারিকেড অপসারণ করে অগ্রসর হচ্ছিল। সে জন্য তাদের শুভপুর সেতু অতিক্রম করার পরও কুমিরায় পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। কুমিরাতেও ছিল ব্যারিকেড।

সন্ধ্যা সাতটা ১৫ মিনিটের দিকে কুমিরার ব্যারিকেডের কাছে এসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়িবহর থেমে যায়। পাকিস্তানি সেনারা ব্যারিকেড অপসারণে ব্যস্ত। ওই সুযোগে ইপিআরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান। আকস্মিক আক্রমণে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। সেদিন প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়।

পরদিন সেখানে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। সারা দিন থেমে থেমে যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদের জোগান ক্রমশ কমে যায়। তার পরও তাঁরা শক্তভাবে তাঁদের অবস্থান ধরে রাখেন। শেষ দিন অর্থাৎ ২৮ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়। সড়ক ছেড়ে তারা ডান-বাঁ দিক দিয়ে এবং নৌবাহিনীর সাহায্যে সাগর থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জাহাঙ্গীর হোসেনসহ ১৪ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং অনেকে আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড, বীর প্রতীক

ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ডের স্বদেশ অস্ট্রেলিয়া।
জন্ম নেদারল্যান্ডের (হল্যান্ড) আমস্টারডামে।
বাবা, মা, স্ত্রীর নাম জানা যায়নি।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৭। মৃত্যু ২০০১।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন এমন বিদেশির সংখ্যা কম নয়। তাঁদের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী নাম ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড। ১৯৭১ সালে তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন টঙ্গীর বাটা শু কোম্পানিতে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কিছুদিন পর ওডারল্যান্ড সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের। বাটা শু কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তাঁর বাংলাদেশের সর্বত্র যাতায়াতের প্রায় অবাধ সুযোগ ছিল। পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে। বেসরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গেও তিনি একইভাবে সখ্য গড়ে তোলেন।

এ সুযোগে তিনি সব ধরনের 'নিরাপত্তা ছাড়পত্র' পেয়ে যান এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৎপরতা ও পরিকল্পনা গোপনে পাঠাতে থাকেন ২ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে। একই সঙ্গে টঙ্গীর বাটা শু কোম্পানির কারখানা প্রাঙ্গণে স্থাপন করেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গোপন ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কারখানায় আশ্রয় নিয়ে আশপাশে গেরিলা অপারেশন করতে থাকেন। এর পাশাপাশি অস্ত্র সংগ্রহ, চিকিৎসাসামগ্রী, আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ নানাবিধ কাজ ও প্রশিক্ষণেও সহযোগিতা করেন।

AMARBOI.COM

মুক্তিযুদ্ধে এ এস ওডারল্যান্ডের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। ১৯৭১ সালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদেরই একজন হিসেবে। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাঁর হয়নি। ১৭ বছর বয়সে জীবিকার প্রয়োজনে বাটা শু কোম্পানিতে ছোট এক চাকরিতে যোগ দেন। কিছুদিন পর নাম লেখান 'ডাচ্ ন্যাশনাল সার্ভিস'-এ। বছর খানেক পর নেদারল্যান্ড জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন ওডারল্যান্ড নেদারল্যান্ডের হয়ে যুদ্ধে অংশ নেন ও বন্দী হন। পরে যুদ্ধশিবির থেকে পালিয়ে যোগ দেন গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনে। এ সময় তিনি গুপ্তচরের কাজ করেন। পরে আবার সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে অসম সাহস ও বীরত্বও প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জার্মানদের নৃশংসতা, বন্দিশিবিরে অবর্ণনীয় কষ্ট ইত্যাদিই ওডারল্যান্ডকে সাহসী, প্রতিবাদী ও মানবতাবাদী করে তোলে। তাঁর এই মনোভাব মনের গভীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। ৫৪ বছর বয়সে তিনি আবার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।

ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড ১৯৭৮ সালে বাটা শু কোম্পানি থেকে অবসর নিয়ে ফিরে যান স্বদেশভূমি অস্ট্রেলিয়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাজুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম মণিঅন্ধ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ৭১১, ডেন্ডাবর, নতুন পাড়া, সাভার, ঢাকা। বাবা মো. আলী আমজাদ ভূঁইয়া, মা হামিদা খাতুন। স্ত্রী স্বপ্নাহার বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৪৩।

৩১ জুলাই ১৯৭১। গভীর রাত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। একটু আগেও ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। তখন কমেছে। এর মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে তাজুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা যেতে থাকলেন এফইউপিতে। অদূরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ চালাবেন। তাজুল ইসলাম হেভি মেশিনগানের চালক। তাঁর সঙ্গে আছে আরও চারজন। এ সময় ভারতীয় অবস্থান থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে শুরু হলো দূরপাল্লার আর্টিলারি গোলাবর্ষণ।

গোলাবর্ষণের তীব্রতায় চরাচর কেঁপে উঠল। কয়েকটি গোলা এসে পড়ল মুক্তিবাহিনীর এফইউপিতে। নিজেদের গোলায় শহীদ ও আহত হলেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। এফইউপিতে গোলা পড়ায় তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও শুরু করল পাল্টা গোলাবর্ষণ।

তাজুল ইসলাম এরপর 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে সহযোদ্ধাদের সহযোগিতায় মেশিনগান দিয়ে গুলি করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকলেন সামনে। চারদিকে মাইনফিল্ড ও কাঁটাতারের বেড়া। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে তাঁরা সাহসের সঙ্গে মাইনফিল্ড ও কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে ঢুকে পড়লেন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার মধ্যে।

তাঁদের সাহস ও বীরত্ব দেখে পাকিস্তানি সেনারা হতভম্ব। তারা প্রবলভাবে বাধা দিতে থাকল। তাজুল ইসলামদের মেশিনগানের গুলিতে হতাহত হলো অনেক পাকিস্তানি সেনা। এরপর তারা পিছু হটতে লাগল। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের বিরাট অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এল। এ সময় আবার বিপর্যয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের দলনেতা (সালাহউদ্দীন মমতাজ, বীর উত্তম) শহীদ হলেন। একটু পর তাজুল ইসলামের দলনেতাও (ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, বীর বিক্রম, পরে মেজর) গুরুতর আহত হলেন।

এতে নেতৃত্বশূন্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বেশির ভাগ আবার বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এ ঘটনা ঘটে জামালপুর জেলার কামালপুর বিওপিতে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৩১ জন শহীদ ও ৬৫ জন আহত হন। তাজুল ইসলাম অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন এই যুদ্ধে। তিনি নিজেও আহত হন। তাঁর বাঁ চোয়ালে গুলি ও ঘাড়ে শেলের স্প্লিন্টার লাগে। আহত অবস্থায়ই তিনি তাঁর আহত দলনেতাকে উদ্ধার করার জন্য কাভারিং ফায়ার দেন।

তাজুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ৩০ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট তাঁদের আক্রমণ করে। এ সময় তাঁরা যুদ্ধে যোগ দেন। বৃহত্তর সিলেটের ধলই, কানাইঘাট, এমসি কলেজসহ আরও কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন। ধলই ও এমসি কলেজের যুদ্ধে আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

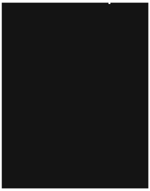

তাজুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম গার্ডপাড়া, ইউনিয়ন বাগানবাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। বাবা নাদেরুজ্জামান। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১১৮। শহীদ ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আখাউড়ায় ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর একটি দলে ছিলেন তাজুল ইসলাম। ৩ ডিসেম্বর তাঁরা আক্রমণ চালান আখাউড়ার পার্শ্ববর্তী আজমপুর রেলস্টেশনে। তখন সেখানে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে তাজুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সাহসিকতায় মুক্ত হয় আজমপুর রেলস্টেশন। পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সেদিন রক্তক্ষয়ী ওই যুদ্ধে তাঁদের বি কোম্পানির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট ইবনে ফজল বদিউজ্জামানসহ (বীর প্রতীক) আট-নয়জন সহযোদ্ধা শহীদ এবং ২০ জন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২২ জন হতাহত হয়।

আখাউড়ার পতনের পর তাজুল ইসলাম তাঁর দলের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যান। সেখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর নরসিংদী হয়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হন। পথে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাঁরা মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরীর (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে ঢাকায় পৌঁছান।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে তাজুল ইসলামের দলের অবস্থান ছিল ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তখন রেসকোর্স ময়দান)। সেখানে অবস্থানকালে তাঁদের দলের ওপর ২৯ জানুয়ারি নির্দেশ আসে মিরপুরে অভিযান চালানোর। মিরপুর তখনো বিহারিদের দখলে। এই অভিযানে গিয়ে তাজুল ইসলামসহ তাঁর সহযোদ্ধা অনেকে বিহারিদের পাল্টা আক্রমণে শহীদ হন।

স্বল্প পরিসরে এ ঘটনার বর্ণনা আছে মইনুল হোসেন চৌধুরীর *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য* বইয়ে। তিনি লিখেছেন, '২৯ তারিখে ক্যাপ্টেন হেলাল মোরশেদের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এক কোম্পানি সেনা মিরপুরে যান। রাত শেষে ৩০ জানুয়ারি সকালে পুলিশ এসে সেনাসদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরপর তাঁরা ১২ নম্বর সেকশনে যান।

'আনুমানিক বেলা ১১টার দিকে চতুর্দিকের বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে অতর্কিতে একযোগে সেনা ও পুলিশের ওপর বিহারিরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

'চারদিকের প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্যে পড়ে পুলিশ ও সেনারা হতাহত হন। তাঁরা পাল্টা আক্রমণের তেমন সুযোগই পাননি। লেফটেন্যান্ট সেলিম, সুবেদার মোমেন, নায়েক তাজুলসহ (ইসলাম) অনেকে ঘটনাস্থলে নিহত হন। কোম্পানি কমান্ডার হেলাল মোরশেদও আহত হন।'

তাজুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনর্গঠিত হয়ে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টর ও পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারামন বিবি, বীর প্রতীক

কাচারিপাড়া, রাজীবপুর, উপজেলা রাজীবপুর, কুড়িগ্রাম। বাবা আবদুস সোহবান, মা কুলসুম বিবি। স্বামী আবদুল মজিদ। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯৪। গেজেটে নাম মোছাম্মৎ তারামন বেগম।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর দীর্ঘ ২৫ বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন তারামন বিবি। তাঁর নাম ছিল শুধু গেজেটের পাতায়। ১৯৯৫ সালে প্রচারের আলোয় আসেন। তারামন বিবি মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরের একটি দলের সঙ্গে ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালের ঘটনা তাঁর জবানিতেই জানা যাক: 'আমাদের বাড়ি ছিল রাজীবপুরের আলেকচর শংকর-মাধবপুর ইউনিয়নে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ১৪। সে সময় দেশে শুরু হলো তোলপাড়। শয়ে শয়ে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। কে কোথায় যাচ্ছে জানি না। আমরাও পালিয়ে যাই কোদালকাঠিতে।

'একদিন, দিন-তারিখ মনে নাই, জঙ্গলে কচুর মুখি তুলছিলাম। একজন বয়স্ক মানুষ (মুহিফ হালদার), আমাকে বললেন, "তুমি আমাদের ক্যাম্পে কাজ করবা। ভাত রাইন্ধা দিবা। কী, পারবা না মা?" সেদিন কোথা থেকে যেন একটা শক্তি পেলাম। মনে হলো, এই তো সুযোগ। মাথার ওপর রক্ষা করার মতো কেউ নাই, যার ভরসায় বেঁচে থাকব। মরতে তো হবেই। যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করলে দোষের কী।

'তাঁকে বললাম, আফনে আমার মায়ের লগে কথা কন। উনি যাইবার দিলে যাইমু। সেই সন্ধ্যায় তিনি আমার মার কাছে যান। শুধু বিশ্বাসের ওপর আমার মা আমাকে তাঁর সাথে দেন।

'কোদালকাঠিতেই আমার প্রথম ক্যাম্পজীবন শুরু। রান্না করা, ডেক ধোয়া। অস্ত্র পরিষ্কার করা। একদিন আজিজ মাস্টার বললেন, পাকিস্তানি ক্যাম্পের খবর আনতে হবে। কোনো পুরুষ যেতে পারবে না। যেতে হবে আমাকে। তা-ও নদী (নদ) পার হয়ে। কথাগুলো শুইনাই কইলজাটা চিনচিন করে উঠল। রাজি হয়ে গেলাম, যা থাকে কপালে! পাগলির বেশে, ছেঁড়া কাপড় পরে যেতাম শত্রুর ক্যাম্পে।

'শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অস্ত্র চালানো শিখলাম। একদিন দুপুরবেলা। ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। ক্যাম্পের আমরা সবাই ভাত খাচ্ছিলাম। এ সময় আজিজ মাস্টার আমাকে পিছলা গাছে উঠতে বললেন। গাছে উঠে দুরবিন দিয়ে নদীর দিকে দেখতেই চোখ বড় হয়ে গেল। নদীতে গানবোট। কিসের আর ভাত খাওয়া। সেদিন বৃষ্টির মতো গুলি সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমি কখন যে স্টেনগান নিয়ে গুলি করতে শুরু করেছি খেয়াল করিনি। কনুই আর পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়া কত জায়গা যে পার হয়্যা গেছি। রক্ত বের হয়্যা গেছিল।

'স্বাধীনতার পর শুরু হলো আরেক জীবন। আম্মা-ভাইবোনদের খুঁজে পেলাম। থাকার জায়গা নাই। খাবার নাই। চরে আমরা ঘর বাঁধলাম। কাজ নিলাম মানুষের বাড়িতে। চরেই শুরু হলো আমাদের জীবন। চর ভাঙে, আমাদের ঘর ভাঙে। আবার ঘর বানাই। এভাবেই চলে যায় চব্বিশটা বছর।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম নিজ বাওড়, উপজেলা চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা সাইদুর রহমান, মা তহুরুন নাহার চৌধুরী।
স্ত্রী আনজুমা আখতার। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩১।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ দেখে তাহের আহমেদ মনে মনে ভাবলেন, দেশের দুর্দিনে চুপ করে বসে থাকবেন না। প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে। তারপর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। ২৫ মার্চের আগে থেকে অসুস্থ বাবা হাসপাতালে। ঢাকার বাসাবোর বাড়িতে মা-সহ তাঁরা সাত ভাইবোন। বড় ভাই তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বকাবকি করলেন। দমে গেলেন না তিনি। মা বুঝতে পেরে একদিন ১০০ টাকার দুটি নোট বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও, আমরা বুঝি শেষ হয়ে গেলাম।' মায়ের কথা শুনে তাহের আহমেদ মনে শক্তি পেলেন। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন ভারতের উদ্দেশে।

তাহের আহমেদ ১৯৭১ সালে ঢাকা কলেজের বিএসসির ছাত্র ছিলেন। ভারতে যাওয়ার পর প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে যোগ দেন। মূর্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ১১ নম্বর সেক্টরের ঢালু সাবসেক্টরে। তিনি প্রথমে একটি কোম্পানির অধিনায়ক (পরে সাবসেক্টর অধিনায়ক) ছিলেন। বুরেরচর, নকলা, তেলিখালীসহ আরও কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন।

বুরেরচর যুদ্ধে তাহের আহমেদ যথেষ্ট রণকৌশল প্রদর্শন করেন। শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের কাছে বুরেরচর। জামালপুরের বেগুনবাড়ী সেতু ধ্বংসের জন্য তাহের আহমেদের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে। চরের পাশে ছিল রেলস্টেশন।

তাহের আহমেদরা বুরেরচরে অবস্থানকালে ট্রেনে সেখানে একদল পাকিস্তানি সেনা আসে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাদের আক্রমণের। পরিকল্পনামতো বেলা ১১টায় তাঁরা একযোগে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারা ছিল বেড়িবাঁধের পূর্ব পাশে। আর তাঁরা ছিলেন পশ্চিমে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে অত্যন্ত সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ করেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যাহত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এরপর পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে নদীর পাড়ে সমবেত হয়। গ্রামবাসীর সহযোগিতা ছাড়া তাদের পক্ষে নদী অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এ সময় তাহের আহমেদ একটি কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি কয়েকজন গ্রামবাসীকে বলেন নৌকায় করে পাকিস্তানি সেনাদের পার করে দেওয়ার ভান করতে। নৌকা যখন মাঝনদীতে যাবে, তখন তাঁরা আক্রমণ চালাবেন। এর আগে তিনি গ্রামবাসীকে সংকেত দেবেন। সে সময় তাঁরা পানিতে ডুব দেবেন।

তাহের আহমেদের এই কৌশল সফল হয়। নৌকা মাঝনদীতে যাওয়ামাত্র গ্রামবাসী পানিতে ডুব দেন। তখন মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে সব সেনা নিহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোফায়েল আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম মিরপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর। বাবা বসিরউল্লাহ খান, মা আরেফাতুন নেছা। স্ত্রী আয়েশা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও সাত মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৮৫। মৃত্যু ২০০২।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিয়েছিলেন রামগড়ের চিকনছড়ায়। এই দলে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যাতে হেঁয়াকো থেকে রামগড়ে আসতে না পারে। রামগড়-চিকনছড়া খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত।

৩০ এপ্রিল বেলা একটায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চিকনছড়ায় আক্রমণ করে। সেনারা বেশির ভাগ ছিল কমান্ডো। ঝোড়োগতিতে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের ভেতরে ঢুকে ১০০ গজের মধ্যে এসে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। পরিখাগুলো ছিল বেশ অপরিসর। শত্রুর উপস্থিতিও তাঁরা টের পাননি। ফলে অতর্কিত এই আক্রমণে তাঁরা বেশ বিপাকে পড়ে যান। তাঁদের পক্ষে পাকিস্তানি সেনা, বিশেষত কমান্ডোদের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা ছিল বেপরোয়া প্রকৃতির।

আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও আহত হন। এতে তাঁদের একাংশের মধ্যে যথেষ্ট ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ভীতসন্ত্রস্ত মুক্তিযোদ্ধারা অধিনায়ক ও প্লাটুন কমান্ডারের (উপদলের দলনেতা) নির্দেশ ছাড়াই পিছু হটতে থাকেন। এতে যাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন, তাঁরা কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান।

AMARBOI.COM

তোফায়েল আহমেদ এ সময় তাঁর দলের সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করছিলেন। একপর্যায়ে দেখা গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর দল ছাড়া আর কেউ নেই বললেই চলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণে ক্রমশ তাঁদের অবস্থাও সংকটময় হয়ে পড়ে। তখন তাঁদেরও পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকল না।

সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে তোফায়েল আহমেদ বাধ্য হয়েই তাঁদের পিছু হটতে বললেন এবং তাঁদের নিরাপদ পশ্চাদপসরণের জন্য এ সময় তিনি নিজের জীবনের ওপর বিরাট একটা ঝুঁকিও নেন। তিনি তাঁর অস্ত্র দিয়ে গুলি করে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখেন। এই সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধারা পিছু হটে যান।

শেষে তিনি একা। তখন তিনি গুলি বন্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য দূরে ঢিল ছুড়তে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনারা শব্দ লক্ষ্য করে গোলাগুলি করছে। তিনি পিছু হটছেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলেন না। হঠাৎ গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে গড়িয়ে পড়লেন পাহাড়ি ছড়ায়।

তোফায়েল আহমেদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। ১৯৭১-এ জানুয়ারিতে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে বদলি হয়ে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানিতে যোগ দেন। এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনর্গঠিত হয়ে জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুদু মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণ গোবিন্দারখীল, সদর, পটিয়া, চট্টগ্রাম। বাবা বদিউর রহমান, মা রহমানা খাতুন। স্ত্রী ছামিরা শবেমেহেরাজ বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২২৮। মৃত্যু ২০০০।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আক্রমণ করেছে। প্রচণ্ড সেই আক্রমণ। বিপুল সেনা ও সমরাস্ত্র নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। এই আক্রমণ আকস্মিক, তবে অপ্রত্যাশিত নয়। মুক্তিযোদ্ধারা আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন। তাঁরা সাহসের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকলেন। শুরু হয়ে গেল ভয়াবহ যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনা, যারা আক্রমণে অংশ নিয়েছে, তারা বেশ দুঃসাহসী। মুক্তিযোদ্ধাদের সব প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তারা সামনে এগোতে থাকল। কোনো কোনো স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। সেটা দেখে পাকিস্তানি সেনারা বেশ উল্লসিত।

মুক্তিযোদ্ধাদের সব অবস্থানেই পাকিস্তানি সেনারা একযোগে আক্রমণ করেছে। একটি অবস্থানে কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে আছেন দুদু মিয়া। পাকিস্তানি সেনাদের দুঃসাহসিকতায় তিনি বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে আক্রমণ মোকাবিলা করে পাল্টা আক্রমণ করলেন।

কাভারিং ফায়ারের ছত্রচ্ছায়ায় তাঁদের অবস্থানের দিকে ক্রল করে এগিয়ে আসছিল কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। দুদু মিয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। ব্যাপক গোলাগুলিতে হতাহত হলো কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। থেমে গেল ওদের অগ্রযাত্রা। তখন তিনি আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এলাকা থেকে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষে ভোমরায়। সাতক্ষীরা জেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভোমরা। মার্চ-এপ্রিলের প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে খুলনা-সাতক্ষীরা ও যশোর এলাকার একদল প্রতিরোধযোদ্ধা সমবেত হয়েছিলেন ভোমরায়। তাঁরা বেশির ভাগ ছিলেন ইপিআর সদস্য। আর ছিলেন কিছুসংখ্যক স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের ইপিআর সদস্যরাই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

সেদিন ভোমরার যুদ্ধে দুদু মিয়াসহ কয়েকজন যথেষ্ট রণকৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই যুদ্ধ চলে ১৪-১৫ ঘণ্টা। শেষে পাকিস্তানি সেনারা নিহত ও আহত সহযোদ্ধাদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

দুদু মিয়া চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীনে। তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের ভোমরা সাবসেক্টরে। অক্টোবর মাসের শেষে এক যুদ্ধে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আট থেকে নয়টি গুলি লাগে। ভারতে তাঁর চিকিৎসা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দুদু মিয়ার পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ জানতেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাস পর পঙ্গু অবস্থায় তিনি বাড়ি ফেরেন। ১৯৭২ সালে পঙ্গু দুদু মিয়াকে বিডিআর থেকে অবসর দেওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেলোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম নিলাখাদ, উপজেলা আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবদুল হাই, মা রোকেয়া বেগম। স্ত্রী শাহানা বেগম।
তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৬। মৃত্যু ডিসেম্বর ২০১০।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান বেশ সুবিধাজনক স্থানে। বিপজ্জনক জেনেও মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ চালালেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলে আছেন দেলোয়ার হোসেন। সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়েও তাঁরা ব্যর্থ হলেন। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে শহীদ ও আহত হলেন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। এ ঘটনা ঘটে চন্দ্রপুরে ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর।

চন্দ্রপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত কসবা রেলস্টেশন থেকে তিন মাইল উত্তরে। এই যুদ্ধের বিবরণ আছে মেজর আইন উদ্দিনের (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল) লেখায়।

আইন উদ্দিন লিখেছেন: '১৮ নভেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার [জেনারেল] তুলে আমাকে বলেন যে তাঁরা যৌথভাবে চন্দ্রপুর লাটুমুড়া হিল আক্রমণ করবেন। সেখানে পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান করছিল।

'তিনি [ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তুলে] পরিকল্পনা করলেন, কিন্তু সে পরিকল্পনা আমার মনঃপূত হলো না। কারণ, চন্দ্রপুর গ্রামের সঙ্গেই ছিল লাটুমুড়া হিল [পাহাড়]। চন্দ্রপুর আক্রমণ করলে লাটুমুড়া হিল থেকে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের অতি সহজেই ঘায়েল করতে পারবে।

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে হলো। বাংলাদেশ বাহিনীর কোম্পানি পরিচালনা করেন লেফটেন্যান্ট খন্দকার আবদুল আজিজ [বীর বিক্রম, প্রকৃত নাম খন্দকার আজিজুল ইসলাম]। পরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ করে।

'এই আক্রমণে বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যরাই শহীদ হন বেশি। ভারতীয় বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার শিখ মেজর ও তিনজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৪৫ জন এবং মুক্তিবাহিনীর শহীদ হন ২২ জন। আমাদের কোম্পানি কমান্ডারও শহীদ হন। ২২ তারিখ রাতে চন্দ্রপুর আক্রমণ করলে সারা রাত যুদ্ধ হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনী শেষ পর্যায়ে পেছনের দিকে চলে যায়। আমাদের যৌথ বাহিনী যুদ্ধ করে চন্দ্রপুর দখল করে নেয়, কিন্তু পুনরায় পাকিস্তানি বাহিনী চন্দ্রপুর দখল করে।'

চন্দ্রপুরে দেলোয়ার হোসেন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর চোখের সামনে শহীদ হন কয়েকজন সহযোদ্ধা। তিনি নিজেও যুদ্ধের একপর্যায়ে আহত হন। আহত অবস্থায়ও যুদ্ধ চালিয়ে যান। একপর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা তাঁকে ফিল্ড হাসপাতালে পাঠান।

দেলোয়ার হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের গঙ্গাসাগর সাবসেক্টরে। পরে তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চন্দ্রপুর যুদ্ধের কয়েক দিন আগে কালাছড়া চা-বাগান আক্রমণেও তিনি অংশ নিয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেলোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম হুগলি, উপজেলা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
বাবা মো. ওয়াজেদ আলী পাটোয়ারী, মা সায়েরা খাতুন।
স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩৪।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বৃহত্তর সিলেট জেলা মুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে অভিযান শুরু করেন। এক দল (অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এক ব্যাটালিয়ন শক্তি) অগ্রসর হয় ভারতের কৈলাসশহর থেকে মৌলভীবাজার জেলার শমশেরনগর অক্ষ ধরে। এই দলে ছিলেন দেলোয়ার হোসেন।

এ অক্ষপথে বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি ও প্রতিরক্ষা। ১ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা আলীনগর চা-বাগানে (মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত) আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ করে। দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে পাকিস্তানিদের চরম ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর তারা পিছু হটে ভানুগাছে আশ্রয় নেয়।

দেলোয়ার হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের অনুসরণ করে উপস্থিত হন ভানুগাছে। এখানে আগে থেকেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা। স্থানটি ছিল ভৌগোলিক ও সামরিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

৬ ডিসেম্বর সকালে মুক্তিযোদ্ধারা ভানুগাছে আক্রমণ করেন। সারা দিন ধরে এখানে যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনারা মরিয়া হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। দেলোয়ার হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধারা এতে বিচলিত হননি। সাহসের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করেন। তাঁদের বীরত্বে বিপর্যস্ত পাকিস্তানিরা পরদিন পালিয়ে যায়।

ভানুগাছে দেলোয়ার হোসেন বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর বীরত্বে পাকিস্তানিদের বেশ ক্ষতি হয়। যুদ্ধ চলাবস্থায় সন্ধ্যায় (৬ ডিসেম্বর) তিনি আহত হন। পাকিস্তানিদের ছোড়া একটি গুলি তাঁর গালে লাগে। এতে তাঁর চোয়াল ক্ষতিগ্রস্ত ও কয়েকটি দাঁত পড়ে যায়। তার পরও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাননি। অবশ্য একটু পর তাঁর অবস্থার অবনতি হয়ে পড়ে। তখন তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত ফিল্ড চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান।

দেলোয়ার হোসেন চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেক্টরের অধীন ১১ উইংয়ের (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানিতে। এর অবস্থান ছিল হালিশহরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। হালিশহর, পাহাড়তলী, কালুরঘাটসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধ করেন।

কালুরঘাট যুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর বাঁ পায়ে গুলি লাগে। এ সময়ও তিনি আহত অবস্থায় অনেকক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। কালুরঘাটের পতন হলে গ্রাম-চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়ার পর ভারতে যান। এরপর ১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নকশী বিওপি, উলিপুর, দক্ষিণগুল চা-বাগান, সোনারুপা চা-বাগানসহ আরও কয়েকটি স্থানে তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম বাংগরা, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বর্তমান ঠিকানা গন্ধমতী, কোটবাড়ী, সদর, কুমিল্লা।
বাবা মুন্সি ওয়ালী মিয়া, মা রোকেয়া বেগম।
স্ত্রী রেণু আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২১৮।

মুহুর্মুহু গুলির শব্দে চারদিকের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। নজরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধারা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা বসে থাকল না। তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা অবস্থান ছেড়ে পিছু হটতে থাকল। এ ঘটনা ভুরুঙ্গামারীর। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে।

ভুরুঙ্গামারী কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত। জেলা সদরের সর্ব উত্তরে। ভারতের আসাম রাজ্যের সীমানায়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভুরুঙ্গামারীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলে। থানায় ছিল একটি অবস্থান। পুলিশের পাশাপাশি সেখানে ছিল কিছু পাকিস্তানি সেনা। এ ছাড়া সহযোগী হিসেবে ছিল একদল ইপিসিএএফ ও রাজাকার।

AMARBOI.COM

পরিকল্পনা অনুযায়ী, মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে এই আক্রমণে অংশ নেন। দুটি দল আক্রমণকারী ও একটি কাট অফ পার্টি হিসেবে। তাঁরা ছিলেন ৪০ জন। নজরুল ইসলাম ছিলেন আক্রমণকারী দলে।

নজরুল ইসলামসহ কয়েকজন সাহসের সঙ্গে গুলি করতে করতে থানার মধ্যে ঢুকে পড়েন। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা গ্রেনেড ও গুলি ছুড়ে নজরুল ইসলামদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যান। তাঁদের সাহস ও বীরত্বে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা অবস্থান ছেড়ে পিছু হটতে শুরু করে।

মুক্তিযোদ্ধারা সাময়িকের জন্য থানা দখল করেন। তাঁদের হস্তগত হয় বিপুলসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। একটি বাংকার থেকে তাঁরা উদ্ধার করেন ১১ জন নির্যাতিত নারীকে।

সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে একজন আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা থানা দখল করতে সক্ষম হলেও তা ধরে রাখার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। কারণ, আশপাশেই ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। পুনরায় সংগঠিত হয়ে তারা আক্রমণ চালাবে। সে জন্য মুক্তিযোদ্ধারা সকাল হওয়ার আগেই নদী অতিক্রম করে ভারতে চলে যান।

নজরুল ইসলাম চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন লালমনিরহাট জেলার মোগলহাট বিওপিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে। ফুলবাড়ী, অনন্তপুর, গঙ্গারহাট; শিমুলবাড়িসহ আরও কয়েক স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম পানাইল, উপজেলা আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।
বাবা মোহাম্মদ মমিনউদ্দীন, মা হাজেরা বেগম।
স্ত্রী রওশন আরা বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৮৭।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে চাকরি করতেন নজরুল ইসলাম (এ এন এম নজরুল ইসলাম)। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের (তখন পশ্চিম পাকিস্তান) করাচিতে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানা যাক তাঁর একান্ত নিজস্ব বয়ানে :

'১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত আমি করাচি ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পরিস্থিতির কারণেই তখন যোগ দিতে পারিনি। জুন মাসের প্রথমার্ধে আমার বাবা স্ট্রোকে মারা যান। তখন কর্তৃপক্ষ আমাকে ছুটি দেয়। আমি বাড়ি আসার পরদিন কাশিয়ানী স্কুলের হেডমাস্টার আবদুর রউফ এসে আমাকে বলেন, "কিছু ছেলেপেলেকে রাজাকারে ভর্তি করেছি, তুমি তাদের ট্রেনিং দেও।" আমি তাঁকে এটা-ওটা বলে বিদায় দিয়ে ওই দিন বিকেলেই ভারতের উদ্দেশে রওনা দিই।

'ভারতে যাওয়ার পর কে এম ওবায়দুর রহমানের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে ৮ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার্স কল্যাণীতে পাঠান। ওখানে আমি প্রশাসনিক কাজসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে থাকি।

'আমি সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স বা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নিয়ে যেতাম। এ কাজ করার সময় বয়রা সাবসেক্টর কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

'কয়েক দিন পর নাজমুল হুদা আমাকে একটা ক্যাম্পের দায়িত্ব দেন। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে ভারতে প্রশিক্ষিত বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের ইনডাকশন করা হয়। দেশের ভেতরে যাওয়ার আগে তাঁরা এই ক্যাম্পে দু-তিন দিন অবস্থান করেন। তারপর ক্যাম্প থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশের ভেতরে যান। তাঁদের দেখভাল করার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল।

'অবশেষে নভেম্বর মাসে আমি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই। এ সময় যশোর জেলার বানগাতি বাজার ও মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানা আক্রমণে সরাসরি অংশ নিই।

'১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করার পরও ভাটিয়াপাড়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকাররা আত্মসমর্পণ করেনি।

'খন্দকার নাজমুল হুদা খবর পেয়ে যশোর থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধাসহ সেখানে রওনা দেন। আমরাও লোহাগড়া থেকে ভাটিয়াপাড়ার উদ্দেশে রওনা দিই। আমরা একত্রে আক্রমণ চালাই।

'তুমুল যুদ্ধের পর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণে রাজি হয়। তখন খন্দকার নাজমুল হুদার নির্দেশে তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমি ক্যাম্পে যাই। ভেতরে ঢুকে আমি অবাক হই। পাকিস্তানিরা মজুত রেখেছিল পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ও রসদ। আর ছিল অনেক রাজাকার, কয়েকজন নারী ও কাশিয়ানী স্কুলের সেই হেডমাস্টার আবদুর রউফ। অবশেষে ৮৫ জন পাকিস্তানি সেনা-মিলিশিয়াসহ তাদের সহযোগী সবাই আত্মসমর্পণ করে। তাদের আমরা বন্দী করে যশোরে পাঠাই।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসির উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম আন্দিবাড়ি, উপজেলা নাগরপুর, টাঙ্গাইল।
বাবা গদু শেখ, মা রূপজান বেগম। স্ত্রী বুলবুলি বেগম।
তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১১৩। মৃত্যু ১৯৭৯।

মুক্তিযোদ্ধারা সবাই প্রস্তুত। অধিনায়কের নির্দেশ পাওয়ামাত্র তাঁরা একযোগে ছুটে গিয়ে আক্রমণ চালাবেন পাকিস্তানি সেনাদের। তার আগে পাকিস্তানি সেনাদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য চলছে গোলাবর্ষণ। একটু পর গোলাবর্ষণ শেষ হলো। অধিনায়কের নির্দেশ পাওয়ামাত্র নাসির উদ্দিন তাঁর অধীন সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন পাকিস্তানি অবস্থানের উদ্দেশে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানি অবস্থান থেকেও শুরু হয়েছে গোলাগুলি। নাসির উদ্দিন ভয় না পেয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেলেন সামনে। তাঁর পেছনে সহযোদ্ধারা। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে।

এমন অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব পাকিস্তানি সেনারা। মুক্তিযোদ্ধাদের মুহুর্মুহু আক্রমণে তাদের মনোবল ভেঙে পড়ার উপক্রম। তখন নাসির উদ্দিন সহযোদ্ধাদের নিয়ে আরও সাঁড়াশি আক্রমণ চালালেন। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো ভেঙে পড়তে থাকল। দিশাহারা পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান ছেড়ে পেছনে পালিয়ে গেল।

এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত সীমান্ত এলাকা কসবায়। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কসবার প্রতিরক্ষা অবস্থান।

সেদিন যুদ্ধে নাসির উদ্দিন যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ২৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। আহত হয় ১৮ জন। হস্তগত হয় ১১টি এলএমজি, একটি সিগন্যাল পিস্তল, ৪০টি গ্রেনেড (এইচই ৩৬), তিনটি এনারগা গান, ৪৪টি প্লাস্টিক মাইন, একটি ম্যাপ ও দুটি ব্যাংক ব্যাজ। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে চারজন শহীদ ও ১৫ জন আহত হন।

পরদিন পাকিস্তানি সেনারা পুনর্গঠিত হয়ে কসবা দখলের চেষ্টা চালায়। তাদের একটি দল একটি ছোট নালার পশ্চিম তীরে দ্রুত অবস্থান নেয়। তখন নাসির উদ্দিন তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলের ওপর আক্রমণ চালান। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনাদের ওই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মুক্তিযোদ্ধাদের আরও কয়েকটি দল এসে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। তখন পাকিস্তানি সেনারা পুরোপুরিভাবে পিছু হটে যায়।

নাসির উদ্দিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। মার্চ মাসের শুরুতে এই রেজিমেন্টে বেশির ভাগ সেনাকে সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরে। পরে কে ফোর্সের নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগস্ট মাসের শেষে নবম ইস্ট বেঙ্গল গঠিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরউদ্দীন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম সাতাইহাল, ইউনিয়ন গজনাইপুর, উপজেলা নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা ৪৩৭/৩ পূর্ব গোড়ান, ঢাকা। বাবা তমিজউদ্দীন আহমেদ, মা তাহমিনা বেগম। স্ত্রী সুলতানা তাইবুন নাহার। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫৩।

শেষ রাত। নূরউদ্দীন আহমেদসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা নিঃশব্দ অবস্থান নিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের ৫০-৬০ গজ দূরে। সময় গড়াতে লাগল। ভোর হচ্ছে। অধিনায়ক তাঁদের আক্রমণ শুরু করার সংকেত দিলেন। নৈঃশব্দ্যকে খান খান করে ভেঙে একযোগে গর্জে উঠল প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। গোলাগুলির শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। ঘণ্টা দুই যুদ্ধ করে বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধাই নিরাপদে পেছনে সরে গেলেন। তাঁদের আকস্মিক আক্রমণে হতাহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। এ ঘটনা ঘটে দিলকুশা চা-বাগানে ১৯৭১ সালের মধ্য জুলাইয়ে।

দিলকুশা চা-বাগান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার অন্তর্গত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে চার মাইল দূরে। সীমান্তের ওপারে কুকিতলে ছিল মুক্তিবাহিনীর ৪ নম্বর সেক্টরের একটি সাবসেক্টর। এই সাবসেক্টরের গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেদিন তাঁরা দিলকুশা চা-বাগানে আক্রমণ করেন। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক ঘাঁটি। এই ঘাঁটির মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সীমান্ত এলাকায় নজরদারি করত।

মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দলের সমন্বয়ে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়। তাঁরা বিভক্ত ছিলেন তিনটি অ্যাসল্ট পার্টি ও তিনটি কাট অফ পার্টি হিসেবে। অ্যাসল্ট পার্টি বা আক্রমণকারী দলে ছিলেন নূরউদ্দীন আহমেদ। পরিকল্পনামাফিক কুকিতল থেকে রওনা হয়ে রাত দুইটায় তাঁরা লাঠিটিলায় পৌঁছান। সেখান থেকে ভোর পাঁচটার আগেই দিলকুশা চা-বাগানে যান। তাঁরা অবস্থান নেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ৫০-৬০ গজ দূরে। অ্যাসল্ট পার্টির মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালান। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। কয়েকজন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

দিলকুশা চা-বাগান দখল করা মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য ছিল না। অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। আক্রমণ করেই মুক্তিযোদ্ধাদের সেখান থেকে সরে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সরে যেতে পারেননি। নিজেদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি হওয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকক্ষণ মুখোমুখি যুদ্ধ করতে হয়। মুখোমুখি যুদ্ধে নূরউদ্দীন আহমেদ যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুক্তিবাহিনীরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

নূরউদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি ভারতে প্রশিক্ষণ নেন। যুদ্ধ করেন ৪ নম্বর সেক্টরের কুকিতল ও জালালপুর সাবসেক্টরের অধীনে। লাঠিটিলা, ছোটলেখা, কানাইঘাটসহ আরও কয়েকটি স্থানের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম আকানিয়া, উপজেলা কচুয়া, চাঁদপুর।
বাবা আবদুস সোবহান, মা রায়েতুন নেছা। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৫২। শহীদ ২৩ নভেম্বর ১৯৭১।

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত অমরখানা-জগদলহাট। ২২ নভেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অমরখানা অবস্থানে আক্রমণ চালায়।

এ আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নূরুল হকের দলসহ মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দল (কোম্পানি) অংশ নেয়। আক্রমণের আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করে। এর সহায়তায় নূরুল হকসহ মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের তীব্র আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিছু হটে যায়। অমরখানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

অমরখানা দখলের মধ্য দিয়ে ওই এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। অধিনায়কের নির্দেশে নূরুল হকসহ উদ্দীপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা পরদিনই (২৩ নভেম্বর) জগদলহাটে আক্রমণ করেন। এবারও ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁদের সহযোগিতা করে। কিন্তু এদিন মুক্তিযোদ্ধারা সফলতা অর্জন করতে পারেননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তীব্রভাবে তাঁদের প্রতিরোধ করে। তখন সেখানে দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

এ যুদ্ধে নূরুল হকসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জগদলহাটের ঘাঁটি ছিল বেশ শক্ত। নূরুল হকসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে মূল প্রতিরক্ষায় ঢুকে পড়েন। তাঁর দুই পাশের দু-তিনজন সহযোদ্ধা মাইন ও গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ ভাঙার জন্য তিনি গুলি করতে করতে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও প্রতিশোধের নেশায় সাহসী নূরুল হক এগিয়ে যান, কিন্তু সফল হতে পারেননি। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলি লাগে তাঁর বুকে। নিমেষে নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

সেদিন যুদ্ধে নূরুল হকসহ কয়েকজন সহযোদ্ধার শহীদ হওয়ার ঘটনা মুক্তিযোদ্ধাদের মনে প্রতিশোধের স্পৃহা আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলে। তাঁরা পরদিন (২৪ নভেম্বর) নতুন উদ্যমে জগদলহাটে আক্রমণ চালান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১২ রাজপুত রেজিমেন্টের একটি দল (কোম্পানি) তাঁদের সহযোগিতা করে। সম্মিলিত আক্রমণে দিশেহারা পাকিস্তানি সেনারা পঞ্চগড়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। তিন দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে নূরুল হকসহ পাঁচ-ছয়জন শহীদ এবং প্রায় ৩৭ জন আহত হন।

শহীদ নূরুল হক চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর সেক্টরের ঠাকুরগাঁও উইংয়ের অধীনে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর ৬ নম্বর সেক্টরের ভোজনপুর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন তিনি। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস, দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজলুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম গঙ্গাজলের খাদিমান, ইউনিয়ন সুলতানপুর, উপজেলা জকিগঞ্জ, সিলেট। বাবা আজাদ আলী। স্ত্রী বেলা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২০২। মৃত্যু ডিসেম্বর ১৯৯৯।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে কাশীপুর। যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। জেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ দিক। তখন ওই এলাকা মুক্ত। সীমান্তের ওপারে ভারতের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধা শিবির। সেখানে আছেন ফজলুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে একদিন খবর এল, যশোর থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা (২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) কাশীপুরে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য সীমান্ত চৌকি দখল এবং সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করা। পাকিস্তানি সেনাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে সীমান্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচল একেবারে সীমিত হয়ে পড়বে। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক সিদ্ধান্ত নিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চেষ্টা নস্যাৎ করতে হবে। তিনি আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে শুরু হলো প্রস্তুতি। সুবেদার মনিরুজ্জামানের (বীর বিক্রম, পরে অন্য যুদ্ধে শহীদ) নেতৃত্বাধীন দলের ওপর দায়িত্ব পড়ল অগ্রসরমাণ পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দেওয়ার। এ দলের সদস্য ছিলেন ফজলুল হক। তাঁরা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে রওনা হলেন কাশীপুরের উদ্দেশে।

ফজলুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা কাশীপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হলো পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রগামী দল। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আক্রমণ করলেন। পাকিস্তানি সেনারাও প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। পাকিস্তানি সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের ধারণার চেয়েও বেশি। এতে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলেন, তবে বিচলিত হলেন না। ফজলুল হক ও আরও কয়েকজন মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন।

প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে খবর গেল পাকিস্তানি সেনা অনেক। দ্রুত সেখান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলো মুক্তিযোদ্ধাদের আরও দুটি দল। তাঁরা সীমান্ত চৌকির ডান দিক দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালালেন।

যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারাই জয়ী হলেন। বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। শেষে হতাহত অনেককে ফেলে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যায়। জীবিত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে। একজনকে ফজলুল হকই আটক করেন।

ফজলুল হক চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীন চুয়াডাঙ্গা উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন তিনি। পরে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের অধীন বয়রা সাবসেক্টরে। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। একবার তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্তসংলগ্ন একটি পাকিস্তানি ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে নিহত হয় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী। ওই শিবির থেকে তাঁরা দুজন বীরাঙ্গনা নারীকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজলুল হক, বীর প্রতীক

কলেজপাড়া, বেতকা, টাঙ্গাইল। বাবা ওসমান গনি তালুকদার, মা লাইলি বেগম। স্ত্রী নাজমা হক। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৫।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিক। টাঙ্গাইলে যমুনা নদীতীরবর্তী এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন দলনেতা খবর পেলেন, নারায়ণগঞ্জ থেকে কয়েকটি জলযান রংপুরে যাচ্ছে। তাতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। প্রতিটি জলযানেই আছে পাকিস্তানি সেনা। তারা পাহারায় নিযুক্ত।

ফজলুল হকের দলসহ অন্য দলের যোদ্ধারা প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান নিলেন মাটিকাটায়। তাঁদের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন হাবিবুর রহমান। টাঙ্গাইল জেলার ভুঞাপুরের দক্ষিণের একটি গ্রাম মাটিকাটা। এর পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদী।

১১ আগস্ট বেলা আনুমানিক ১১টা। এ সময় জলযানগুলো চলে এল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের কাছাকাছি। তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন নদীর পূর্ব পাড়ে। জলযানগুলো সেই পাড়ের পাশ দিয়েই এগিয়ে আসছে। নদীর পাড় থেকে একটু দূরে চর। জলযানগুলো নদীর পাড় ও চরের মাঝ দিয়েই যাবে।

হাবিবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছেন, তিনি সংকেত দেবেন। তার আগে যেন কেউ গুলি না ছোড়ে। তাই ফজলুল হক ও অন্যরা অস্ত্রের ট্রিগারে আঙুল রেখে চুপচাপ আছেন। সময় এগিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে দুটি জলযান তাঁদের সামনে দিয়ে চলে গেল। সবাই অধীর উত্তেজনায়। কিন্তু সংকেত আসছে না। এ সময় বড় আকারের দুটি জলযান তাঁদের সামনে এল। মুক্তিযোদ্ধারা দেখলেন, তাতে মেশিনগান ফিট করা। কিন্তু সেখানে কোনো পাকিস্তানি সেনা নেই। তারা ডেকে শিথিল অবস্থায় গল্পগুজব করছে। মৃত্যু যে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা তাদের কল্পনাতেও নেই।

ঠিক তখনই সংকেত এল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ফজলুল হকসহ সবার অস্ত্র। মর্টার, এলএমজি, রাইফেলের গুলিবর্ষণ। একের পর এক রকেট লঞ্চারের রকেট পড়তে থাকল কেবিন ও ডেকে। হতাহত হলো পাকিস্তানি সেনাসহ কয়েকজন। বাকিরা প্রতিরোধের চেষ্টা না করে স্পিডবোটে চড়ে পালিয়ে গেল। পেছনে ছিল আরও তিনটি জলযান। সেগুলো গোলাগুলির শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে চলে গেল।

আক্রান্ত জলযানে ছিল অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের বাক্স। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামবাসী ও স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় অর্ধেক বাক্স নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হন। এরপর তাঁরা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে বাকি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ধ্বংস হয়ে যায়।

১৩ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মাটিকাটায় বিমান হামলা চালায়। তখন ফজলুল হক আহত হন।

ফজলুল হক ১৯৭১ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়া সা'দত কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার অনেক জায়গায় তিনি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারুক আহমদ পাটোয়ারী, বীর প্রতীক

গ্রাম হুগলি, উপজেলা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
বাবা সোনা মিয়া, মা রতুননেছা। স্ত্রী জাহানারা বেগম।
তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪২। শহীদ ২৯ জুলাই ১৯৭১।

পালিয়ে যাওয়া একদল পাকিস্তানি সেনাকে দেখতে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিঃশব্দে ঘিরে ফেললেন। মুক্তিযোদ্ধা ফারুক আহমদ পাটোয়ারী, অলিউল্লাহ পাটোয়ারী, এরশাদ উল্লা, আবদুল মতিন পাটোয়ারী প্রমুখ। ফারুক আহমদ পাটোয়ারীর কাছে এলএমজি। সবার আগে গর্জে উঠল তাঁর অস্ত্র। এ ঘটনা ঘটে শাশিয়ালীতে ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই।

শাশিয়ালী চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত। ২৯ জুলাই দুপুর আনুমানিক ১২টা। এ সময় কয়েকজন গ্রামবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের খবর দেন, ১৫-১৬টি নৌকা করে পাকিস্তানি সেনারা শাশিয়ালীর দিকে আসছে। তাদের সঙ্গে আছে পুলিশ ও রাজাকার।

কিছুক্ষণ পর গ্রামবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের আবার জানান, পাকিস্তানি সেনাদের আরেকটি দল কড়ইতলীর ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছে। মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়ে দ্রুত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নিলেন। নৌকা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের নাগালের মধ্যে আসামাত্র একযোগে গর্জে ওঠে সবার অস্ত্র। চার-পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা এবং সাত-আটজন রাজাকার ও পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। চার-পাঁচটি নৌকা পানিতে ডুবে যায়।

সেখানে শুকনো জায়গা তেমন ছিল না। ফলে পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছয়-সাতজনের একটি দল আশ্রয় নেয় এক আখখেতে। ফারুক আহমদ পাটোয়ারীসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তাদের দেখতে পেয়ে ঘেরাও করেন। ওই সময় সেনাদের তিন-চারজন একটি মাচানে বসে এবং বাকিরা খেতের আইলের আড়ালে পজিশনে ছিল। ফারুক আহমদ পাটোয়ারী তাঁর এলএমজি দিয়ে প্রথম গুলি শুরু করেন। যে কয়জন মাচানে বসে ছিল, তারা এলএমজির গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। খেতের আইলে যারা ছিল তারা বেঁচে যায়। তারা পাল্টা গুলি না ছুড়ে চুপচাপ থাকে।

তারপর নিঃশব্দে কাটে কয়েক মিনিট। ফারুক আহমদ পাটোয়ারী মনে করেছিলেন সব পাকিস্তানি সেনা নিহত। তিনি উঠে দাঁড়ানোমাত্র বেঁচে যাওয়া পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তখন তিনি আহত হন। সহযোদ্ধারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে পাঠালেন চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসকের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিভে যায় ফারুক আহমদ পাটোয়ারীর জীবনপ্রদীপ। পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ফারুক আহমদ পাটোয়ারী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজলু মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম বানাশোয়া, ইউনিয়ন আমড়াতলী, সদর, কুমিল্লা। বাবা ওসমান আলী, মা কুলসুম আকতার। স্ত্রী অপলা খাতুন। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৫৩। শহীদ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর চাঁদপুর মুক্ত হয়। এরপর মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গড়া যৌথ বাহিনী রাজধানী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যৌথ বাহিনী মুদাফফরগঞ্জ-বরুড়া-দাউদকান্দি রুট ধরে ১৩ ডিসেম্বর দাউদকান্দি পৌঁছায়। এরপর বজলু মিয়াসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা মেঘনা নদী অতিক্রম করে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পারে সমবেত হন।

শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পারে কুড়িপাড়ায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা। ১৫ ডিসেম্বর কুড়িপাড়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ বাহিনীর রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকাল হওয়ার আগে কুড়িপাড়া মুক্ত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বজলু মিয়াসহ দু-তিনজন এবং মিত্রবাহিনীর কয়েকজন সদস্য প্রাণ হারান।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে দল কুড়িপাড়ায় ছিল, তারা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। অনমনীয় ছিল তাদের মনোভাব। সাহসের সঙ্গে তারা যৌথ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। মিত্রবাহিনীর ব্যাপক আর্টিলারির গোলাবর্ষণেও কোনোভাবে কাবু করা যায়নি তাদের। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তারা মাটি কামড়ে পড়ে ছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার জন্য যৌথ বাহিনী পরে তাদের যুদ্ধকৌশল পাল্টায়। এতে যথেষ্ট সফলতা অর্জিত হয়। নতুন যুদ্ধকৌশল অনুযায়ী প্রথমে মুক্তিবাহিনীর দল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এই সুযোগে মিত্রবাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। এরপর পাকিস্তানি সেনাদের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। জীবিত সেনাদের বেশির ভাগ আত্মসমর্পণ করে। কয়েকজন পালিয়ে যায়। মুক্ত হয় কুড়িপাড়া।

এই যুদ্ধে বজলু মিয়া ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু স্বাধীনতার লাল সূর্য দেখার সৌভাগ্য বজলু মিয়ার হয়নি। যুদ্ধের একপর্যায়ে তিনি নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার মধ্যে ঢুকে আক্রমণ চালান। এতে হতাহত হয় তিন-চারজন পাকিস্তানি সেনা। প্রতিরোধরত পাকিস্তানি সেনারা তাঁর সাহসিকতায় হকচকিত হয়ে পড়ে। অবশ্য তারা নিজেদের দ্রুতই সামলে নেয় এবং তাঁকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। একঝাঁক গুলি ছুটে আসে তাঁর দিকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। নিমেষে নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

বজলু মিয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধের পর প্রথমে ৪ নম্বর সেক্টরে, পরে ২ নম্বর সেক্টরের নির্ভয়পুর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশির আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণ বল্লভপুর, উপজেলা ছাগলনাইয়া, ফেনী।
বর্তমান ঠিকানা ২০০৭/১, মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা।
বাবা ছফর আলী খন্দকার, মা নূরের নাহার বেগম।
স্ত্রী মঞ্জুরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১২৯।

রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট পাহাড়। অ্যামবুশের জন্য উপযুক্ত স্থান। বশির আহমেদসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নিলেন পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে। পাকিস্তানি সেনাদের অপেক্ষায় তাঁরা ওত পেতে আছেন। সময় গড়াতে থাকে। একসময় তাঁরা দেখা পেলেন পাকিস্তানি সেনাদের। তাদের সামনে একদল রাজাকার। রাজাকাররা তাঁদের লক্ষ্য নয়। বশির আহমেদরা চুপচাপ থাকলেন। কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল একসঙ্গে তাঁদের সবার অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পেল না। নিহত হলো তাদের বেশির ভাগই। এ ঘটনা ঘটেছিল কালেঙ্গা জঙ্গলে ১৯৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।

কালেঙ্গা জঙ্গল হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একদল মুক্তিযোদ্ধা গোপনে অবস্থান করছিলেন এখানে। ২০-২১ তারিখে একদল পাকিস্তানি সেনা এখানে এলেও মুক্তিযোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের আক্রমণ করেননি। তবে তাঁদের পেতে রাখা মাইনের আঘাতে দু-তিনজন পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। পরদিন পাকিস্তানি সেনারা আবার সেখানে আসে। সেদিনও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কোনো বাধা দেননি।

২৪ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা সিন্দুরখান-কালেঙ্গার রাস্তার দুই পাশে অ্যামবুশ পেতে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁরা আগেই খবর পেয়েছিলেন পাকিস্তানিরা এখানে আসবে। মুক্তিযোদ্ধারা পাহাড়ের যেসব জায়গায় অবস্থান নিয়েছিলেন, সেখান থেকে এগিয়ে আসতে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের বেশির ভাগকেই দেখা যাচ্ছিল। তাদের সামনে ছিল ২২-২৫ জন রাজাকার। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ওপর আক্রমণ চালাননি। রাজাকাররা কোনো বাধা না পাওয়ায় পাকিস্তানি সেনারা বেশ নিশ্চিত মনে এবং কিছুটা বেপরোয়াভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। তারা অ্যামবুশের মধ্যে আসামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে তাদের ওপর আক্রমণ চালান। অ্যামবুশের মধ্যে পড়া বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা সেই আক্রমণে নিহত হয়। তারা প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পায়নি।

পাকিস্তানি সেনারা আসছিল বিস্তৃত এলাকাজুড়ে। তাদের অনেকেই অ্যামবুশের বাইরে ছিল। পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কারণ, মুক্তিযোদ্ধারা পরিখার ভেতরে ছিলেন। অ্যামবুশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন অফিসারসহ ৬০-৭০ জন নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আবদুল মান্নান (বীর উত্তম) শহীদ হন। এই অ্যামবুশে বশির আহমেদ যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বশির আহমেদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। সৈনিক হিসেবে ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন জয়দেবপুরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চু মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম গুয়াগাছিয়া, উপজেলা গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।
বাবা সোনা মিয়া মুন্সি, মা দুরুতুন নেছা।
স্ত্রী সলুফা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৬১। মৃত্যু ২০০৯।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের অবস্থান ধরে রাখতে পারলেন না। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগই পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কিন্তু পিছু হটল না তাদের ক্ষুদ্র একটি দল। তারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য ফাঁদ পাতল। ফাঁদ পাতার এই দলে আছেন বাচ্চু মিয়া। ঘণ্টা কয়েক পর তাঁদের ফাঁদে পা রাখল একদল পাকিস্তানি সেনা। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল বাচ্চু মিয়াসহ সব মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক পাকিস্তানি সেনারা। হতাহত হলো তাদের অনেকে। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মাধবপুরে।

মাধবপুর হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। এপ্রিল মাসের শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল অবস্থান নিয়েছিল শাহবাজপুরে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে আক্রমণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের একটি শক্তিশালী দল অবস্থান নেয় শাহবাজপুর সেতুর অপর প্রান্তে। অপর একটি দল হেলিকপ্টারে প্যারাড্রপিং করে অবস্থান নেয় বাচ্চু মিয়াদের দলের পেছন ভাগে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বাচ্চু মিয়াদের দল শাহবাজপুর ছেড়ে অবস্থান নেয় মাধবপুরে।

তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল)। বাচ্চু মিয়ারা মাধবপুর নদকে সামনে রেখে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলেন। তাঁদের এই অবস্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জঙ্গি বিমান ও আর্টিলারির সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এতে তাঁদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটেন। কিন্তু বাচ্চু মিয়াসহ ১০-১২ জন চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের অবস্থানে থেকে যান। তাঁদের কাছে উন্নত অস্ত্র বলতে ছিল চারটি এলএমজি। বাকি সব রাইফেল। তাই নিয়ে তাঁরা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের জন্য ফাঁদ পাতেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দল কোথাও বাধা না পেয়ে ভেবেছিল, মুক্তিযোদ্ধারা সব মাধবপুর ছেড়ে চলে গেছেন। তারা বেশ ঢিলেঢালাভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। সেনারা সেতুর মাঝামাঝি আসামাত্র বাচ্চু মিয়াদের অস্ত্র একসঙ্গে গর্জে ওঠে। আকস্মিক এই আক্রমণে অগ্রগামী দলের অনেকে হতাহত হয়। এরপর বাচ্চু মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা ত্বরিত ওই এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ করেন। এই অ্যামবুশে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বাচ্চু মিয়া চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট সেক্টরের অধীন চিমটিখিল বিওপিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। পরে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টর ও নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধীনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গল মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম ভাটামাথা, উপজেলা আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা আনোয়ার আলী, মায়ের নাম জানা যায়নি। স্ত্রী জাহেরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও ছয় মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭০। মৃত্যু ১৯৮২।

মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত অবস্থান নিলেন গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে। মঙ্গল মিয়াসহ ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা। অদূরে রেলস্টেশন। সেই রেলস্টেশনের দিকে আসছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি দল। মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করছেন। একসঙ্গে গর্জে উঠল মঙ্গল মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্র। লুটিয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। এ ঘটনা ঘটে মন্দভাগ রেলস্টেশনে ১৯৭১ সালের ১৮ জুন।

মন্দভাগ রেলস্টেশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন ভারতীয় এলাকায় একটি ক্যাম্পে। সেদিন সকালে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পান একদল পাকিস্তানি সেনা কসবা রেলস্টেশন থেকে রেলের একটি ট্রলিতে করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রেশন নিয়ে রওনা হয়েছে সালদা নদী রেলস্টেশনে। ট্রলির নিরাপত্তায় রয়েছে আরেক দল পাকিস্তানি সেনা। তারা সব মিলে প্রায় ২০০ জন।

খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশ করার। তাঁরা দ্রুত সীমান্ত অতিক্রম করে অবস্থান নেন মধ্যবর্তী মন্দভাগ স্টেশনের কাছে। তাঁরা ছিলেন ৪০ জন। দলের নেতৃত্বে সুবেদার আবদুল ওয়াহাব (বীর বিক্রম, পরে অনারারি ক্যাপ্টেন)। মঙ্গল মিয়া সহ-দলনেতা। তাঁদের অস্ত্র বলতে ছিল দুটি মেশিনগান, সাতটি এলএমজি, একটি দুই ইঞ্চি মর্টার ও একটি রকেট লঞ্চার। বাকি সব হালকা অস্ত্র।

পাকিস্তানি সেনারা রেলট্রলি মাঝে রেখে রেললাইনের দুই পাশ ধরে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে আসছিল। রেললাইনের সমান্তরাল রাস্তায় ছিল আরেক দল পাকিস্তানি সেনা। রেলট্রলি ও সেনারা অ্যামবুশের মধ্যে ঢোকামাত্র মঙ্গল মিয়ারা একযোগে আক্রমণ শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে রকেট লঞ্চারের একটি গোলা ট্রলি ভেদ করে চলে যায়। গুলিবিদ্ধ কয়েকজন সেনা লুটিয়ে পড়ে।

পাকিস্তানি সেনারা রেললাইনের আড়ালে অবস্থান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। দুই পক্ষে প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে মঙ্গল মিয়া অসীম বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেন।

মঙ্গল মিয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। মার্চ মাসে সম্ভাব্য ভারতীয় হামলার কথা বলে তাঁদের সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে সালদা নদী, মন্দভাগ, কসবা এলাকায় গেরিলাযুদ্ধ করেন। তিনি কিংবদন্তির যোদ্ধা আবদুল ওহাবের নেতৃত্বাধীন কোম্পানিতে ছিলেন। একটি প্লাটুনের নেতৃত্ব দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম গুঞ্জুর, উপজেলা মুরাদনগর, কুমিল্লা।
কেরামত আলী ফকির, মা সূর্যবান বেগম।
স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৬। মৃত্যু ২০০৫।

৪ আগস্ট, ১৯৭১। সকালে একের পর এক শব্দ। গোলা পড়ছে কোদালকাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায়। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার অন্তর্গত কোদালকাটি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৩ আগস্ট পর্যন্ত গোটা রৌমারী মুক্ত ছিল। কোদালকাটি ও এর আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল (প্লাটুন)। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মনসুর আলী। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিরাট একটি দল নিয়ে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কোদালকাটি দখল করে বসে। কোদালকাটিতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি।

কয়েক দিন পর অর্থাৎ ১৩ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রৌমারী থানা সদর দখলের লক্ষ্যে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে কোদালকাটি থেকে রাজীবপুরের দিকে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তারা রাজীবপুর দখলের চেষ্টা করে।

মনসুর আলীর অবস্থানগত এলাকা দিয়েও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়। তিনি সীমিত শক্তি নিয়েই সাহসের সঙ্গে সেনাবাহিনীর ওই দলের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করেন। পাকিস্তানিরা পরে আরও কয়েকবার তাঁর অবস্থানগত এলাকা দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিবারই তিনি সাহসের সঙ্গে তা প্রতিহত করেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরপর তাঁরা কোদালকাটি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের জন্য আক্রমণ করেন। মূল আক্রমণে অংশগ্রহণকারী চারটি দলের একটি ছিল মনসুর আলীর দল।

আক্রমণের সময় নির্ধারিত ছিল ২ অক্টোবর রাত। আগের দিন তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাজাই-শংকর-মাধবপুর গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থান নেন। দ্বিতীয় দল ওই গ্রামের শেষ প্রান্তে ভেলামারী গ্রামে, তৃতীয় দল মাধবপুর গ্রামের উত্তরে এবং চতুর্থ দল পূর্ব প্রান্তে অবস্থান নেয়।

কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। ২ অক্টোবর দুপুরে তারা ব্যাপক মর্টার ফায়ারের ছত্রচ্ছায়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সব অবস্থানে একযোগে আক্রমণ করে। মনসুর আলী ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করার মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য দলও পাল্টা আক্রমণ করে। সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ চলে।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। সন্ধ্যার পর তারা আহত ও নিহত সেনাদের নিয়ে পিছু হটে নিজেদের ক্যাম্পে সমবেত হয়। পরদিন সকালে মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেছে।

মনসুর আলী চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। ২৫ মার্চ তিনি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ীতে মোতায়েন ছিলেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

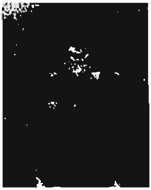

মনির আহমেদ খান, বীর প্রতীক

গ্রাম দেলী, উপজেলা কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আহমেদ খান, মা রহিমা বেগম।
স্ত্রী বেনুআরা বেগম। তাঁদের এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৮০। মৃত্যু ২০১২।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আখাউড়ার পতনের পর মনির আহমেদ খানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অগ্রসর হন চান্দুরায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার অন্তর্গত চান্দুরা।

মুক্তিযোদ্ধাদের এ অগ্রাভিযানে সবার আগে ছিল 'সি'। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শাহবাজপুর সেতু দ্রুত দখল করা। তাদের অনুসরণ করে 'এ' দল। সব শেষে ছিল 'ডি' দল। আর 'বি' দল ছিল পেছনে। কাট অফ পার্টি হিসেবে তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল অগ্রসরমাণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তা বিধান করা।

এস ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহও (বীর উত্তম, পরে সেনাপ্রধান, মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন চান্দুরার কাছে ইসলামপুরে পৌঁছান, তখন বড় ধরনের এক দুর্ঘটনা ঘটে। দুটি মিলিটারি ট্রাক হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়। তাতে ছিল একদল পাকিস্তানি সেনা। এ ঘটনা ছিল অভাবিত।

কে এম সফিউল্লাহ তাৎক্ষণিক পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের আদেশ দেন। পাকিস্তানি সেনারা হাত উঁচু করে ট্রাক থেকে নামতে থাকে। এরপর হঠাৎ তাদের কেউ কেউ দৌড় দেয় এবং বাকিরা গোলাগুলি শুরু করে। নিমেষে সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একটু পর সেখানে হাজির হয় আরও কিছু পাকিস্তানি সেনা।

তখন মনির আহমেদ খান ও তাঁর দলের সহযোদ্ধারা ছিলেন বেশ এগিয়ে। তিনি ছিলেন সি দলে। তাঁরা ধর্মনগর-হরষপুর-পাইকপাড়া হয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁরা দ্রুত পেছনে আসেন। পাকিস্তানি সেনারা প্রচণ্ড গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। একটি প্লাটুন (উপদল) নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাশের তিতাস নদীর অপর পাড়ে চলে যায়। বাকি দুই প্লাটুনের একটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অক্ষত থাকে একটি প্লাটুন।

অক্ষত প্লাটুনে ছিলেন মনির আহমেদ খান। তাঁরা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তাঁদের সাহস ও বীরত্বে বেঁচে যায় কে এম সফিউল্লাহর জীবন এবং শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয় পাকিস্তানি সেনারা। সেদিন যুদ্ধে দুজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ এবং এ এস এম নাসিমসহ (বীর বিক্রম) ১১ জন আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ জন নিহত ও ১৪ জন বন্দী হয়। এ ঘটনা ৬ ডিসেম্বরের।

মনির আহমেদ খান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রান্ত হন। কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরের পঞ্চবটী সাবসেক্টরে, পরে এস ফোর্সের (১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিরুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম কামুটিয়া, ইউনিয়ন কাশিল, উপজেলা বাসাইল, টাঙ্গাইল। বাবা সাহেব আলী, মা হালিমা বেগম। স্ত্রী মমতাজ বেগম। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯৭।

সীমান্ত এলাকা থেকে কিছুটা দূরে কালাছড়া চা-বাগান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। ভারতে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে খবর এল, ওই চা-বাগানে একদল পাকিস্তানি সেনা অবস্থান নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক সেখানে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

কালাছড়া চা-বাগানে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনারা সংখ্যায় অনেক। প্রায় এক কোম্পানি। এত বড় দলকে প্রথাগত আক্রমণ করতে হলে চার গুণ শক্তি প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি মাত্র দ্বিগুণ। তার পরও আক্রমণের সিদ্ধান্ত বহাল থাকল। এ ঘটনা অক্টোবর মাসের। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে মধ্যরাতে অবস্থান নিলেন কালাছড়া চা-বাগানের কাছে। সেখানে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ভোরে একযোগে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ উপেক্ষা করে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যায় চা-বাগানে। এই দলে একটি ক্ষুদ্র উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন মনিরুল ইসলাম। অপর দল শুরুতেই দুর্ঘটনায় পড়ে। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে ওই দলের একজন শহীদ হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। থেমে যায় তাঁদের অগ্রযাত্রা। মনিরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বীরত্বে তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একাংশের প্রতিরক্ষা। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সেনারা আশ্রয় নিল সুরক্ষিত বাংকারে। মনিরুল ইসলাম কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে গ্রেনেড হামলা চালালেন বাংকারে। হতাহত হলো কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। এতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল পাকিস্তানি সেনারা। এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য উপদল একযোগে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করল।

AMARBOI.COM

প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে নিহত ও আহত সহযোদ্ধাদের ফেলে পালিয়ে গেল পাকিস্তানি সেনারা। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেকে নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা গণনা করে দেখেন, ২৭ জন পাকিস্তানি সেনার মৃতদেহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। পরে গ্রামবাসীর সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা সেই মৃতদেহগুলো দাফন করেন। আহতদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দুজন শহীদ ও সাতজন আহত হন।

মনিরুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মার্চ মাসে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা যোগ দেন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের গঙ্গাসাগর সাবসেক্টরে। পরে কে ফোর্সের নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে। আখাউড়া, কর্নেল বাজার ও মুকুন্দপুরসহ আরও কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজ উদ্দিন, বীর প্রতীক

উত্তর মুন্সিপাড়া, সদর, রংপুর। বাবা ওমর উদ্দিন, মা করিমন নেছা। স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও চার ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৯০। গেজেটে নাম মমতাজ মিয়া। মৃত্যু ২০০৪।

১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর। মুক্তিবাহিনীর চারটি দল রওনা হলো টেংরাটিলার উদ্দেশে। একটি দলে আছেন মমতাজ উদ্দিন (মমতাজ মিয়া)। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা অবস্থান নিলেন টেংরাটিলার ডান পাশে। তাঁরা মূল আক্রমণকারী দল।

সকাল সাতটায় মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। গোলাগুলি ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

টেংরাটিলায় পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ছিল যথেষ্ট দৃঢ়। তাদের পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। সারা দিন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে চলে। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকবার পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা তা ব্যর্থ করে দেন।

এরপর রাতে মমতাজ উদ্দিন দুঃসাহসিক এক কাজ করে বসেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের তিন দিকে ছিল জলাশয়। তিনি কয়েকটি গ্রেনেডসহ একাই বরফশীতল পানিতে নেমে কচুরিপানায় নিজেকে আড়াল করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান ওই প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে। পাকিস্তানি সেনারা বুঝতে পেরে গুলি শুরু করে। এতে তিনি দমে যাননি। সহযোদ্ধাদের পাল্টা গুলিবর্ষণের ছত্রচ্ছায়ায় সাহসের সঙ্গে তিনি এগিয়ে যান। একপর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন পাকিস্তানি অবস্থানের কাছে।

তারপর সুযোগ বুঝে জলাশয় থেকে ভূমিতে উঠে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে চলে যান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের একদম কাছে। বারবার অবস্থান পরিবর্তন করে তিনি তাঁর কাছে থাকা সব গ্রেনেড একের পর এক ছুড়ে মারেন। প্রথমটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে পাকিস্তানি সেনারা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। পরে তাদের গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়।

মমতাজ উদ্দিন বাকি রাত সেখানেই ঘাপটি মেরে থাকেন। খুব ভোরে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানে উঁকি দিয়ে দেখেন, সেখানে কোনো সাড়াশব্দ নেই। তখন তিনি আড়াল থেকে কয়েকটি গুলি ছোড়েন। কিন্তু পাকিস্তানি অবস্থান থেকে পাল্টা গুলি হয়নি। সকালে দেখেন, পুরো ক্যাম্প খালি। কোথাও পাকিস্তানি সেনা নেই। ক্যাম্পে রান্না করা খাবার পড়ে আছে। তারা পালিয়ে গেছে।

মমতাজ উদ্দিন চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে তিনি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। তাঁকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ, বৃহত্তর সিলেট জেলার ছাতক, সালুটিকরসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমতাজ হাসান, বীর প্রতীক

গ্রাম শিবপুর, উপজেলা বিরামপুর, দিনাজপুর। বর্তমানে বসবাস করছেন আমেরিকায়। বাবা আবদুল হাফিজ, মা জাহানারা হাফিজ। স্ত্রী পারভীন জাহান। তাঁদের তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৮।

গভীর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা নিঃশব্দে অবস্থান নিতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলের (আলফা কোম্পানি) নেতৃত্বে মমতাজ হাসান। ভোর হওয়ার আগেই তাঁরা একযোগে আক্রমণ শুরু করলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হতে থাকল।

মুক্তিযোদ্ধারা মমতাজ হাসানের নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকলেন। বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভেঙে পড়ল পাকিস্তানি সেনাদের সব প্রতিরোধ। সকাল সাতটার মধ্যেই পাকিস্তানি সেনারা তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে গেল। এ ঘটনা ঘটেছিল সালদা নদীতে ১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে সালদা নদী এলাকা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে একেবারে হটিয়ে দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সালদা নদীর যুদ্ধ স্মরণীয়। এই যুদ্ধে মমতাজ হাসান তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ বীরত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। তাঁর সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত হন দলের সহযোদ্ধারা।

মমতাজ হাসান ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মে মাসের প্রথমার্ধে ভারতে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরের ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দারের (বীর উত্তম) অধীনে গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে সীমান্ত এলাকায় ছোটখাটো কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। কিছুদিন পর তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম বাংলাদেশ অফিসার্স ওয়ার কোর্সে। প্রশিক্ষণ শেষে যোগ দেন সালদা নদী সাবসেক্টরে। তাঁকে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানির অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

সালদা নদী মুক্ত হওয়ার পর মমতাজ হাসান তাঁর দল নিয়ে ক্যাপ্টেন হালদার আবদুল গাফফারের (বীর উত্তম) নেতৃত্বে চট্টগ্রাম এলাকায় যান। ফটিকছড়ি, নাজিরহাটসহ আরও কয়েক স্থানে যুদ্ধ করেন। ফটিকছড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি দল এবং সহযোগী এক কোম্পানি ইপিসিএএফ মোতায়েন ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা কাজিরহাটে পৌঁছে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ফটিকছড়ির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রধান দল কাজিরহাট-ফটিকছড়ি রাস্তায়, বাকি দুই দলের একটি ফটিকছড়ি পাহাড়ের দিকের রাস্তায় এবং অপর দলটি মানিকছড়ি-রামগড়ের রাস্তায় অবস্থান নেয়। ১১ ডিসেম্বর বিকেলে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ করেন। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগীরা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদসহ অন্য জিনিসপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। রাত ১২টার মধ্যে সমগ্র ফটিকছড়ি মুক্ত হয়। এই যুদ্ধেও মমতাজ হাসান যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মমিনুল হক ভূঁইয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম কালা সাদাধিয়া (ভূঁইয়াবাড়ি), দাউদকান্দি উপজেলা, কুমিল্লা। বাবা সিরাজুল হক ভূঁইয়া। স্ত্রী সুফিয়া খাতুন। তাঁদের ছয় মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৩। মৃত্যু ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে শীতের রাতে নিঃশব্দে শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে সমবেত হন মমিনুল হক ভূঁইয়াসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের লক্ষ্য সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্র। তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের বর্তমান কাঁচপুর সেতুর কাছে। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল কেবল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ট্রান্সফরমার বিস্ফোরকের সাহায্যে ধ্বংস করে সটকে পড়া। কেন্দ্রের চারদিকে ছিল ওয়াচ টাওয়ার। এখানে সব সময় সতর্ক প্রহরায় ছিল পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা। রাতে সার্চলাইটের আলোয় নদীসহ চারদিক আলোকিত করে রাখা হতো।

প্রায় দুঃসাধ্য এক মিশন ছিল এটি। পাকিস্তানি সেনারা টের পেলে মুক্তিযোদ্ধাদের সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেত। সে জন্য মমিনুল হক ভূঁইয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা সবাই ছিলেন সতর্ক। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের ফাঁকি দিয়ে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা কেন্দ্রের ভেতরে ট্রান্সফরমারের কাছে যেতে সক্ষম হন। বাকি ব্যক্তিরা বাইরে থাকেন তাঁদের নিরাপত্তায়।

তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন পিকে চার্জ। সেগুলো ট্রান্সফরমারের গায়ে লাগিয়ে তাঁরা কর্ডেক্স (সংযোগ তার) লাগান। কর্ডের মাঝ বরাবর ছিল ডেটোনেটর। সফলতার সঙ্গেই সব কাজ তাঁরা শেষ করেন। সংযোগ তারে আগুন দেওয়ার কয়েক মিনিট পর বিদ্যুচ্চমকের মতো এক ঝলক আলো দেখা যায়। প্রহরারত পাকিস্তানিদের হতবাক করে দিয়ে একের পর এক ঘটে বিস্ফোরণ।

তারপর চারদিক নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে যায়। বাতাসে ভাসতে থাকে ট্রান্সফরমার কয়েলের পোড়া গন্ধ। সেদিন তাঁদের অপারেশনে ধ্বংস হয় সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারটি ট্রান্সফরমার। এতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের অনেক অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

ট্রান্সফরমারে বিস্ফোরক লাগিয়ে মমিনুল হক ভূঁইয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা ফিরে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। তখন গর্জে ওঠে অনেক অস্ত্র। তাঁরা পাল্টা গুলি করতে করতে দ্রুত নিরাপদ স্থানে যান।

পাকিস্তানিরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলির পাশাপাশি গ্রেনেড ছোড়ে। গুলিতে কেউ আহত হননি। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের আঘাতে তাঁর তিন-চারজন সহযোদ্ধা আহত হন। একজন ছাড়া বাকি সহযোদ্ধাদের আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না।

মমিনুল হক ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে চাকরি করতেন বিদ্যুৎ বিভাগে। কুমিল্লা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। কুমিল্লার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

প্রতিরোধযুদ্ধের পর ভারতে যান। প্রথমে মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরে সাংগঠনিক নানা কাজে যুক্ত ছিলেন। পরে গেরিলা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। কুমিল্লার দাউদকান্দি এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার, সিদ্ধিরগঞ্জসহ আরও কয়েক স্থানে বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাজহারুল হক, বীর প্রতীক

মাহিগঞ্জ, সদর, রংপুর। বাবা আফসার আলী খান, মা খাদিজা বেগম। স্ত্রী সাফিয়া বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৭৮। মৃত্যু ১৯৮৩।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিক। একদল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন রায়গঞ্জে। তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত। একটি দলের নেতৃত্বে মাজহারুল হক। মূল আক্রমণকারী অপর দলটি রায়গঞ্জে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। গোলাগুলি চলার একপর্যায়ে পাকিস্তানিদের সেনাবাহী একটি গাড়ি উপস্থিত হয় মাজহারুল হকের অবস্থানে। তখন তাঁরা ওই গাড়িতে আক্রমণ চালান। তাঁদের অস্ত্রের গুলি ও নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডের আঘাতে গাড়ি ধ্বংস এবং বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

মাজহারুল হকদের এই আক্রমণ ছিল ভুরুঙ্গামারীতে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতির অংশ মাত্র। কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত ভুরুঙ্গামারী। ওই ঘটনার পর ১১ নভেম্বর রাতে তাঁরা ভুরুঙ্গামারীর এক দিক খোলা রেখে তিন দিক দিয়ে একযোগে আক্রমণ চালান। তাঁদের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

১২ নভেম্বর সকাল আনুমানিক আটটায় মিত্রবাহিনীর বিমান ভুরুঙ্গামারীর পাশে পাটেশ্বরী রেলস্টেশনের পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাব্যূহে বিমান হামলা চালায়। ধ্বংস হয়ে যায় সেনাবাহিনীর পাটেশ্বরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেলস্টেশন। হতাহত হয় অনেক শত্রুসেনা। পাটেশ্বরী থেকে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। তখন মাজহারুল হক তাঁর দল নিয়ে তাদের ধাওয়া করেন। জীবিত সেনারা পালিয়ে যায় ভুরুঙ্গামারী সদরে।

মুক্তিযোদ্ধারা ভুরুঙ্গামারীর পূর্ব দিকে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানিদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। মাজহারুল হকও তাঁর দল নিয়ে আক্রমণ করেন। ১৩ নভেম্বর সারা দিন সেখানে যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যার পর রাতেও দুই পক্ষে গোলাগুলি চলে। শেষ রাতে পাকিস্তানিদের দিক থেকে গোলাগুলির মাত্রা কমে আসে। ১৪ নভেম্বর ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভুরুঙ্গামারীতে ঢুকে পড়েন। পাকিস্তানি সেনারা রায়গঞ্জে পালিয়ে যায়।

১৬ নভেম্বর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রায়গঞ্জে আক্রমণ শুরু করেন। দুই দিন একটানা যুদ্ধের পরও পাকিস্তানিরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা ১৯ নভেম্বর ফুলকুমার নদ অতিক্রম করে তিন দিক দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর শেষ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের দিক থেকে গুলি বন্ধ হয়ে যায়। সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাজহারুল হকসহ মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকে পড়েন রায়গঞ্জে। মুক্ত হয় গোটা ভুরুঙ্গামারী।

মাজহারুল হক চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন রংপুর ইপিআর উইংয়ের (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) অধীনে। তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। নাগেশ্বরী, পাটেশ্বরীসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালু মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম দড়িগাঁও, রায়পুর, নরসিংদী। বাবা আফতাবউদ্দিন মিয়া। স্ত্রী আমেনা বেগম। তাঁদের তিন মেয়ে ও চার ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৯১। মৃত্যু ২০০৯।

সুরমা নদীর তীরে ছাতক। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১০-১১ মাইল দূরে তার অবস্থান। ১৯৭১ সালে ছাতক ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। নিয়োজিত ছিল ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ১২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ইপিসিএএফ ও স্থানীয় রাজাকার বাহিনী।

১৪ অক্টোবর ভোরে মুক্তিবাহিনীর ব্যাটালিয়ন শক্তির একটি দল সেখানে আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন কয়েকটি দলে বিভক্ত। এই আক্রমণে সি দলে ছিলেন মালু মিয়া। এই দলের ওপর কাট অফ পার্টি হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব ছিল, যাতে দোয়ারা বাজার হয়ে ওয়াপদার বাঁধ বা সুরমা নদীপথ ধরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো রিইনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে।

১৩ অক্টোবর রাতে মালু মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা ভারতের বাঁশতলা থেকে রওনা হন। তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থান নেওয়ার কথা ছিল ছাতকের কাছে টেংরাটিলায়। খুব ভোরে কয়েকটি নৌকায় সেখানে পৌঁছামাত্র তাঁদের নৌকা লক্ষ্য করে ছুটে আসতে থাকে গুলি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের সব নৌকা লক্ষ্য করে একযোগে আক্রমণ চালায়।

আকস্মিক এই ঘটনার জন্য মালু মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথম ধাক্কাতেই তাঁদের দলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাঁর সহযোদ্ধা অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ বা আহত হন। ব্যাপক গুলির মধ্যে জীবন বাঁচাতে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা পানিতে ঝাঁপ দেন। নৌকাগুলো পানিতে ডুবে যায়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কারও কারও অস্ত্র হাত থেকে পানিতে পড়ে হারিয়ে যায়।

জীবন-মৃত্যুর এই চরম সন্ধিক্ষণে মালু মিয়া মনোবল হারাননি। চারদিকে গভীর পানি। আশপাশে ছিল না কোনো শুকনা স্থান বা আশ্রয় নেওয়ার মতো জায়গা। গোলাগুলির মধ্যে সেখানে থাকা মানে নির্ঘাত প্রাণ হারানো। তার পরও সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে তিনি সাঁতাররত অবস্থাতেই তাঁর অস্ত্র থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি শুরু করেন।

তাঁর সাহসিকতা দেখে অন্য যাঁদের অস্ত্র হারিয়ে যায়নি, তাঁদের কেউ কেউ অনুপ্রাণিত হয়ে গুলি করতে শুরু করেন। এতে অস্ত্রহীন মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণে সুবিধা হয়। সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে ২২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও অনেকে আহত হন।

মালু মিয়া চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। তাঁকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ, দেওয়ানগঞ্জ, সিলেট জেলার ছাতক, সালুটিকর, টেংরাটিলাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহফুজুর রহমান খান, বীর প্রতীক

গ্রাম পিপুলিয়া, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। বাবা জিয়ারুল হক খান, মা শামছুন্নাহার ওরফে ফিরোজা বেগম। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪৬। গেজেটে নাম মাহফুজুর রহমান। শহীদ অক্টোবর ১৯৭১।

১৯৭১ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরের সিও কার্যালয়ে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প। তখন সিও কার্যালয় ছিল বারৈখালীতে। পাকিস্তানি ক্যাম্পে ছিল নিয়মিত সেনা, ইপিআর, ইপিসিএএফ ও রাজাকার। সব মিলিয়ে ১০০ লোকবলের মিশ্র বাহিনী। ইপিআরে বেশির ভাগ ছিল বাঙালি।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মাহফুজুর রহমান খানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা হরিরামপুরের বারৈখালীতে আক্রমণ করেন। এর আগে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে পাকিস্তানি ক্যাম্পের ইপিআরের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এরপর লাল মিয়া নামের ইপিআরের একজন প্রতিনিধি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাঁদের জানান, বাঙালি ইপিআর সবাই সাহায্য করতে রাজি। মুক্তিযোদ্ধারা যখন আক্রমণ করবেন, তখন তাঁরা পক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন ও আক্রমণে অংশ নেবেন।

এরপর আক্রমণের তারিখ ঠিক করা হয়। দিন নির্ধারিত হয় ১৩ (কারও কারও মতে ১৬) অক্টোবর। সেদিন বিকেল চারটার দিকে ওয়্যারলেস অফিস থেকে কাঠের সেতু এলাকার মধ্যে রাস্তার পূর্ব পাশে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন মাহফুজুর রহমান খানসহ প্রায় ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের অস্ত্র ছিল খুবই সাধারণ—এসএলআর, রাইফেল ও গ্রেনেড। যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে বাঙালি ইপিআর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন।

ওয়্যারলেস অফিসের ছাদের ওপর ছিল পাকিস্তানি সেনাদের দুটি এলএমজি পোস্ট। এলএমজি চালনার দায়িত্বে ছিলেন দুই পাঠান সেনা। যুদ্ধ শুরু হলে আশ্চর্যজনকভাবে ওই দুই পাঠান সেনা তাঁদের এলএমজি দিয়ে গুলি করা থেকে বিরত থাকেন। পরে তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণও করেন। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ সুবিধা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মুখোমুখি যুদ্ধের একপর্যায়ে ওয়্যারলেস স্টেশনে থাকা পাকিস্তানি সেনারা সিও অফিসের মূল ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। তখন মাহফুজুর রহমান খানসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ওয়্যারলেস অফিস ধ্বংস করতে যান। এ সময় পাকিস্তানি সেনারা সেখানে গ্রেনেড ছোড়ে। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলে আগুন ধরে যায়। আগুনে ঝলসে যান মাহফুজুর রহমান খান ও বজলুর হুদা ওরফে পান্নু। মাহফুজুর রহমান খানের জখম গুরুতর ছিল। চিকিৎসকের কাছে পাঠানোর আগেই নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। বজলুর হুদা বেঁচে যান।

মাহফুজুর রহমান খান ১৯৭১ সালে জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন। শ্রমিক রাজনীতিও করতেন। মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। সেখানে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরে। পরে নিজ এলাকা মানিকগঞ্জে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহ্‌বুব-উল-আলম, বীর প্রতীক

গ্রাম আহমেদপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৫৩০/এ, সড়ক ১০ ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা। বাবা আবু মুসা মো. মসিহ্‌, মা রোকেয়া মসিহ্‌। স্ত্রী বেগম ছালমা মাহ্‌বুব। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫।

মুক্তিযুদ্ধকালে অক্টোবরের মাঝামাঝি মাহ্‌বুব-উল-আলমসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন ভারতের কৈলাস শহরে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে ঝটিকা আক্রমণ পরিচালনা করা। একের পর এক আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের বিপর্যস্ত এবং সম্ভব হলে সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের বিতাড়ন করা। সীমান্ত থেকে পাকিস্তানিদের উচ্ছেদ করে তাঁরা ক্রমশ সিলেটের দিকে অগ্রসর হবেন। এ লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধারা তখন থেকেই অভিযান শুরু করেন।

মাহ্‌বুব-উল-আলম তাঁর উপদলের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফুলতলা-সাগরনাল চা-বাগানে আক্রমণ করেন। এর অবস্থান মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। সীমান্ত এলাকা। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। মাহ্‌বুব-উল-আলম নির্দিষ্ট দিন সহযোদ্ধাদের নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে শেষ রাতে আক্রমণ চালান। পরদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এরপর মাহ্‌বুব-উল-আলম সহযোদ্ধাদের নিয়ে আরও কয়েক স্থানে যুদ্ধ করেন। ১ ডিসেম্বর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে মূল দলের সঙ্গে আলীনগর চা-বাগানে (মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায়) আক্রমণ চালান। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ করে। দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানিরা পিছু হটে ভানুগাছে আশ্রয় নেয়।

মাহ্‌বুব-উল-আলমসহ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের অনুসরণ করে উপস্থিত হন ভানুগাছে। এখানে আগে থেকেই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা। স্থানটি ভৌগোলিক ও সামরিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সিলেট দখলের জন্য ভানুগাছ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে উচ্ছেদ করা ছিল অত্যন্ত জরুরি।

৬ ডিসেম্বর সকালে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে ভানুগাছে আক্রমণ করেন। সারা দিন ধরে এখানে যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনারা মরিয়া হয়ে তাঁদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। মাহ্‌বুব-উল-আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা এতে বিচলিত হননি। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানিদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বিপর্যস্ত পাকিস্তানিরা পরদিন সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

মাহ্‌বুব-উল-আলম ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাকুলে নবীন সেনা কর্মকর্তা (ক্যাডেট) হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। মে মাসের শেষে আরও ১২ জন বাঙালি ক্যাডেটের সঙ্গে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ২ জুন ভারতে পৌঁছান।

কয়েক দিন আগরতলায় অবস্থান করার পর মাহ্‌বুব-উল-আলম মুক্তিবাহিনীর প্রথম ওয়ার কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুবুর রব সাদী, বীর প্রতীক

গ্রাম বনগাঁও, উপজেলা নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
বাবা দেওয়ান মো. মামুন চৌধুরী, মা সৈয়দা জেবুন্নেছা চৌধুরানী। স্ত্রী তাজকেরা সাদী। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৫১।

১৯৭১ সালে মাহবুবুর রব সাদী শিক্ষার্থী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ পেলে তিনি ৪ নম্বর সেক্টরের জালালপুর সাবসেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁর আওতাধীন এলাকা ছিল আটগ্রাম, জকিগঞ্জ ও লুবাছড়া। উল্লিখিত এলাকা ছাড়াও কানাইঘাট এলাকায়ও অপারেশন করেন। তাঁর নেতৃত্বে বা পরিচালনায় অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে কানাইঘাট থানা আক্রমণ অন্যতম।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের একদিনের ঘটনা। সঠিক তারিখ মাহবুবুর রব সাদীর মনে নেই। সেদিন রাতে ছিল মেঘমুক্ত আকাশ। অন্ধকার তেমন গাঢ় ছিল না। দূরের অনেক কিছু চোখে পড়ছিল। এমন রাতে বাংলাদেশের ভেতরে প্রাথমিক অবস্থান থেকে মাহবুবুর রব সাদীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা রওনা হয়েছিলেন লক্ষ্যস্থল অভিমুখে। তিনি ছিলেন সামনে। তাঁর পেছনে ছিলেন সহযোদ্ধারা। আর একদম আগে ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক।

চা-বাগানের পথ দিয়ে তাঁরা কানাইঘাটে যান। তখন চারদিক নিঃশব্দ এবং সবাই গভীর ঘুমে ছিল। পুলিশও জেগে ছিল না। শুধু দুজন সেন্ট্রি জেগে ছিল। আক্রমণের আগে সাদী চেষ্টা করেন সেন্ট্রিকে কৌশলে নিরস্ত্র করে পুলিশদের আত্মসমর্পণ করানোর। এ দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধেই নেন। একজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে তিনি থানায় যান। বাকি সবাই আড়ালে তাঁর সংকেতের অপেক্ষায় থাকেন।

সাদী থানার সামনে গিয়ে দেখেন, সেন্ট্রি দুজন ভেতরে চলে গেছে। ফলে তিনি আড়ালে অপেক্ষায় থাকেন। একসময় একজন সেন্ট্রি বেরিয়ে আসে এবং তাঁদের দেখে চমকে ওঠে; আচমকা ভূত দেখার মতো অবস্থা। সাদী মনে করেছিলেন, সেন্ট্রি ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু সে তা করেনি।

সেন্ট্রি তাঁর দিকে অস্ত্র তাক করে। তখন সাদীও তাঁর অস্ত্র সেন্ট্রির দিকে তাক করেন। কিন্তু এর আগেই সেন্ট্রি গুলি করে। ভাগ্যক্রমে রক্ষা পান তিনি। কেবল তাঁর মাথার ঝাঁকড়া চুলের একগুচ্ছ উড়ে যায়। গুলির শব্দে ঘুমন্ত পুলিশরা জেগে ওঠে এবং দ্রুত তৈরি হয়ে গুলি শুরু করে।

ওদিকে সাদীর সহযোদ্ধারাও সংকেতের অপেক্ষা না করে গুলি শুরু করেন। ফলে সাদী ও তাঁর সঙ্গে থাকা সহযোদ্ধা ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ে যান। তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যায় অসংখ্য গুলি। অনেক কষ্টে তাঁরা থানার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। পরে তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালান। পুলিশ সদস্যরা পালিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজানুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম বাউচাইল, ইউনিয়ন রতনপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মো. আবদুল খালেক খান, মা মাহফুজা খানম। স্ত্রী নূরজাহান খানম। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৪।

মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। তাঁরা অবস্থান নিচ্ছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। একটি দলে আছেন মিজানুর রহমান। তিনি একটি উপদলের (প্লাটুন) দলনেতা। তাঁদের সবার মধ্যে টানটান উত্তেজনা। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ করল। বিপুল বিক্রমে তাঁরাও পাল্টা আক্রমণ চালালেন। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। রক্তক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধে তাঁর চোখের সামনে হতাহত হলেন কয়েকজন সহযোদ্ধা। মিজানুর রহমান দমে গেলেন না। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। একটানা কয়েক দিন চলা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাঁরাই জয়ী হলেন। এ ঘটনা আখাউড়ায় ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেটের মধ্যে রেল যোগাযোগের জন্য আখাউড়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক স্টেশন। আখাউড়ার কাছেই ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী শহর আগরতলা। ১৯৭১ সালে আখাউড়ায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী এক প্রতিরক্ষা অবস্থান।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আখাউড়া দখলের জন্য মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সেখানে সমবেত হয়। যৌথ বাহিনীর পরিকল্পনা ছিল মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্স ও মিত্রবাহিনীর মাউন্টেন ডিভিশন তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে আখাউড়া দখলের। মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্স এবং ৩ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা উত্তর দিক থেকে আখাউড়ার দিকে অগ্রসর হন। এস ফোর্সের বি কোম্পানির একটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান।

AMARBOI.COM

মুক্তিযোদ্ধারা ১ ডিসেম্বর আখাউড়ার কাছে সমবেত হওয়ামাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে; বিমান হামলাও চালায়। এতে মুক্তিযোদ্ধারা দমে যাননি। তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন।

৩ ডিসেম্বর সকাল থেকে মিজানুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাল্টা অভিযান শুরু করেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাঁরা আখাউড়ার বিরাট এলাকা দখল করতে সক্ষম হন। আখাউড়ায় ৫ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এরপর গোটা আখাউড়া মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে।

৩ ডিসেম্বরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মিজানুর রহমানের দলনেতা (কোম্পানি অধিনায়ক) লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামানসহ আট-নয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও ২০ জন গুরুতর আহত হন। পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে ১৯-২০ জন নিহত ও অসংখ্য আহত হয়। অনেকে আত্মসমর্পণ করে।

মিজানুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বি কোম্পানিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকায় যুদ্ধ করেন। পরে ৩ নম্বর সেক্টর (আশ্রমবাড়ী-বাঘাইছড়ি সাবসেক্টর) এবং এস ফোর্সের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মু শামসুল আলম, বীর প্রতীক

পৈতৃক নিবাস ভারত। বর্তমান ঠিকানা অরণ্য, ১৩১ কাজলা, তালাইমারির মোড়, রাজশাহী। বাবা আলমাস উদ্দিন মণ্ডল, মা সালেহা খাতুন। স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩।

মু শামসুল আলম ১৯৭১ সালে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৮ মার্চ তিনি একদল প্রতিরোধযোদ্ধা নিয়ে রাজশাহীর নন্দনগাছি সেতুর কাছে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে দুই দিন যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তাঁদের হাতে সব পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

পরবর্তী সময়ে রাজশাহী শহর মুক্ত করার জন্য প্রতিরোধযোদ্ধারা ৩ এপ্রিল ভোরে রাজশাহী সেনানিবাস আক্রমণ করেন। মু শামসুল আলম সেই আক্রমণে অগ্রবর্তী দলের সর্বাগ্রে স্কাউট হিসেবে যুদ্ধে অংশ নেন। রাজশাহী শহর মুক্ত হয় এবং প্রতিরোধযোদ্ধারা ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সেনাদের ঘিরে ফেলেন। যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়।

১০ এপ্রিল ঢাকা থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন সেনা রাজশাহীর পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদের (বীর প্রতীক) নির্দেশে মু শামসুল আলম ও আবু বকর সিদ্দিক (বীর বিক্রম) মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল নিয়ে পাকিস্তানিদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে অগ্রসর হন। তাঁরা বনপাড়া-ঝলমলিয়া পর্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু কেবল ৩০৩ রাইফেল ও এলএমজি দিয়ে তাঁদের পক্ষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করা সম্ভব হয়নি। ঝলমলিয়া সেতুর কাছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কিছু প্রতিরোধযোদ্ধা আহত হন। ১২ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চারঘাট ও সারদা দখল করে। প্রতিরোধযুদ্ধে সহযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিক শহীদ হন। মু শামসুল আলম অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। এরপর তিনি ভারতে যান। নন্দীরভিটা ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকাকালে রাজশাহী অঞ্চলে কয়েকটি গেরিলাযুদ্ধে অংশ নেন।

মু শামসুল আলম অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে ১১ নম্বর সেক্টরে সাবসেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন এবং বাহাদুরাবাদ, দেওয়ানগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী মুক্ত এলাকায় প্রতিরক্ষাবূহ্য গড়ে তোলেন। নভেম্বরের নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধাভিযানে তাঁরা নিজেদের কোনো ক্ষতি ছাড়াই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন এবং সব ফেরি ও জেনারেটর ধ্বংস করেন। এই অভিযানের ফলে বাহাদুরাবাদ দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে পাকিস্তানিদের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ করে।

মু শামসুল আলম পরবর্তী সময়ে দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুর রেলপথ ধরে তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জামালপুর শহরাভিমুখে অগ্রসর হয়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে জামালপুর আক্রমণে অংশ নেন। জামালপুরে পাঁচ দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১১ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহাম্মদ আইনউদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম লক্ষ্মীপুর, উপজেলা কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা বাসা-১১৬, লেন-৬, ডিওএইচএস, মহাখালী। বাবা সুরুজ আলী, মা চান বানু। স্ত্রী নাজমা আক্তার চৌধুরী। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৫।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মুহাম্মদ আইনউদ্দিন প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শোনা যাক তাঁর বয়ানে (১৯৭৩) :

'মনতলা ক্যাম্প থেকে দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি সোনামুড়া [ভারত] গেলাম। ২৩ নভেম্বর সোনামুড়ায় যে ভারতীয় সেনারা প্রতিরক্ষা নিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে আমি দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হই। বাংলাদেশের ভেতরে আরও দুটি দল [দুই কোম্পানি] আগে থেকেই অবস্থান করছিল। আমাকে নির্ভয়পুর [ভারত] যেতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কুমিল্লা দখল করতে বলা হলো। সেখানে যাওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার টম পান্ডে আমাকে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার মাঝে চিওড়ায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নিতে বললেন।

'৩ ডিসেম্বর চিওড়া গেলাম। পৌঁছানোর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কোনো রকম প্রতিরোধ না করে পেছনের দিকে চলে গেল। তারা চিওড়া বাজারের উত্তর দিকে ডিফেন্স নিয়েছিল। ৫ ডিসেম্বর সকালে বালুতুফা (কুমিল্লা শহরের পূর্ব পাশে) গিয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আমরা বালুতুফায় যেখানে পৌঁছাই, সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ডিফেন্স ছিল কয়েক মাইল দূরে। সেখানে ছিল পাকা বাংকার। আমি ভাবলাম, পাকিস্তানি সেনারা পাকা বাংকারে ডিফেন্স নিয়ে আছে। অল্পসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে তাদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

'এরপর পাকিস্তানি সেনাদের পেছন দিয়ে আমরা ৬ ডিসেম্বর কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করি।

'ওই দিনই আমরা কুমিল্লা সেনানিবাসে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু পরে ভারতীয় হাইকমান্ড থেকে আমাদের জানানো হয়, সেনানিবাস আক্রমণ করতে হবে না। এ নির্দেশের পর আমি সেনানিবাস আক্রমণের পরিকল্পনা বন্ধ করি। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন আমি সেনানিবাসে উপস্থিত ছিলাম।'

মুহাম্মদ আইনউদ্দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সাত দিন আগে থেকে বদলির কারণে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন।

প্রতিরোধযুদ্ধে মুহাম্মদ আইনউদ্দিনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অ্যান্ডারসন খাল সেতুসংলগ্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ২৯ মার্চ দুপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি কনভয় খালের কাছে পৌঁছালে তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করেন। এতে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর তিনি প্রথমে ২ নম্বর সেক্টরে সাবসেক্টর অধিনায়ক হিসেবে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর কে ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আকবর হোসেন, বীর প্রতীক

নানুয়ারদিঘির পাড়, বজ্রপুর, সিটি করপোরেশন, কুমিল্লা।
বাবা হোসেন আলী, মা সালেহা হোসেন।
স্ত্রী সুলতানা আকবর। তাঁদের এক মেয়ে ও চার ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ০৬। মৃত্যু ২০০৬।

মুক্তিবাহিনীর দুটি দল একযোগে আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছাতকের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর একটি দলের (ব্রাভো) নেতৃত্বে ছিলেন আকবর হোসেন। অপরটি আলফা দল।

ছাতক যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধকৌশল অনুযায়ী আলফা দলের মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রবর্তী দল হিসেবে আক্রমণ পরিচালনা করে। পেছনে ব্রাভো দল। ১৪ অক্টোবর দুপুরে দুই দল একযোগে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তাঁদের রিকোয়েললেস রাইফেলের গোলায় পাকিস্তানিদের অনেক বাংকার ধ্বংস হয়। প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ব্রাভো দলের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যকর সহায়তায় আলফা দলের মুক্তিযোদ্ধারা সন্ধ্যার আগেই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েন। এ সময় আকবর হোসেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে দ্রুত অগ্রবর্তী দলের পূর্বের অবস্থানে গিয়ে অবস্থান নেন। তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। দুই দলের মুক্তিযোদ্ধারাই সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

পরদিন (১৫ অক্টোবর) পাকিস্তানি তিনটি হেলিকপ্টার মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে। এতে আকবর হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা এবং অপর দলের মুক্তিযোদ্ধারা বিচলিত হননি বা মনোবলও হারাননি। সারা দিন যুদ্ধ চলে। ১৬ অক্টোবর সকাল থেকে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। সন্ধ্যার মধ্যেই গোটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকা তাঁদের দখলে চলে আসে। পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

কিন্তু তার পরেই হঠাৎ যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তের বাইরে যেতে থাকে। সিলেট থেকে ছাতকে আক্রান্ত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য সাহায্য (রিইনফোর্সমেন্ট) চলে আসে। তারা দোয়ারাবাজার বেড়িবাঁধ দিয়ে ছাতকে অগ্রসর হয়। নতুন এই পাকিস্তানি সেনারা পেছনের উঁচু টিলাগুলোতে অবস্থান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

নতুন পাকিস্তানি সেনাদের আগমন ছিল অভাবিত। কারণ, পেছনে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি কাটঅফ পার্টি। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট প্রতিহত করা। দল দুটি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। সেটা আরেক কাহিনি।

তিন দিন স্থায়ী যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ছাতকে প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ছাতক থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী; দুই পক্ষেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মো. আকবর হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে। পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ১৯৭১-এ কর্মরত ছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিলে ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ভারতে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ২ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যুক্ত হন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল আজিজ, বীর প্রতীক

গ্রাম ষাটশালা, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।
বাবা এম আবদুল মজিদ, মা সুফিয়া মজিদ।
স্ত্রী নীলুফার আজিজ। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৮। মৃত্যু ১৯৯৯।

১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরে খবর এল, বাংলাদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ৭ জুন জাতিসংঘের একটি পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় আসবে।

এরপর ভারত থেকে ঢাকায় আসে একদল গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে ছিলেন মো. আবদুল আজিজ। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা কীভাবে এই অপারেশন করলেন, সেই বিবরণ শোনা যাক তাঁর নিজেরই বয়ানে (১৯৮৯):

'আমরা ৪২ জনের দল মনতলি ক্যাম্প হয়ে ৬ জুন নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার গোপালদী আসি। সেখানে ১০টি দলে বিভক্ত হয়ে যার যার লক্ষ্যস্থলে রওনা হলাম।

'আমাদের দলে মাতুয়াইলের অলি, ঢাকার বাবুল (শহীদ আজিজুল ইসলাম বীর বিক্রম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চন্দ্রপুর-লাতুমুড়া যুদ্ধে শহীদ) ও আমি। আমার সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। তাঁর নাম আমার এখন মনে নেই।

'আমাদের টার্গেট ছিল যাত্রাবাড়ী ইলেকট্রিক সাবস্টেশন। রাত ১২টার দিকে যাত্রাবাড়ী পৌঁছে দেখতে পেলাম, সেখানে ২০ জন পাকিস্তানি সেনা-পুলিশ পাহারায়। আরও আছে দুটি এলএমজি পোস্ট। আমাদের কাছে মাত্র একটা স্টেনগান। তাই আমাদের বাধ্য হয়েই যেতে হলো বিকল্প টার্গেট সায়েদাবাদ সেতুর নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া মেইন ইলেকট্রিক কেবল লাইন ধ্বংস করার জন্য।

'আমাদের কাছে ছিল ৩০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ। অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা সব এক্সপ্লোসিভ কেবলে লাগিয়ে টাইম ফিউজে আগুন লাগিয়ে দৌড় দিলাম। অনেক দূর যাওয়ার পরও দেখি, বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে না। সেখানে আবার ফিরে যাব কি না ভাবছি, এমন সময় বিদ্যুৎ চমকের আলো ছড়িয়ে ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এর ধাক্কায় আমরা চারজনই মাটিতে পড়ে গেলাম।

'পাঁচ পাউন্ড হলেই কাজ হতো, সেখানে দিয়েছি ৩০ পাউন্ড। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন। এরপর আমরা পালিয়ে যাই। পরদিন ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে দেখতে পাই, সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ। সেতুর বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মক ফাটল ধরেছে। তিনটি ফাটল বেশ বড়। বড় ফুটো হয়ে গেছে।'

মো. আবদুল আজিজ ১৯৭১ সালে ঢাকা কলেজের বিএ (পাস) ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ছাত্ররাজনীতিও করতেন। তখন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ছিলেন। মার্চ মাসে চলমান অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের শেষে ভারতে যান। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধে যোগ দেন। সায়েদাবাদের অপারেশন ছিল তাঁর প্রথম অপারেশন। পরে অপারেশন করেন গ্রিন রোডসহ আরও কয়েকটি জায়গায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল কুদ্দুস, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণ লক্ষ্মণখোলা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
বাবা ইয়াদ আলী বেপারী, মা মহিতুন নেছা।
স্ত্রী গোলেছা বেগম। তাঁদের ছয় ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৭৩। মৃত্যু ২০০২।

মো. আবদুল কুদ্দুসসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা গোপনে এসেছেন বাংলাদেশের ভেতরে। তাঁদের অবস্থান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে। একদিন রাতে তাঁরা গোপন অবস্থান থেকে বেরিয়ে পড়েন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, মো. আবদুল কুদ্দুস তাঁর দল নিয়ে অবস্থান নেন আক্রমণস্থলের অদূরে একটি সেতুর কাছে। তাঁর ওপর দায়িত্ব, তাঁদের মূল আক্রমণকারী দলের নিরাপত্তা দেওয়া এবং আক্রমণ চলাকালে আক্রান্ত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য যাতে কোনো সাহায্য (রিইনফোর্সমেন্ট) যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

মুক্তিযোদ্ধাদের মূল আক্রমণকারী দল নির্ধারিত সময়েই আক্রমণ চালায়। তাদের প্রথম রকেটের নির্ভুল আঘাতেই সেখানকার জেনারেটর অকেজো এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা অন্ধকারে ছেয়ে যায়। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের সামলে নিয়ে পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু তাদের শেষরক্ষা হয়নি। প্রচণ্ড আক্রমণে ছিন্নভিন্ন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা বাঁচার জন্য সেতু এলাকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন মো. আবদুল কুদ্দুসের দলের আক্রমণে তারা বেশির ভাগ নিহত হয়। এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই বাহাদুরাবাদ ঘাটে। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি।

ঘাটে তখন পাঁচটি জেটি ছিল। এর মধ্যে দুটি যাত্রীবাহী স্টিমার, দুটি সামরিক যানবাহন, রেল ওয়াগন, তেলের ট্যাংকার, একটি সি-ট্রাক ও লঞ্চ সামরিক (আর্টিলারিসহ) মালামাল পারাপারের কাজে ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া সেখানে ছিল রেলওয়ের ওয়ার্কশপ, পাওয়ার হাউস ও অন্যান্য স্থাপনা। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা ও ইপিসিএএফ নিহত হয়। পুরোপুরি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় জেটি, স্টিমার, কয়েকটি রেলবগি, ওয়াগন এবং অন্যান্য স্থাপনা।

মো. আবদুল কুদ্দুস চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা কোম্পানিতে। রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। মার্চ মাসে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে তাঁদের সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। তিনি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে মোতায়েন ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার।

তাঁদের কোম্পানির অধিনায়ক ছিল অবাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা সিনিয়র জেসিওর নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগ দেন। পার্বতীপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তাঁরা অ্যামবুশ করেন। এ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে চলে যান। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। বাহাদুরাবাদ, বৃহত্তর সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট, রাধানগর, ছাতকসহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে তিনি সাহস, দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল মতিন, বীর প্রতীক

গ্রাম রসুলপুর, সদর, মৌলভীবাজার। বর্তমান ঠিকানা সড়ক ১১৪, নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা মো. আলফু মিয়া, মা সখিনা খাতুন। স্ত্রী আর্জুমান্দ আরা চৌধুরী। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০১। মৃত্যু ২০০৯।

খুব ভোরে গোলাগুলির শব্দ কানের পর্দায় আছড়ে পড়তেই সতর্ক হয়ে উঠলেন মো. আবদুল মতিন। দ্রুত তৈরি হয়ে একজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিজেদের প্রতিরক্ষা অবস্থান দেখতে। শেষে গেলেন মেশিনগান পোস্টে। তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে সেখানে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। সাহসের সঙ্গে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করে চললেন। যুদ্ধ চলল সারা দিন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি এ ঘটনা ঘটেছিল মাস্তাননগরে প্রতিরোধযুদ্ধের সময়।

চট্টগ্রাম-ঢাকা রেলপথে মাস্তাননগর। এখানে সংঘটিত এই যুদ্ধের বিবরণ ধরা আছে মো. আবদুল মতিনের নিজের লেখাতেই। তিনি লিখেছেন, '...আমাকে পাঠানো হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল-সড়ক বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। আমরা প্রথমে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিই কুমিল্লা আর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের মাঝামাঝি জায়গায়।

'আমরা প্রথম ডিফেন্স চার দিন ধরে রাখতে পেরেছিলাম। তারপর পিছিয়ে সীতাকুণ্ডে পরবর্তী ডিফেন্স নিই। সীতাকুণ্ডে সপ্তাহ খানেক ছিলাম। সীতাকুণ্ডের পর মাস্তাননগরে ডিফেন্স গ্রহণ করি। এটাই আমার জীবনের স্মরণীয় ডিফেন্স। সেখানে সাত দিন ছিলাম। শেষ দিন সূর্য ওঠার আগে খুব ভোরবেলায় গোলাগুলির শব্দ পেয়ে হাবিলদার নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমাদের মেশিনগান পোস্টে গেলাম।

'আমি যাওয়ার পর গোলাগুলির প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়। সারা দিন চলার পর সন্ধ্যার দিকে ট্রেঞ্চে বসে মনে হলো আমাদের পেছনেও গোলাগুলি হচ্ছে। আমার ডান-বামে আমাদের অবস্থান ঠিক আছে কি না জানার জন্য একজন সৈনিককে ডান দিকে পাঠালাম। সে ফিরে এসে জানাল, ডান দিকে আমাদের অবস্থানে পাকিস্তানি সেনারা এসে গেছে। বাম দিক থেকেও একই খবর পেলাম।

'উদ্বেগে সিগারেট ধরিয়েছি, এ সময় ট্যাংকের গোলা এসে আমাদের বাংকারের ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, মৃত্যু নিশ্চিত। আবু শামার (সুবেদার, মেশিনগান পোস্টের চার্জে ছিলেন) মতো সাহসী সৈনিক আর দেখিনি। সে বলল, "স্যার, আমি বেঁচে থাকতে আপনার কিছু হবে না, ইনশাআল্লাহ।" আমার কাছে অস্ত্র ছিল না। শামা আমাকে একটা পিস্তল দিল। যেন ধরা পড়লে আত্মহত্যা করতে পারি।'

মো. আবদুল মতিন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। তিনি কোম্পানি (ব্রাভো) কমান্ডার ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে ২ নম্বর সেক্টরে স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল মমিন, বীর প্রতীক

গ্রাম কামরাঙ্গা, উপজেলা সদর, চাঁদপুর।
বাবা হায়দার আলী মুন্সি, মা নোয়াবজান বিবি।
স্ত্রী আমেনা খাতুন। তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৬। শহীদ ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলেও ঢাকা শহরের একটি অংশ (মিরপুর) তাদের সহযোগী অবাঙালিদের (বিহারি) দখলে থেকে যায়। এভাবে কেটে গেল আরও প্রায় দেড় মাস। অবাঙালিরা আত্মসমর্পণ করল না। এরপর সরকার সেখানে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের অভিযান চালানোর নির্দেশ দিল। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে আক্রমণ চালানোর আগে অবাঙালিদের আবারও আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করার বদলে আকস্মিক আক্রমণ চালাল মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হলেও অবাঙালিদের হাতে শহীদ হলেন লেফটেন্যান্ট সেলিম, মো. আবদুল মমিনসহ প্রায় দেড় শ জন মুক্তিযোদ্ধা।

মিরপুর ছিল অবাঙালি-অধ্যুষিত এলাকা। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে মিত্রবাহিনীর ১০ বিহার রেজিমেন্ট মিরপুরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে। সেখানে বিপুলসংখ্যক অস্ত্রধারী অবাঙালি আত্মগোপন করে ছিল। ৩০ জানুয়ারি মুক্তিযোদ্ধারা (দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পুলিশ) মিরপুরে অভিযান শুরু করেন। তাঁরা সেখানে যাওয়ামাত্র প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হন।

মো. আবদুল মমিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। মো. আবদুল মমিন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মেজর কে এম সফিউল্লাহর (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান) নেতৃত্বে অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধে। জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহে গিয়ে তিনি অন্যদের সঙ্গে মিলিত হন এবং সাহসের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন। পরে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টর এবং এস ফোর্সের অধীনে।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আখাউড়া যুদ্ধে মো. আবদুল মমিন যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। ৩০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আখাউড়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল অংশ নেয়। মো. আবদুল মমিনের দল আখাউড়ার উত্তর দিকে সিঙ্গারবিল হয়ে অগ্রসর হয়। সিঙ্গারবিলের আশপাশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সিঙ্গারবিল জেটি ও পার্শ্ববর্তী রাজাপুর দখল করে নেন। এরপর তাঁরা আজমপুর রেলস্টেশনে আক্রমণ চালান।

মুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি দল ১ ডিসেম্বর দুপুরে আজমপুর রেলস্টেশন দখল করলেও পাকিস্তানি সেনারা পাল্টা আক্রমণ করে কয়েক ঘণ্টা পর স্টেশনটি পুনর্দখল করে নেয়। তখন এস ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহ আজমপুর রেলস্টেশন পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেন। এরপর মো. আবদুল মমিনের দল সেখানে আক্রমণ চালায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল হাকিম, বীর প্রতীক

গ্রাম মদনেরগাঁও, উপজেলা ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
বাবা সোনা মিয়া পাটোয়ারী, মা সাহানারা বেগম।
স্ত্রী মনোয়ারা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৪।

রাতের অন্ধকারে নদীতে নেমে পড়লেন মো. আবদুল হাকিম ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা। তাঁদের বুকে গামছা দিয়ে বাঁধা লিমপেট মাইন। কোমরে ছুরি। সাঁতরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছালেন লক্ষ্যস্থলে। সফলতার সঙ্গে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে সরে গেলেন নিরাপদ স্থানে। একটু পর বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো মাইন। বিধ্বস্ত জাহাজ ডুবতে থাকল পানিতে। এ ঘটনা লন্ডন ঘাটে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবর।

লন্ডন ঘাট চাঁদপুর নৌবন্দরের অদূরে ডাকাতিয়া নদীতে। ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবর সেখানে আমেরিকার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি লোরেম নোঙর করেছিল। তাতে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য ও সমরাস্ত্র। মুক্তিবাহিনীর একদল নৌ-কমান্ডো ওই সময় অবস্থান করছিলেন চাঁদপুরে। তাঁরা খবর পাওয়ামাত্র ওই জাহাজে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

নৌ-কমান্ডো মো. আবদুল হাকিমসহ ছিলেন ১৫-১৬ জন। তাঁরা লিমপেট মাইনসহ ওই রাতেই লন্ডন ঘাটের অপর পাড়ে ডব্লিউ রহমান জুটমিলের পাশে অবস্থান নেন। ওই সময় বন্দর এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিরাপত্তাব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার ছিল। রাতে বন্দরে সার্বক্ষণিক সার্চলাইটের আলো জ্বেলে রাখা হতো। বন্দরে থাকা জাহাজের আলোও জ্বালানো থাকত। নদীতে ছিল গানবোটের অনবরত টহল।

নৌ-কমান্ডোরা এর ভেতরেই অপারেশন করার জন্য সেখানে যান। মো. আবদুল হাকিম, মোমিনউল্লাহ পাটোয়ারীসহ তিনজন নদীতে নেমে ওই জাহাজে লিমপেট মাইন লাগাতে যান। বাকিরা নদীর পাড়ে তাঁদের নিরাপত্তায় থাকেন। মো. আবদুল হাকিম ও সহযোদ্ধারা বুকে মাইন বাঁধা অবস্থায় দীর্ঘপথ সাঁতরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান। তারপর নিজেদের কচুরিপানা দিয়ে আড়াল করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাতে মাইন লাগান। মাইন লাগানোর পর তাঁরা দ্রুত সাঁতরে নিরাপদ স্থানে চলে যান। একটু পর তিনটি মাইন বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। শব্দে বন্দরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনা ও জাহাজের নাবিক ও সান্ত্রিরা হকচকিত হয়ে পড়ে।

মো. আবদুল হাকিম ও সহযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক অভিযানে এমভি লোরেম বিধ্বস্ত হয়ে পানিতে নিমজ্জিত হয়। স্বাধীনতার পর অনেক বছর সেখান থেকে সেই জাহাজ অপসারণ করা হয়নি। সেটি নৌ-কমান্ডোদের দুর্ধর্ষ অভিযানের স্মৃতি বহন করে।

মো. আবদুল হাকিম চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। ছুটি শেষ হলে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে এসেও শেষ পর্যন্ত আর যাননি। বিমানবন্দর থেকে পালিয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যোগ দেন তাতে। ভারতে যাওয়ার পর তাঁকে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বেশ কয়েকটি অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবদুল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম তামাট, উপজেলা ভালুকা, ময়মনসিংহ।
বর্তমান ঠিকানা মিরপুর, ঢাকা। বাবা আবদুল কাদের মিয়া, মা হামিদা বেগম। স্ত্রী লিলি আক্তার। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৭।

১২ অক্টোবর ১৯৭১। সকাল আনুমানিক আটটা বা সোয়া আটটা। এ সময় মো. আবদুল্লাহ দেখতে পেলেন পাঁচ-ছয়টি গরুর গাড়ি ও চার-পাঁচটি রিকশা। সেগুলোতে মালামাল ভরা। নাগরপুরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগীদের জন্য টাঙ্গাইল থেকে রসদ ও খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। সেগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এলাসিন-নাগরপুর সড়ক দিয়ে গরুর গাড়িতে করে। পাহারায় আছে তাদের সহযোগী মিলিশিয়া ও রাজাকার। মিলিশিয়া-রাজাকার প্রায় ৩০-৩৫ জন। কয়েকজন আগে-পিছে হেঁটে আসছে। বাকিরা গরুর গাড়ি ও রিকশায় বসে। তারা বুঝতেও পারল না। নিশ্চিন্ত মনে আসছে। অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধা সবার অস্ত্র। আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব মিলিশিয়া ও রাজাকাররা। বিশেষত মো. আবদুল্লাহর দুঃসাহসিকতায় তারা প্রতিরোধের সুযোগই পেল না। নিহত হলো তিনজন রাজাকার। আহত ১১ জন। বাকিরা আত্মসমর্পণ করল। এ ঘটনা এলাসিনে। এর অবস্থান টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে দক্ষিণে। মানিকগঞ্জ জেলা সীমান্তে।

মো. আবদুল্লাহ ১৯৭১ সালে তৎকালীন মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরী ছিলেন। কর্মরত ছিলেন টাঙ্গাইলের পাঁচআনি বাজার শাখায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। পরে তিনি কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। আবদুল কাদের সিদ্দিকীর দলে ছিলেন তিনি। মো. আবদুল্লাহ অনেক যুদ্ধে অংশ নেন। এর মধ্যে বাসাইলের নথখোলা, ঘাটাইল, নাগরপুর, মির্জাপুরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গার রাজবাড়ির যুদ্ধে তিনি আহত হন। তাঁর বাঁ পায়ে মর্টার শেলের স্প্লিন্টারের আঘাত লাগে। মো. আবদুল্লাহর সাহসিকতার বর্ণনা আছে সুনীল কুমার গুহের বইয়ে। তিনি লিখেছেন :

'কাদেরিয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ডের গল্প কাদের [আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম] এবং ওই বাহিনীর অন্যান্য বহু ছেলেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে থাকাকালেই, আমি একদিন কাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছিলাম যে, সে তার লড়াইয়ে সঙ্গীদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ এবং অসম সাহসী যোদ্ধা মনে করে?

'প্রশ্নটির সোজা উত্তর না দিয়ে, সে আমাকে বলেছিল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা একজন-দুজন নয়, বহু ছিল। তাদের মধ্যে কে যে দুর্ধর্ষ তা বলা মোটেই সহজ হবে না।...আবার সবচেয়ে সাহসী ছেলে যে কে, তাও যদি জিজ্ঞেস করেন, তারও উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না। অসম সাহসী ছেলেও দেখেছি অসংখ্য। তবুও একটি ছেলের কথা আমি আপনাকে বলতে পারি। যাকে আমি শুধু অসম সাহসীই মনে করি না, স্রেফ ভয় বিষয়ে বোধশক্তিহীন বলেই মনে করি। যাকে আপনি আবদুল্লাহ নামেই চেনেন। তারপর কাদের আবদুল্লাহর অতি অদ্ভুত যুদ্ধকর্মের আর সেই সঙ্গে তার ভয় বিষয়ে বোধহীনতার বিষয়েও কয়েকটি গল্প আমাকে শুনিয়েছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আবু তাহের, বীর প্রতীক

গ্রাম পিরকাসিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা। বাবা আশরাফ আলী ভূঁইয়া, মা জোবেদা খাতুন। স্ত্রী সুফিয়া খাতুন। তাঁদের পাঁচ মেয়ে ও তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৯২। মৃত্যু ১৯৭৯।

দুপুর থেকে শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড যুদ্ধ। মো. আবু তাহের ও তাঁর সহযোদ্ধারা আক্রমণ চালান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছাতকের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। সুরমা নদীর তীরে ছাতক।

প্রথমে মুক্তিবাহিনীর আলফা দল ১৪ অক্টোবর দুপুরের আগেই সিমেন্ট ফ্যাক্টরির এক-দেড় শ গজের মধ্যে পৌঁছায়। তাদের রিকোয়েললেস রাইফেলের (আর আর) গোলায় পাকিস্তানি সেনাদের কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়ে যায়। সন্ধ্যার আগেই এই দল ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

মো. আবু তাহের ও তাঁর সহযোদ্ধারা ছিলেন একটু পেছনে। এ সময় তাঁরা এগিয়ে আলফা দলের কাছাকাছি অবস্থান নেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। পরদিন (১৫ অক্টোবর) পাকিস্তানি তিনটি হেলিকপ্টার থেকে তাঁদের ওপর মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করা হতে থাকে। কিন্তু তার পরও তাঁরা বিচলিত বা মনোবল হারাননি। আবু তাহের ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেন।

১৫ অক্টোবর সারা দিন যুদ্ধ চলে। ১৬ অক্টোবর সকালে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। আলফা দল সামনে থাকে। আবু তাহের ও তাঁর সহযোদ্ধারা পেছন থেকে ফায়ার সাপোর্ট দেন। সন্ধ্যার মধ্যেই গোটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে। পাকিস্তানি সেনারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তের বাইরে যেতে থাকে। কারণ, সিলেট থেকে ছাতকে আক্রান্ত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য সাহায্য (রিইনফোর্সমেন্ট) চলে আসে। তারা দোয়ারা বাজার বেড়িবাঁধ দিয়ে ছাতকের দিকে অগ্রসর হয়। নতুন এই পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পেছনের উঁচু টিলাগুলোতে অবস্থান নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

ফলে মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। নতুন এই পাকিস্তানি সেনাদের আগমন ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। কারণ, পেছনে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি কাট অফ পার্টি। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য আসা সাহায্য প্রতিহত করা। তিন দিন স্থায়ী যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা ছাতকে প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ছাতক থেকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়।

মো. আবু তাহের ইপিআরে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর সেক্টরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৮ মার্চ বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে তিনি ভারতে যান। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত হন। শেরপুর জেলার নকশী বিওপির যুদ্ধ, বৃহত্তর সিলেট জেলার টেংরাটিলা ও সালুটিকরসহ বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. আলতাফ হোসেন খান

বীর প্রতীক

গ্রাম বোয়ালিয়া, উপজেলা নলছিটি, ঝালকাঠি।
বাবা সুলতান খান, মা ফাতেমা বেগম।
স্ত্রী সরবানু বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৬৭। মৃত্যু ১৯৮০।

নির্ধারিত সময়ে মো. আলতাফ হোসেন খান নিজ দলের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। একযোগে গর্জে ওঠে তাঁদের সবার অস্ত্র। পাকিস্তানিদের দিক থেকেও একই সময়ে পাল্টা গোলাগুলি শুরু হয়। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

মুহূর্তে ঘটে প্রলয় কাণ্ড। গোলাগুলি আর আগুনের শিখায় চারদিকের আকাশ রক্তিম হয়ে পড়ে। শেষ রাত থেকে সারা দিন যুদ্ধ হয়। পরদিনও। কয়েক দিন একটানা যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

কয়েক দিন ধরে চলা এ যুদ্ধে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় ১০০ জন পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ এবং তাদের স্থানীয় সহযোগী বাঙালি-অবাঙালি পুলিশ ও রাজাকার নিহত হয়।

এ যুদ্ধে মো. আলতাফ হোসেন খান দলনেতা হিসেবে যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর দুঃসাহসিকতায় সহযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হন। তাঁরাও পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হন। তাঁদের দুঃসাহসিক আক্রমণে পাকিস্তানিদের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে। তাঁদের অস্ত্রের গুলিতে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও রাজাকার নিহত হয়।

এ ঘটনা চিলমারীর। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে চিলমারী। কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত। চিলমারীর অপর প্রান্তে রৌমারী।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চিলমারীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ এলাকায় সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন চিলমারীতে শক্ত এক প্রতিরক্ষা তৈরি করে। তাদের মূল অবস্থানগুলো ছিল হাইস্কুল, রেলস্টেশন ও ওয়াপদা অফিসে।

মো. আলতাফ হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা (এ) কোম্পানিতে। রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মার্চ মাসে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে তাঁদের সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। তিনি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে মোতায়েন ছিলেন।

আলতাফ হোসেনের কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন অবাঙালি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর কোম্পানির সিনিয়র জেসিওর নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগ দেন। পার্বতীপুরসহ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করেন। পার্বতীপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে তাঁরা প্রথমে অ্যামবুশ করেন। এরপর কয়েক ঘণ্টা সম্মুখযুদ্ধ হয়। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে তিনি ভারতে যান।

ভারতে পুনর্গঠিত হওয়ার পর নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর, বৃহত্তর সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট, ছাতক, টেংরাটিলাসহ বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস, দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. ইব্রাহিম খান, বীর প্রতীক

গ্রাম বরঙ্গাখোলা, সদর, মানিকগঞ্জ। বাবা জমসের খান, মা আমাতুন বিবি। স্ত্রী খুরশিদা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৪। গেজেটে নাম মো. ইব্রাহিম। মৃত্যু ১৯৯১।

১৯৭১ সালের ২ নভেম্বরের। গভীর রাত (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ৩ নভেম্বর)। নিঃশব্দে শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে সমবেত হলেন মো. ইব্রাহিম খানসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। অদূরে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্র।

মো. ইব্রাহিম খান ও তাঁর সহযোদ্ধাদের লক্ষ্য ওই বিদ্যুৎকেন্দ্র। তাঁরা সেখানে গেরিলা অপারেশন করবেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওয়াচ টাওয়ারে সার্চ লাইট জ্বালানো। টাওয়ারে সতর্ক পাহারায় আছে পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগীরা।

প্রায় দুঃসাধ্য এক মিশন। পাকিস্তানি সেনারা যদি টের পায়, তবে সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে। সে জন্য মো. ইব্রাহিম খানসহ সবাই সতর্ক। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা যেতে সক্ষম হলেন ট্রান্সফরমারের কাছে। বাকিরা থাকলেন তাঁদের নিরাপত্তায়।

ট্রান্সফরমার ধ্বংসের জন্য বানানো হয়েছে পিকে চার্জ। ট্রান্সফরমারের গায়ে সেটা লাগিয়ে সংযোগ করা হবে কর্ডেক্স। কর্ডেক্সের মাঝ-বরাবর ডেটোনেটর। সংযোগ তারে আগুন দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটবে বিস্ফোরণ। সফলতার সঙ্গেই সব কাজ শেষ হলো।

এবার নিরাপদে ফিরে যাওয়ার পালা। মো. ইব্রাহিম খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা ফিরে যাচ্ছেন। তখনই ঘটল বিপত্তি। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল অনেক অস্ত্র। মো. ইব্রাহিম খান ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাল্টা গুলি করতে করতে দ্রুত পিছিয়ে যেতে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলির পাশাপাশি হ্যান্ড গ্রেনেডও ছুড়তে থাকল। বিস্ফোরিত একটি হ্যান্ড গ্রেনেডের স্প্লিন্টার অলক্ষ্যে ছুটে এল মো. ইব্রাহিম খানের দিকে। আঘাত করল তাঁর মুখে। ছিটকে পড়লেন মাটিতে। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। একজন সহযোদ্ধার সহযোগিতায় চলে গেলেন নিরাপদ স্থানে।

এ সময়ই বিদ্যুচ্চমকের মতো একঝলক আলো। তারপর পাকিস্তানি সেনাদের হতবাক করে দিয়ে একের পর এক ঘটতে লাগল বিকট বিস্ফোরণ। বাতাসে ট্রান্সফরমার কয়েলের পোড়া গন্ধ। রক্তাক্ত মো. ইব্রাহিম খান ভুলে গেলেন সব যন্ত্রণা।

সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে ধ্বংস হয় সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারটি ট্রান্সফরমার। এতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের অনেক অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। আর মো. ইব্রাহিম খান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হন। তাঁর ডান চোখ নষ্ট ও চোয়ালের হাড় ভেঙে যায়।

মো. ইব্রাহিম খান ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্রে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জুন মাসের মাঝামাঝি যুদ্ধে যোগ দেন। ২ নম্বর সেক্টরে প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্র্যাক প্লাটুনের অধীনে যুদ্ধ করেন। ঢাকা শহর ও আশপাশের এলাকায় বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশনে তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. এজাজুল হক খান, বীর প্রতীক

গ্রাম গোয়ালগ্রাম, উপজেলা দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
বাবা কিফাত আলী খান, মা শাহেরা খাতুন।
স্ত্রী মলিদা খানম। তাঁদের এক মেয়ে ও তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৪৪।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটির কাছাকাছি পরিখা খনন করে অবস্থান নেন। কয়েকটি দল ও উপদলে বিভক্ত ছিলেন তাঁরা। তাঁদের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন মেজর আবু তাহের (বীর উত্তম, পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। তাঁর সঙ্গে থাকা উপদলে ছিলেন মো. এজাজুল হক খান।

মধ্যরাতে শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ। বারুদের উৎকট গন্ধ, গোলাগুলিতে প্রকম্পিত হয় চারদিক। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়।

সকালের দিকে যুদ্ধের তীব্রতা কমে যায়। এ সময় অগ্রভাগে থাকা মুক্তিযোদ্ধা দলের দলনেতা অধিনায়ক আবু তাহেরকে জানান, তাঁরা পাকিস্তানি দুর্গের প্রায় ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। আবু তাহের বিজয় প্রায় হাতের মুঠোয় ভেবে মো. এজাজুল হক খানদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। একটু পর তিনি নিজেও সামনে এগিয়ে যান।

তখন আনুমানিক সকাল নয়টা। এ সময় হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া একটি শেল পড়ে আবু তাহেরের সামনে। বিস্ফোরিত শেলের স্প্লিন্টার লাগে তাঁর পায়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন-চারজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মো. এজাজুল হক খান ছিলেন সামনে কিছুটা এগিয়ে। তিনি দ্রুত এসে কয়েকজনের সহায়তায় আবু তাহেরকে উদ্ধার করে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১৪-১৫ নভেম্বরের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কামালপুর বিওপিতে। জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কামালপুর গ্রামের মাঝামাঝি বিওপির অবস্থান। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ছিল গোটা বিওপি। মূল প্রতিরক্ষার চারপাশে ছিল অনেক বাংকার। মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সেদিন অগ্রবর্তী দলের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য ওই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মূল প্রতিরক্ষায় ঢুকে যান। অনেক মুক্তিযোদ্ধা মাইন ও গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার পরও তাঁরা থেমে যাননি। দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় এগিয়ে যান। অবশ্য বিজয়ী হতে পারেননি।

মো. এজাজুল হক খান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে এর অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে তিনি বন্দী হন। পাকিস্তানিরা তাঁকে নির্যাতন করে, তবে হত্যা করেনি। জুলাই মাসের শেষে সেনা কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারনামা নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেয় এবং চাকরিতে পুনর্বহাল করে।

কয়েক দিন পর তিনি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার কথা বলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যান। তারপর পালিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টর এলাকায় কামালপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. ওয়ালিউল ইসলাম, বীর প্রতীক

ওয়ার্ড নম্বর ১৬, বটতলা, উত্তর আলেকান্দা সড়ক, বরিশাল। বাবা মো. ওয়াজেদ আলী, মা আশরাফুননেসা। স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮।

১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর। মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি দল ভারত থেকে এসে সমবেত হলো কৈলাসটিলায়। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতৃত্বে মো. ওয়ালিউল ইসলাম।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে শমশেরনগরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। মো. ওয়ালিউল ইসলামের দল এবং অপর দলের ওপর দায়িত্ব, ভানুগাছে একদল পাকিস্তানি সেনা আছে, তারা যাতে পাল্টা আক্রমণ না করতে পারে, সেটাকে গার্ড করতে হবে।

১ ডিসেম্বর। মো. ওয়ালিউল ইসলাম সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিলেন ভানুগাছে। তাঁদের জানানো হয়েছে, সেখানে আছে এক প্লাটুন পাকিস্তানি সেনা। কিন্তু প্রতিরক্ষা অবস্থান নেওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, পাকিস্তানি সেনা সেখানে অনেক এবং তারা ১২০ মিমি মর্টারে সজ্জিত। বেশ শক্ত পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান।

মো. ওয়ালিউল ইসলাম এতে বিচলিত না হয়ে সহযোদ্ধাদের মনে সাহস জোগালেন। পরদিন যোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলো। তবু তাঁরা হতোদ্যম হলেন না. ওয়ালিউল ইসলামের নেতৃত্বে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরদিন সকালে মুক্ত করলেন ভানুগাছ। ভানুগাছ যুদ্ধে মো. ওয়ালিউল ইসলাম যথেষ্ট রণকৌশল ও সাহস প্রদর্শন করেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই মুক্ত হয় ভানুগাছ। দখলে আসে পাকিস্তানি সেনাদের ফেলে যাওয়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ।

মো. ওয়ালিউল ইসলাম ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। কুমিল্লার ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে মা-বাবার অমতে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ওই কলেজে। তখন ছাত্ররাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মো. ওয়ালিউল ইসলাম ২৬ মার্চ থেকেই তাতে যোগ দেন। কয়েকজন সহপাঠীকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামের ষোলশহর এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। একপর্যায়ে তাঁরা অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। তিনি বেশ কয়েকটি প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এর মধ্যে কালুরঘাট, মহালছড়ির যুদ্ধ অন্যতম।

প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে মো. ওয়ালিউল ইসলাম ভারতে যান। ত্রিপুরায় হরিণা ক্যাম্পে অবস্থানকালে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে। জলপাইগুড়ির মূর্তি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে অক্টোবরের প্রথমার্ধ থেকে যুদ্ধ করেন জেড ফোর্সের অধীনে। তাঁকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, ছোটলেখাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. ওসমান গনি, বীর প্রতীক

মিঠাপুকুর, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়। বাবা আজিজুল হক। মা আফরিন নেছা। স্ত্রী নাসিম বানু। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৮। মৃত্যু ১৯৯৯।

মো. ওসমান গনি চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের রংপুর (১৯ নম্বর) উইংয়ের অধীন চিলমারীতে। তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। ছিলেন একটি কোম্পানির অধিনায়ক। ২৫ মার্চের দু-তিন দিন আগে সুবেদার মেজর হিসেবে তাঁর পদোন্নতি হয়। তাঁকে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে যেতে বলা হলেও তিনি চিলমারী থেকে রংপুর হয়ে দিনাজপুর রওনা হন।

২৯ মার্চ রাতে দিনাজপুর সেক্টরের বাঙালি ইপিআররা একযোগে বিদ্রোহ করে কাঞ্চনে সমবেত হন। ওসমান গনি পার্বতীপুর থেকে ৩০ মার্চ কাঞ্চনে পৌঁছে বিদ্রোহী ইপিআরদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁকে রিয়ার হেডকোয়ার্টার্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিরোধযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দিনাজপুর শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাঞ্চনের রিয়ার হেডকোয়ার্টারে কয়েকবার আক্রমণ করে। ওসমান গনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে এ আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ইপিআর সেনারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

৩১ মার্চ দিনাজপুর শহর মুক্ত হয়। কয়েক দিন পর রংপুর ও সৈয়দপুর থেকে আগত পাকিস্তানি সেনারা দিনাজপুর শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের আক্রমণ করে। অব্যাহত আক্রমণের মুখে কাঞ্চনে অবস্থানরত ওসমান গনি ও তার সহযোদ্ধারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই স্থানে যান। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

১২ এপ্রিল ওসমান গনি তাঁর দলের সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিরলে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কয়েক দিন ধরে তাঁর দলের যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সেনারা ভারী অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান নিয়ে কয়েকবার তাঁদের আক্রমণ করে। ওসমান গনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে টিকে থাকতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পশ্চাদপসরণ করে নানাবাড়ি নামক স্থানে অবস্থান নেন। দু-তিন দিন পর পাকিস্তানি সেনারা সেখানে আক্রমণ করে। তাঁরা পিছু হটে কিশোরীগঞ্জে যান।

২৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট দল ওসমান গনির দলকে আক্রমণ করে। তখন তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ ক্ষতি হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ভারতীয় ভূখণ্ডে অনবরত শেলিং করতে থাকে। এতে জানমালের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তাঁকে সহযোদ্ধাসহ ভারতে যাওয়ার অনুরোধ করে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে সহযোদ্ধাদের নিয়ে ভারতে চলে যান।

ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর ওসমান গনি ৬ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের মধ্য থেকে তিনি মুক্তিযোদ্ধা বাছাই করেন এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. খলিলুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম কোড়ালতলী, উপজেলা ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর। বর্তমান ঠিকানা ৪৮/১ ভাগলপুর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা। বাবা খবিরউদ্দীন দেওয়ান, মা আম্বিয়া খাতুন। স্ত্রী খাদিজা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২০৬। গেজেটে নাম ওয়াহিদুর রহমান।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ। সীমান্তের ওপারে যখন এই খবর এল, তখন রাত। মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে চরম উত্তেজনা। অবরুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধারের দায়িত্ব পড়ল স্পেশাল প্লাটুনের ওপর। গভীর রাতেই ভারতের বেতাই থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রওনা হলেন বাংলাদেশ অভিমুখে। মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে তাঁরা ধর্মদহের চরে নামলেন। নদীর পশ্চিম পাশে বেতাই। মো. খলিলুর রহমানসহ (ওয়াহিদুর রহমান) মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২৫ জন।

মুক্তিযোদ্ধারা দুটি দলে বিভক্ত হলেন। একটি দলের নেতৃত্বে থাকলেন মো. খলিলুর রহমান। অপর দলের নেতৃত্বে আবুল খায়ের। মো. খলিলুর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে নদীতে নেমে স্রোতের অনুকূলে সাঁতরে প্যারাকপুর রওনা হলেন। এই পথ বেশ বিপজ্জনক। প্যারাকপুরে নদীর পাড় ঘেঁষে আছে দুটি বাংকার। পাকিস্তানি সেনারা ওই বাংকারে অবস্থান করে ২৪ ঘণ্টা নদীপথের দিকে কড়া নজর রাখে।

তখন ভোরবেলা। ঠিক সেই সময় মো. খলিলুর রহমান তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে পৌঁছালেন ওই বাংকারের কাছে। মুক্তিযোদ্ধারা নদী থেকে নিঃশব্দে তীর বেয়ে উঠে অতর্কিতে হামলা চালালেন বাংকারে। কোনো গুলি খরচ নয়, বেয়নেট চার্জ করে তাঁরা হত্যা করলেন বাংকারে থাকা পাকিস্তানি রক্ষীদের। প্যারাকপুরে ছিল অল্প কয়েকজন পাকিস্তানি। একই কায়দায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরও ঘায়েল করলেন। পাকিস্তানি সেনারা প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পেল না।

ওদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দলটি মহেশকুন্ডিতে আক্রমণ করে বসে। একটু পর খলিলুর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে পেছন দিক দিয়ে সেখানে এসে একইভাবে আক্রমণ চালান। তখন সকাল হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিমুখী আক্রমণে হতাহত হলো অনেক পাকিস্তানি সেনা।

মহেশকুন্ডিতে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলো। এতে খলিলুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা দমে গেলেন না। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে আটকে পড়া বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্ধার করেন। তাঁদের সাহসিকতায় বেঁচে যায় অনেক প্রাণ।

মহেশকুন্ডির যুদ্ধ ছিল উল্লেখযোগ্য এক লড়াই। সেদিনকার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অনেক পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী নিহত হয়। অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আনোয়ার হোসেন খান, মজিদ মোল্লা (ফরিদপুর) ও আনোয়ার আলীসহ কয়েকজন শহীদ হন।

মো. খলিলুর রহমান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ইপিআর উইংয়ের অধীনে মেহেরপুর সীমান্তে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের লালবাজার ও শিকারপুর সাবসেক্টরে। তিনি প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. গিয়াস উদ্দিন সমসের

বীর প্রতীক

গ্রাম আড়াইসিধা, উপজেলা আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা সোনা মিয়া মুন্সি, মা আছিয়া খাতুন সিকদার। স্ত্রী সামছুন্নাহার রেনু। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬৬। গেজেটে নাম বাচ্চু মিয়া। শহীদ ১৩ এপ্রিল ১৯৭১।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত আশুগঞ্জ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত আশুগঞ্জ মুক্ত ছিল। এ সময় বাচ্চু মিয়াসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য আশুগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। তাঁরা ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, মুজাহিদ, আনসার, পুলিশ ও ছাত্র-যুবক সমন্বয়ে গড়া। তাঁদের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল)।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আশুগঞ্জ দখলের জন্য ১৩ এপ্রিল ব্যাপক অভিযান শুরু করে। সড়কপথে বিপুলসংখ্যক সেনা ভৈরবে উপস্থিত হয়। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পেছনের মাঠে হেলিকপ্টারে কমান্ডো ব্যাটালিয়নের প্রায় এক কোম্পানি সেনা নামে। গানবোট ও অ্যাসল্ট ক্রাফটের সাহায্যে নদীপথে সেনা আসে। এ ছাড়া জঙ্গি বিমান ও আর্টিলারির কাভারিং ফায়ারের মাধ্যমে ভৈরব-আশুগঞ্জ রেলসেতুর ওপর দিয়েও সেনারা অগ্রসর হয়।

আশুগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন প্রায় ২০০ জন। অর্ধেকই স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ তাঁরা বিক্রমের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। কিন্তু জল-স্থল-আকাশপথের ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণে তাঁরা সেখানে টিকতে পারেননি। বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তাঁরা ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাঁদের পিছু হটতে হয়।

AMARBOI.COM

মো. গিয়াস উদ্দিন সমসের (বাচ্চু মিয়া) সোনারামপুর ওয়াপদা বাঁধসংলগ্ন এক পরিখায় (ট্রেঞ্চ) ছিলেন। সেখানে তিনিসহ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ১১ জন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ তাঁরা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। অনেকক্ষণ তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের ঠেকিয়ে রাখেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানিদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাঁরাও জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়েন। তখন তাঁর বেশির ভাগ সহযোদ্ধা জীবন বাঁচাতে পিছু হটেন। কিন্তু মো. গিয়াস উদ্দিন সমসের ও তাঁর দুই সহযোদ্ধা পিছু হটেননি। তাঁরা নিজ নিজ পরিখার মধ্যে থেকে সম্মুখযুদ্ধ করেন।

এ সময় তাঁরা তিনজনই গুলিতে আহত হন। আহত অবস্থায় মো. গিয়াস উদ্দিন সমসের 'শেষ ব্যক্তি, শেষ গুলি' পর্যন্ত আরও কিছুক্ষণ লড়াই করেন। কিন্তু তাঁর অস্ত্রের গুলি শেষ হয়ে যায়। তখন পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ও তাঁর দুই সহযোদ্ধাকে আটক এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। তাঁদের মরদেহ সহযোদ্ধারা উদ্ধার করতে পারেননি।

মো. গিয়াস উদ্দিন সমসের মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। অনিয়মিত হিসেবে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। অনিয়মিত মুজাহিদ সদস্যরা ভিন্ন কাজে যুক্ত থাকতে পারতেন। ১৯৭১ সালে তিনি ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রতিরোধযুদ্ধরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. জাহাঙ্গীর ওসমান ভূঁইয়া

বীর প্রতীক

গ্রাম ছতরা শরীফ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মকবুলুর রহমান ভূঁইয়া, মা দেলোয়ারা বেগম। স্ত্রী সেলিনা আক্তার। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪২। গেজেটে নাম জাহাঙ্গীর ওসমান। মৃত্যু ২০০২।

তীব্র শীত। সন্ধ্যা হতে হতেই চারদিক কুয়াশাচ্ছন্ন। ঘোর অন্ধকার রাত। খালি চোখে দেড়-দুই হাত দূরেও কিছু চোখে পড়ে না। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিতে থাকলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলের নেতৃত্বে মো. জাহাঙ্গীর ওসমান ভূঁইয়া।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম লক্ষ্য, আখাউড়াসংলগ্ন মিরাসানী, নিরানসানী, সিঙ্গারবিল রেলস্টেশন, রাজাপুর ও আজমপুর দখল করা। এসব এলাকা আখাউড়া রেল জংশনসংলগ্ন। ঘোর অন্ধকার, কুয়াশা আর তীব্র শীত উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধারা মো. জাহাঙ্গীর ওসমানের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অবস্থানের ওপর। গোলাগুলিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত।

মো. জাহাঙ্গীর ওসমান ভূঁইয়া সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে পর্যুদস্ত করে ফেললেন পাকিস্তানি সেনাদের। তাঁদের সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ল। একটু পর তারা পালাতে শুরু করল। এর মধ্যে হতাহত হয়েছে অনেক পাকিস্তানি সেনা। নিহত ও আহত সেনাদের ফেলেই অন্যরা পশ্চাদপসরণ করল।

পর্যুদস্ত পাকিস্তানি সেনারা সাময়িকভাবে পিছু হটলেও পরের দিন পুনর্গঠিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাল। মো. জাহাঙ্গীর ওসমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকলেন। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। বৃষ্টির মতো ছিল সেই গোলাবর্ষণ। এতে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলেন। গোলার আঘাতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি হতে থাকল বেশ। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। মো. জাহাঙ্গীর ওসমান এতে দমে যাননি। পরের দিন সহযোদ্ধাদের পুনর্গঠিত করে আবার আক্রমণ চালান পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। প্রচণ্ড যুদ্ধে জয়ী হন তাঁরাই।

এ ঘটনা ঘটে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আখাউড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। সেখানে নিয়োজিত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল শক্তি। কয়েক দিনের যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনী গোটা আখাউড়া এলাকা দখল করতে সক্ষম হয়।

মো. জাহাঙ্গীর ওসমান ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে পড়াশোনার পাশাপাশি যুব রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা (তখন মহকুমা) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার পর সীমান্ত এলাকায় ছোটখাটো কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। এরপর তিনি অন্তর্ভুক্ত হন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জন্য গঠিত প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সে। প্রশিক্ষণ শেষে ২ নম্বর সেক্টরে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২ নম্বর সেক্টরের একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. তবারক উল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম এখলাসপুর, উপজেলা মতলব, চাঁদপুর।
বাবা মো. বসরত আলী মাস্টার, মা রাবেয়া বেগম।
স্ত্রী আলফাতুন নেছা। তাঁদের তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৭০। মৃত্যু ২০০৪।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত। মুক্তিযোদ্ধা অনেকে শহীদ ও আহত। মো. তবারক উল্লাহ দমে গেলেন না। হাতেগোনা কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে বীরবিক্রমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। একসময় তিনি একা হয়ে পড়লেন। তার পরও বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে একাই পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে আপ্রাণ যুদ্ধ করতে থাকেন; কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না। পাকিস্তানি সেনাদের ঘেরাওয়ে পড়ে গেলেন। এ ঘটনা ঘটে বালিয়াডাঙ্গায় ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

বালিয়াডাঙ্গার অদূরে হঠাৎগঞ্জে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। সেখানে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল বালুচ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি। ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আর্টিলারির সহায়তা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর বালিয়াডাঙ্গার অবস্থানে পাল্টা আক্রমণ করে। মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ ও মো. তবারক উল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি আক্রমণ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ওই এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উচ্ছেদ করার জন্য তারা বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে থাকে। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান ধরে রাখেন।

১৮ সেপ্টেম্বর মো. তবারক উল্লাহর অধিনায়ক আহত হলে সাময়িক সময়ের জন্য যুদ্ধের নেতৃত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। যুদ্ধ চলতে থাকে। পরে অধিনায়ক হিসেবে যোগ দেন মাহাবুব উদ্দীন আহমেদ (বীর বিক্রম)। তিনিও যুদ্ধে আহত হন। মো. তবারক উল্লাহ সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। প্রায় ৩৪ জন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে শহীদ হন। অনেকে আহত হন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। একপর্যায়ে তবারক উল্লাহ একা হয়ে যান। তখন তিনি একাই যুদ্ধ করছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁর অজান্তে তাঁকে ঘিরে ফেলে। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে পাকিস্তানি সেনারা আটক করে। আটক তবারক উল্লাহকে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক নির্যাতন করার পর জেলে পাঠায়। ১৬ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান।

মো. তবারক উল্লাহ চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন যশোর ইপিআর সেক্টরের অধীন কালীগঞ্জে। তখন তাঁর পদবি ছিল সুবেদার। তিনি একটি কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের হাকিমপুর সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. তৈয়ব আলী, বীর প্রতীক

৪৪ মাদারটেক, ঢাকা সিটি করপোরেশন, ঢাকা।
বাবা সোনা মিয়া, মা জোহরা বিবি। স্ত্রী হাজেরা বেগম।
তাঁদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৩৬। মৃত্যু ১৯৯৫।

মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের ঢাকার গেরিলাদলের সদস্য ছিলেন মো. তৈয়ব আলী। ঢাকা মহানগরের মাদারটেক ও আশপাশে বেশ কয়েকটি গেরিলা অপারেশন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গানবোটে আক্রমণ।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই বইয়ে মো. তৈয়ব আলীর একটি অসম্পূর্ণ বয়ান আছে। তাতে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি মাছ ধরতাম। ঢাকা শহরে আম, কমলা, লিচু, ফল ফেরি করে বিক্রি করতাম। এককথায় ফেরিওয়ালা। মে মাসের শেষে। হাতীমারা ক্যাম্পে সন্ধ্যাবেলা পৌছালাম। দুই দিন পর আমাদের লাইন করে দাঁড় করানো হলো। সুবেদার বললেন, ঢাকা টাউন বা ঢাকার আশপাশ থেকে কেউ এসেছেন কি না, হাত তোলেন। আমরা দেড় শ জনের মতো ছিলাম। তিনজনই মাত্র হাত তুললাম।'

মো. তৈয়ব আলীর এর পরের বয়ান ওই বইয়ে ছাপা হয়নি। তবে মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা* বইয়ে তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। তিনি লিখেছেন, 'ছেলেটির নাম তৈয়ব আলী। এ ছেলেটি ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় তাকে একটি এলএমজি দেওয়ার জন্য রীতিমতো অনুনয় করতে লাগল। পাশে আমরা অনেকেই দাঁড়িয়ে। এলএমজি তখন একটি দুষ্প্রাপ্য অস্ত্র। সাধারণত গেরিলাদলকে এ অস্ত্র দেওয়া হয় না। তৈয়ব আলী এমন সরলভাবে ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছে আকুতি-মিনতি করতে লাগল, যেন তিনি ইচ্ছে করলেই তাকে সেটি দিতে পারেন।

'হায়দার মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন, "যুদ্ধে আগে কিছু করো। এলএমজি পাবে।" কিছুদিন পর তৈয়ব আলী গামছায় বেঁধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মিলিটারি পুলিশের এক ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে তার ব্যাজেজ অব র‍্যাংক, সাদা বেল্ট, লাল টুপি, বুট, পাউচসহ পিস্তল এনে ক্যাপ্টেন হায়দারের কাছে উপস্থাপন করল। তারপর বলল, "স্যার, যুদ্ধ কইরা আইছি, এইবার এলএমজি দ্যান।"

'তারও বেশ কিছুদিন পরের কথা। হায়দার তৈয়ব আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা কত দূর যায়?" তৈয়ব আলী সামনের পাহাড়ের নিচে ছোট একটি গাছ দেখিয়ে বলল, "স্যার, ওদ্দুর যাইব।" চার শ-সাড়ে চার শ গজ। হায়দার বললেন, "যদি বলতে পারো কীভাবে মারলে অত দূর গোলা যাবে, তবে তোমাকে মর্টার দিব।" তৈয়ব আলী বাম হাত আড়াআড়ি করে রেখে ডান হাত তার ওপর বাঁকা করে বলল, "এই রকম স্যার। মাঝামাঝি।"

'অপূর্ব! ঠিক ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এরপর থিয়োরি অব স্মল আর্মস ফায়ার, হাই ট্রাজেকটরি উইপন ট্রেনিং, ক্যালকুলাস পড়ার কোনো প্রয়োজনই রইল না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. দেলাওয়ার হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম গোপালপুর, রাজাপুর, ঝালকাঠি। বাবা সিকান্দার আলী, মা মকিমুন নেছা। স্ত্রী নূরজাহান দেলাওয়ার। তাঁদের তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৪। ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে একদল মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা অপারেশন চালায় মোগলহাট রেললাইনে। নেতৃত্বে ছিলেন মো. দেলাওয়ার হোসেন। তাঁর বয়ান :

'একটি অপারেশনের কথা আমার মনে পড়ছে। লালমনিরহাট থেকে মোগলহাটে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য প্রতিদিন সকালে ট্রেনে করে সৈন্য ও সেনা আসত। দিনটি ছিল যত দূর সম্ভব ১৫ সেপ্টেম্বর। ভোর পাঁচটায় ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মোগলহাট রেললাইনের কাছে অবস্থান নিই।

'রেললাইনের ওপর অ্যান্টিট্যাংক মাইন বসানো হয়। গ্যালাটিন ও পিইকে ঠিকমতো বসিয়ে দূরে সুইচ লাগিয়ে শত্রুট্রেন আসার অপেক্ষায় অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। ঠিক সময়েই ট্রেনটি সামনের কয়েকটি বগিতে বালু এবং অন্যান্য জিনিস ভর্তি করে আসে। পেছনের বগিতে ছিল পাকিস্তানি সেনারা।

'আমাদের অ্যান্টিট্যাংক মাইনের আঘাতে ট্রেনের ইঞ্জিনসহ সামনের কয়েকটি বগি ধ্বংস হয়। পাকিস্তানি সেনারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমাদের গোলাগুলির জবাব দিতে শুরু করে। তারা ট্রেন থেকে নেমে তিন দিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের আমি পেছনে সরে যেতে নির্দেশ দিই।

'আমার কাছে একটা হালকা মেশিনগান ছিল। সেটা দিয়ে আমি শত্রুসেনাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাই। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা পেছনে সরে যেতে সক্ষম হন। এই অপারেশনে দুজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও চারজন আহত হন। আমিও বাঁ হাতে সামান্য আঘাত পাই। শত্রুদের পাঁচজন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

'এই অপারেশনের খবরটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় এবং এর জন্যই বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীকালে আমাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করে।'

মো. দেলাওয়ার হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স কোরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আগস্ট মাসে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরে। প্রথমে কিছুদিন সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে মোগলহাট সাবসেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। এই সাবসেক্টরের আওতাধীন এলাকা ছিল লালমনিরহাট জেলার দক্ষিণ অংশ। লালমনিরহাট সদর, রায়গঞ্জ, কাউনিয়া, আদিতমারিসহ বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান।

মো. দেলাওয়ার হোসেন অনেক যুদ্ধ ও গেরিলা অপারেশনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগেশ্বরীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ, কম্বলপুর সেতু অপারেশন, কুলাহাট পাকিস্তানি সেনা অবস্থানে হামলা ও পাটেশ্বরীতে পাকিস্তানি গোলন্দাজ অবস্থানে আকস্মিক আক্রমণ প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া

বীর প্রতীক

গ্রাম ঢৌকার চর, উপজেলা রায়পুরা, নরসিংদী। বর্তমান ঠিকানা বাওয়াকুর, স্টেশন রোড, নরসিংদী। বাবা আবদুল হাকিম, মা আকতারুন নেছা। স্ত্রী ফারজানা নজরুল। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২১।

ক্ষিপ্রগতিতে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলের (চার্লি কোম্পানি) নেতৃত্বে মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া। তাঁদের লক্ষ্য, কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাহবাজপুর সেতু অনতিবিলম্বে দখল করা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত সরাইল উপজেলার পূর্ব দিকে শাহবাজপুর।

মুক্তিযোদ্ধা সব মিলিয়ে এক ব্যাটালিয়ন শক্তি। এই অভিযানে আছেন এস ফোর্সের অধিনায়ক মেজর কে এম সফিউল্লাহ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান)। তাঁর সঙ্গে আছে ক্ষুদ্র একটি দল। সফিউল্লাহ যখন শাহবাজপুরের অদূরে ইসলামপুরে পৌঁছালেন, তখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সেখানে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুটি মিলিটারি ট্রাক। তাতে ৩০ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ১৫-১৬ জন সেনা।

মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া তখন তাঁর দল নিয়ে কিছুটা সামনে। ইসলামপুরে পাকিস্তানি সেনাদের উপস্থিতি ছিল একেবারে আশাতীত।

কে এম সফিউল্লাহ তাৎক্ষণিক পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা হাত উঁচু করে ট্রাক থেকে নেমেই গুলি শুরু করে। এক পাকিস্তানি সেনা (সুবেদার) তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং অগ্রসরমাণ নজরুল ইসলাম ভূঁইয়ার দলের ওপর আক্রমণ চালায়।

সে সময় সেখানে বাসে করে হাজির হলো আরও কিছু পাকিস্তানি সেনা। তখন প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেল। ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক এ এস এম নাসিম গুরুতর আহত হলেন। আক্রমণের তীব্রতায় মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা বিশৃঙ্খল। তাঁর দলের চারটি প্লাটুনের মধ্যে অক্ষত শুধু একটি প্লাটুন।

মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া বিচলিত হলেন না। মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সতর্কতার সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। অক্ষত প্লাটুন নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। তাঁর সাহসিকতায় উজ্জীবিত হলেন সহযোদ্ধারা। শেষ পর্যন্ত প্রবল যুদ্ধের পর পর্যুদস্ত হয় সব পাকিস্তানি সেনা।

সেদিন মো. নজরুল ইসলামের সাহসিকতা ও বীরত্বে কে এম সফিউল্লাহ, এ এস এম নাসিমসহ অনেকের জীবন বেঁচে যায়। যুদ্ধে ২৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৪ জন বন্দী হয়। মুক্তিবাহিনীর দুজন শহীদ ও ১১ জন আহত হন।

মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার ফোর্সে। প্রশিক্ষণ শেষে অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে আবার যুদ্ধে যোগ দেন।

মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতেই থেকে যান। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেন। বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নাজিম উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম চৌহদ্দী, ইউনিয়ন উসমানপুর, উপজেলা কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ। বাবা আরব আলী, মা মিশ্রি বেগম। স্ত্রী খালেদা বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৮।

রাতের প্রথম প্রহর থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। চলছে মধ্যরাতেও। কোনো বিরাম নেই। বৃষ্টির পানিতে চারদিক টইটম্বুর। এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েন মো. নাজিম উদ্দিনসহ একদল দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা। সংখ্যায় তাঁরা মোট ১৫ জন। তাঁদের দলনেতা তিনি নিজেই।

তাঁদের অস্ত্র বলতে মাত্র দু-তিনটি রাইফেল আর বাকি সব রামদা ও লাঠি। তাই সম্বল করে তাঁরা বৃষ্টিভেজা রাতে এগিয়ে যান। রাতের শেষ প্রহরে অতর্কিতে আক্রমণ চালান থানায়। তাঁদের আক্রমণে হতভম্ব হয়ে পড়েন থানার ওসিসহ পুলিশ সদস্যরা। পাল্টা আক্রমণ বা প্রতিরোধ দূরের কথা, অস্ত্র ফেলে ওসি ও পুলিশদের সবাই পালিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে ১৫টি রাইফেল ও বেশ কিছু গুলি। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো একদিন সুনামগঞ্জ জেলার (তখন মহকুমা) ধরমপাশা থানায়।

মো. নাজিম উদ্দিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে তাঁদের কয়েকজন এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে অবস্থানরত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। এরপর তাঁরা আশুগঞ্জে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

পাকিস্তানি বিমানবাহিনী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি (১৪-১৬) তাঁদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে বেশ কয়েকবার হামলা চালায়। এই হামলায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও আহত হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁরা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এরপর তিনি নিজ এলাকায় যান।

এই সময় মো. নাজিম উদ্দিন ধরমপাশা থানায় গেরিলা আক্রমণ চালান। সফল এই আক্রমণ পরিচালনার পর তিনি পুনরায় ভারতের তেলঢালায় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেন। সেখানে তিনি কিছুদিন একটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটি ইয়ুথ কোম্পানি (১২০ সদস্য) গঠন করা হয়। এই কোম্পানি পরিচালনা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পান তিনি।

মো. নাজিম উদ্দিন নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে সীমান্ত অতিক্রম করে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহযোদ্ধাদের নিয়ে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় যান। সেখানে কমলপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা। কয়েক দিন পর তাঁরা সেখানে আক্রমণ চালান। তাঁদের সাঁড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। আট-নয়জন পাকিস্তানি সেনা তাঁদের হাতে নিহত হয়। দুজনকে তাঁরা জীবিত অবস্থায় আটক করেন। এরপর তিনি তাঁর দল নিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নূরুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম দুর্গাপুর, উপজেলা মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
বাবা সিরাজুল হক ভূঁইয়া, মা নূর বানু। স্ত্রী ছকিনা বেগম।
তাঁদের তিন মেয়ে ও তিন ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪৩। মৃত্যু ১৯৯২।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে একদল মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হন আশুগঞ্জ ও ভৈরবে। মেঘনা নদীর এক পারে ভৈরব, আরেক পারে আশুগঞ্জ। একটি উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন মো. নূরুল হক। তাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা। এ জন্য মো. নূরুল হক সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন আশুগঞ্জে। তাঁদের সঙ্গে ছিল আরও দু-তিনটি উপদল।

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত আশুগঞ্জ ও ভৈরব মুক্ত ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আশুগঞ্জ-ভৈরব দখলের জন্য ওই দিন থেকে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। মো. নূরুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন। বিক্রমের সঙ্গে তাঁরা পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে নদীপথে আসা পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়।

কিন্তু এই সফলতা মো. নূরুল হকরা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর থেকে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধবিমান তাঁদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। এ আক্রমণ মোকাবিলা করার মতো অস্ত্র তাঁদের কাছে ছিল না। একনাগাড়ে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে বিমান আক্রমণ চলে। এ সময় তাঁর দলসহ অন্যান্য দলের মুক্তিযোদ্ধারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন।

এতে মো. নূরুল হক দমে যাননি। বিমান আক্রমণ শেষ হলে সহযোদ্ধাদের পুনরায় সংগঠিত করে আবার তিনি আগের স্থানে অবস্থান নেন। পরদিন ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের অবস্থানের অদূরে হেলিকপ্টারের সাহায্যে কমান্ডো নামায়। তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানিরা তাঁদের চারদিক দিয়ে প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। তখন দুই পক্ষে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

পাকিস্তানিদের জল-স্থল-আকাশপথের ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণে মো. নূরুল হকরা শেষ পর্যন্ত সেখানে টিকতে পারেননি। বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তাঁরা ব্যর্থ হন। ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাঁদের পিছু হটে যেতে হয়। যুদ্ধে আহত হন তাঁর অধিনায়ক এ এস এম নাসিমসহ অনেক সহযোদ্ধা। শহীদ হন কয়েকজন।

মো. নূরুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল সুবেদার মেজর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদ্রোহ করে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। জয়দেবপুর থেকে সহযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহে সমবেত হন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার পর তিনি ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে নানা দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. নূরুল হক, বীর প্রতীক

খাজা রোড, বাদামতলী, চাঁদগাঁও, চট্টগ্রাম।
বাবা শামসুল হুদা, মা মোস্তফা খাতুন।
স্ত্রী হোসনে আরা বেগম। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৯৬।

অপারেশনের আগে নৌ-কমান্ডোদের কয়েকজন মিলে মানত করলেন, তাঁরা মহসিন আউলিয়ার মাজার জিয়ারত করবেন। মানতের খাসি কিনতে একাই গেলেন মো. নূরুল হক। যাওয়ার পথে তাঁর চোখে পড়ল পাকিস্তানি সেনাদের একটি জিপ একটি রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। মো. নূরুল হক মনে মনে ভাবলেন, তাঁর নাগালে এক লোভনীয় শিকার। এ শিকারকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। ভাবামাত্র আর দেরি করলেন না। নিজের কাছে থাকা গ্রেনেড বের করে দাঁতের কামড়ে সেফটিপিন খুলে ছুড়ে দিলেন জিপ লক্ষ্য করে। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সেটি।

লোকজন দিগ্বিদিক ছুটে পালাতে লাগল। গাড়িতে আগুন জ্বলছে, সামনের কাচ চূর্ণবিচূর্ণ। আরোহী সবাই আহত। একজনের এক হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। মো. নূরুল হক আর দেরি করলেন না। দ্রুত মিশে গেলেন জনতার ভিড়ে। চট্টগ্রামের দেওয়ানহাটে এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মধ্য সেপ্টেম্বরে।

১৬ আগস্ট চট্টগ্রাম নৌবন্দরে সফল অপারেশন শেষে মো. নূরুল হকসহ নৌ-কমান্ডোরা ফিরে গিয়েছিলেন ভারতে। কয়েক দিন পর তিনি আরও ১১ জন সঙ্গীসহ আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। এবার কোনো সুনির্দিষ্ট টার্গেট ছিল না। কিন্তু তাঁরা বন্দরে পুনরায় অপারেশন করতে চাইলেন। এদিকে অপারেশন জ্যাকপটের পর বন্দরে প্রচণ্ড কড়াকড়ি। তাঁদের পক্ষে সেখানে অপারেশন করা দুঃসাধ্য। এ অবস্থায় তাঁদের দলনেতা বহির্নোঙরে অপারেশন করার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এর আগে একদিন নূরুল হক একাই দুঃসাহসিকভাবে ওই অপারেশন করেন। পরে বহির্নোঙরে অপারেশনেও তিনি অংশ নেন। কিন্তু তাঁদের সেই অপারেশন ব্যর্থ হয় মর্মান্তিক এক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

নৌ-কমান্ডোরা রাতে ভাটার সময় সমুদ্রের পানিতে নেমে লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করেন। অনেকক্ষণ সাঁতরেও তাঁরা সেখানে পৌঁছাতে পারেননি। পরে জোয়ারের ধাক্কায় তাঁরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় সমুদ্রের তীরে পৌঁছান। তখন তাঁদের কারও জ্ঞান ছিল না। ১১ জনের মধ্যে চারজনের ভাগ্যে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। তাঁদের একজন ছিলেন মো. নূরুল হক। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আটক করে ব্যাপক নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। নির্যাতনে একজন (মোহাম্মদ হোসেন বীর প্রতীক) শহীদ হন। মো. নূরুল হকসহ তিনজনকে পরে ঢাকা সেনানিবাসে পাঠানো হয়। সেখানেও তাঁদের ওপর চলে প্রচণ্ড নির্যাতন। স্বাধীনতার পর তাঁরা ছাড়া পান।

মো. নূরুল হক ১৯৭১ সালে ব্যবসা করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে চলে যান। পরে যোগ দেন মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. বদরুজ্জামান মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম শিমুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
বাবা নজিরুজ্জামান মিয়া, মা রোকেয়া খানম। স্ত্রী বিউটি বেগম ও নূরমহল বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৬০। মৃত্যু মে ২০১২।

কুড়িগ্রাম জেলার উত্তরে ভুরুঙ্গামারী। এর তিন দিকেই ভারত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায় ভুরুঙ্গামারীর পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে। এখানে নিয়োজিত ছিল পাকিস্তানি সেনাদের মিশ্র এক বাহিনী। নিয়মিত সেনা, ইপিসিএএফ ও স্থানীয় রাজাকার।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, ১২ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী প্রথমে আক্রমণ চালায় পাটেশ্বরীতে। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিলেন। একটি দলের নেতৃত্ব দেন মো. বদরুজ্জামান মিয়া। তাঁরা একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পাটেশ্বরী দখল করে নেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা সমবেত হন ভুরুঙ্গামারীর পূর্ব পাশে। সেখান থেকে তাঁরা গোলাগুলি শুরু করেন। পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা জবাব দেয়।

পরদিন ১৩ নভেম্বর সকাল থেকে মিত্রবাহিনী কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ শুরু করে। তাদের যুদ্ধবিমানও কয়েকবার ভুরুঙ্গামারীর আকাশে চক্কর দিয়ে গোলাবর্ষণ করে। এর ছত্রছায়ায় মো. বদরুজ্জামান মিয়া ও তাঁর সহযোদ্ধারা এগিয়ে যান পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের সাত-আট শ গজের মধ্যে। পাকিস্তানি সেনারা মরিয়া হয়ে তাঁদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। একপর্যায়ে তাঁরা অবস্থান নেন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাব্যূহের চার-পাঁচ শ গজের মধ্যে।

মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ ছিল ত্রিমুখী। মো. বদরুজ্জামান মিয়ার দল এক দিক থেকে এবং অপর দুই দল অন্য দুই দিক থেকে আক্রমণ চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনা, ইপিসিএএফ ও রাজাকাররা দিশাহারা হয়ে পড়ে। মধ্যরাত পর্যন্ত পাকিস্তানি অবস্থান থেকে থেমে থেমে গোলাগুলি অব্যাহত ছিল। এরপর গোলাগুলি কমে যেতে থাকে। সকাল হওয়ার আগেই তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

১৪ নভেম্বর খুব ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভুরুঙ্গামারীতে ঢুকে পড়েন। সিও অফিস ও হাইস্কুলের কাছে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেও গোলাগুলি করেনি। কারণ, তাদের অস্ত্রের গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা আত্মসমর্পণ করে। সিও অফিসের কাছে ছড়িয়ে ছিল ৪০-৪৫ জন পাকিস্তানি সেনার লাশ। একটি বাংকারেও পাওয়া যায় এক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের লাশ।

মো. বদরুজ্জামান মিয়া ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ছিলেন। ১ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল লালমনিরহাট হয়ে ধরলা নদী পেরিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী অভিমুখে আসে। তখন ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে গড়া মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে মো. বদরুজ্জামান মিয়া সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. বিলাল উদ্দিন, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন নরুন্দি, সদর, জামালপুর। বর্তমান ঠিকানা গোপালপুর বাজার, ঘোড়াধাপ, সদর, জামালপুর। বাবা ছাবেদ আলী সরকার, মা জায়তুন নেছা। স্ত্রী জুবেদা খাতুন। তাঁদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১০৬।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিবাহিনীর ১১ নম্বর সেক্টরে অবস্থানরত মো. বিলাল উদ্দিন খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা তাঁর এলাকায় ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে। পরে আরও কয়েক দিন তিনি একই খবর পেলেন। এরপর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের গ্রামবাসীকে সাহস জোগাতে তিনি তাঁর নিজের এলাকায় যাবেন।

তারপর একদিন (সঠিক তারিখ তাঁর জানা নেই) মো. বিলাল উদ্দিন দিনের বেলা ভারতের ঢালু থেকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ৩৫ থেকে ৩৬ জন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের দলনেতা তিনি। তাঁদের কাছে অস্ত্র বলতে স্টেনগান, রাইফেল আর হ্যান্ড গ্রেনেড। ভারী কোনো অস্ত্র নেই।

সীমান্ত পেরিয়ে মো. বিলাল উদ্দিন সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও মানুষজন নেই। পথে পড়ল বিরাট এক খোলা ময়দান। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন, সেই খোলা ময়দানের ভেতর কয়েকটি গরুর গাড়ি। সঙ্গে একদল পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার। গাড়িতে নানা জিনিসপত্র।

AMARBOI.COM

পাকিস্তানি সেনারাও হয়তো তাঁদের দেখতে পেয়েছিল। আচমকা শত্রুর সামনে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হতভম্ব দশা। তাঁরা মাত্র প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। যুদ্ধে অংশ নেননি। একমাত্র মো. বিলাল উদ্দিন পেশাদার সেনা। তবে তিনিও রেকি (পর্যবেক্ষণ) দলের সদস্য। সরাসরি যুদ্ধ না করে ছদ্মবেশে দেশের ভেতরে রেকি করে থাকেন।

মো. বিলাল উদ্দিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। শেষে সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে সরাসরি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মো. বিলাল উদ্দিন ছিলেন গাছের আড়ালে ও নিরাপদ স্থানে। আর পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা খোলা মাঠে। গুলি, পাল্টা গুলিতে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের বেশ কয়েকজন হতাহত হলো। এরপর তিনি দ্রুত ওই এলাকা থেকে সরে পড়েন। তাঁর সহযোদ্ধারা আগেই সরে পড়েছিলেন। এ ঘটনা শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার মরিচপুরানের।

মো. বিলাল উদ্দিন চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইবিআরসিতে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েক বা ক্লার্ক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট ইবিআরসিতে আক্রমণ করে। সে সময় তাঁরা নিরস্ত্র অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে ইবিআরসিতে অবস্থানরত বেশির ভাগ বাঙালি সেনা নিহত হন। অল্পসংখ্যক বেঁচে যান। তিনিও বেঁচে যান এবং পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১১ নম্বর সেক্টরে পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম মুড়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
বাবা তোরাব আলী, মা আফিয়া খাতুন।
স্ত্রী মিনা রহমান। তাঁদের চার মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৪। মৃত্যু ১৯৯৪।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচদোনায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মো. মতিউর রহমান।

পাঁচদোনায় সড়কের দুই ধারে ছিল ঝোপঝাড়। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন স্থানীয় দুঃসাহসী কয়েকজন গ্রামবাসী। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন।

সেদিন ছিল সড়ক জনশূন্য। একসময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোটা পাঁচেক সেনাবাহী লরি দেখতে পাওয়া যায়। পেছনেও আরও কয়েকটি গাড়ি। সেগুলোও সেনাবাহী। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বাবুরহাটের দিক থেকে।

গত কয়েক দিন পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় তেমন কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। জনশূন্য পথে তারা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই আসছিল। সামনের লরিগুলো অস্ত্রের আওতায় আসামাত্র মো. মতিউর রহমান সংকেত দেন। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত পল্লি-প্রকৃতিকে চমকে দিয়ে গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টার দলের ছোড়া তিনটি মর্টারের গোলার একটা গোলা পড়ে লরির ওপর। একই সময় গর্জে ওঠে তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছে থাকা মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র।

AMARBOI.COM

তখন পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এমন অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখে পড়তে হবে, তা ওরা ভাবতেই পারেনি। প্রথম ধাক্কাতেই হতাহত হয় বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। হতভম্ব পাকিস্তানি সেনারা অবশ্য কিছুক্ষণ পর পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

মো. মতিউর রহমান সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। তাঁর সাহস দেখে সহযোদ্ধারা আরও উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ চলে কয়েক ঘণ্টা ধরে। তাঁদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হতাহত হয় শতাধিক সেনা। তিনটি লরি অচল হয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে হতাহত সেনাদের সচল লরি ও গাড়িতে তুলে নিয়ে তারা সন্ধ্যার আগেই পশ্চাদপসরণ করে বাবুরহাটে। পরদিন সেখানে আবার যুদ্ধ হয়।

মো. মতিউর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ বালুচ রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ১৯৭১ সালের মার্চে তিনি ছুটিতে ছিলেন। তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৩০ মার্চ ময়মনসিংহে সমবেত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। সেখানে পুনর্গঠিত হয়ে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। নলুয়া চা-বাগান, আখাউড়া, আশুগঞ্জসহ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বেশির ভাগ যুদ্ধেই তিনি অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. মোজাম্মেল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম ও ইউনিয়ন মায়ানী, উপজেলা মিরসরাই, চট্টগ্রাম। বাবা মনির আহম্মদ সওদাগর, মা সখিনা খাতুন। স্ত্রী নাজমা আক্তার। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৯৩। মৃত্যু ২৭ ডিসেম্বর ২০০০।

মুক্তিযোদ্ধারা সফলভাবে রেলসেতু ধ্বংস করেছেন। কয়েক দিন পর একদিন খবর এল, পাকিস্তানি সেনারা সেই সেতু মেরামত শুরু করেছে। ভারতে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে সিদ্ধান্ত হলো, পাকিস্তানি সেনাদের ওই প্রচেষ্টা যেকোনো মূল্যে নস্যাৎ করতে হবে। তারপর শুরু হলো প্রস্তুতি।

এই অপারেশনের জন্য দলে অন্তর্ভুক্ত হলেন মো. মোজাম্মেল হকসহ ৩৫-৩৬ জন। তাঁদের নেতৃত্বে গোলাম হেলাল মোর্শেদ (বীর বিক্রম, তখন লেফটেন্যান্ট, পরে মেজর জেনারেল)। তাঁরা রওনা হলেন ভারত থেকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছালেন সেতুর দুই-আড়াই মাইল দূরে। এলাকাটির আশপাশ জঙ্গলাকীর্ণ।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ভারী অস্ত্র বলতে একটি মেশিনগান ও একটি তিন ইঞ্চি মর্টার। বাকি সব এলএমজি, এসএমজি ও রাইফেল। সকাল হওয়ার পর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলেন গন্তব্যস্থলে। জঙ্গল থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পেলেন বিহারি রেলকর্মীরা সেতু মেরামত করছে। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার সেখানে পাহারায় নিয়োজিত। তারা সবাই নিশ্চিন্ত মনে এবং কিছুটা শিথিল অবস্থায়।

অধিনায়ক নির্দেশ দেওয়ামাত্র মো. মোজাম্মেল হক ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অস্ত্র একযোগে গর্জে উঠল। মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র থেকে তাঁরা প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করলেন। মুক্তিযোদ্ধারা দিনের বেলায় সেখানে আক্রমণ করবেন—পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার ও রেলকর্মীরা তা কল্পনাও করেনি। হতভম্ব সেনা ও রাজাকাররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশির ভাগ লুটিয়ে পড়ল। রেলকর্মীদেরও একই দশা হলো। রেলসেতু থেকে ভেসে আসতে থাকল আর্তচিৎকার। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পেল না। মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন শেষ হলো একতরফাভাবে, পাল্টা কোনো গোলাগুলির ঘটনা ছাড়াই। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগই পায়নি। আক্রমণে বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার ও রেলকর্মী নিহত এবং বাকিরা আহত হয়। এই অপারেশনে মো. মোজ্জাম্মেল হক যথেষ্ট দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেন।

অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা চলে যান নিরাপদ স্থানে। এ ঘটনা ঘটে হরষপুরে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ ভাগে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত হরষপুর, জেলা সদর থেকে উত্তরে হবিগঞ্জ জেলার সীমান্তে। হরষপুরে আছে রেলস্টেশন। এর অল্প দক্ষিণে ছিল ওই রেলসেতু।

মো. মোজ্জাম্মেল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরে। পরে এস ফোর্সের অধীনে। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. রেজাউল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম বর্নী, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। ছহির উদ্দিন, মা খাতুনারা বেগম। স্ত্রী মমতাজ বেগম। তাঁদের দুই ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৭৫।

১৯৭১ সালে কোদালকাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট দল (প্লাটুন)। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মো. রেজাউল হক। ৪ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট দল সেখানে আক্রমণ চালায়। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার অন্তর্গত কোদালকাটি।

১৩ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রৌমারী থানা সদর দখলের লক্ষ্যে কোদালকাটি থেকে রাজীবপুরের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের একটি দল ব্যাপক গোলাগুলি করে মো. রেজাউল হকের অবস্থানে উঠে পড়ার চেষ্টা করে। তখন সীমিত শক্তি নিয়েই তিনি পাল্টা আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করেন। সেনাবাহিনী পরে আরও কয়েকবার তাঁদের অবস্থানে আক্রমণ করে। প্রতিবারই তাঁরা সাহসের সঙ্গে তা প্রতিহত করেন।

অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে মুক্তিযোদ্ধারা কোদালকাটিতে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করেন। মূল আক্রমণে অংশগ্রহণকারী চারটি দলের একটি ছিল মো. রেজাউল হকের দল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ২ অক্টোবর দুপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সব অবস্থানে একযোগে আক্রমণ শুরু করে। প্রথমেই তাদের মুখোমুখি হন মো. রেজাউল হক। ব্যাপক মর্টার ফায়ারের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাঁর অবস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তবে বেশিক্ষণ পারেননি। প্রবল আক্রমণের মুখে তাঁদের কিছুটা পশ্চাদপসরণ করতে হয়।

পরে মো. রেজাউল হক তাঁর দলকে পুনরায় সংগঠিত করে আবার আক্রমণ চালান। তাঁর দল ও অন্যান্য দল একের পর এক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ চলে। এতে হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর তারা আহত ও নিহত সেনাদের নিয়ে পিছু হটে নিজেদের ক্যাম্পে সমবেত হয়। পরদিন সকালে মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পারেন, পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গেছে।

মো. রেজাউল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। ২৫ মার্চ তিনি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ীতে মোতায়েন ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে রৌমারীতে যান। জুন-জুলাই মাসে তিনি কোদালকাটির খারুভাজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্র-যুবককে প্রশিক্ষণ দেন। কোদালকাটি ছাড়াও আরও কয়েকটি জায়গায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. লনি মিয়া দেওয়ান, বীর প্রতীক

গ্রাম দেবীপুর, উপজেলা রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
বাবা বছির উদ্দিন, মা ময়না বেগম। স্ত্রী ফুল বানু।
তাঁদের চার ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৮৬। মৃত্যু ১৯৯৪।

মো. লনি মিয়া দেওয়ান সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নিলেন। যেকোনো সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করতে পারে। সবার মধ্যে টানটান উত্তেজনা। সময় গড়াতে লাগল। রাতেই পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মো. লনি মিয়া দেওয়ান তাদের সেই আক্রমণ সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে চললেন। সারা রাত যুদ্ধ চলল। এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ঘটেছিল পাহাড়তলীতে।

পাহাড়তলী চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত। এ যুদ্ধের বর্ণনা সুকুমার বিশ্বাসের *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী* বইয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে:

'...নায়েব সুবেদার লনি মিয়া দেওয়ান ২৫ মার্চ রাত ১১টায় ক্যাপ্টেন রফিকের (রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, পরে মেজর) নির্দেশক্রমে অবাঙালিদের বন্দী করে তাঁর প্লাটুন নিয়ে পাহাড়তলী স্টেশনে এসে পৌঁছান। ২৬ মার্চ রাতে রেলওয়ে বিল্ডিংয়ে ডিফেন্স নিলেন। রাত ১০টায় এই প্লাটুনটির ওপর যুদ্ধজাহাজ এন এস জাহাঙ্গীর থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপকভাবে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। সারা রাত উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হয়। গোলাগুলিতে ইপিআর বাহিনীর অ্যামুনিশন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। এদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর করল। অব্যাহত আক্রমণে ইপিআর বাহিনীর পক্ষে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ক্যাপ্টেন রফিকের নির্দেশক্রমে ২৭ মার্চ প্লাটুনটি সেখান থেকে স্টেট ব্যাংক ও কোতোয়ালি এলাকাতে ডিফেন্স নিল।'

AMARBOI.COM

মো. লনি মিয়া দেওয়ান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টরে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানির একটি প্লাটুনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। চট্টগ্রামে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ১ নম্বর সেক্টরে। বিভিন্ন যুদ্ধে দলনেতা হিসেবে তিনি অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. সদর উদ্দিন আহমেদ

বীর প্রতীক

খাজুরা, সদর, ঝিনাইদহ। বাবা ইব্রাতুল্লাহ মণ্ডল ওরফে ইব্রাহিম মণ্ডল, মা জেলেমান নেছা। স্ত্রী আনজিরা বেগম। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭০। শহীদ ২২ নভেম্বর ১৯৭১।

তখন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ছিল কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় (তখন থানা)। এই দলে ছিলেন মো. সদর উদ্দিন আহমেদসহ মাত্র কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা ক্ষুদ্র একটি দল। তাঁদের দলনেতা খবর পেলেন, ওই এলাকায় পাকিস্তানি সেনা এসেছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা কতজন এবং তাদের শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে কিছুই তার দলের জানা ছিল না। দলনেতার নির্দেশে সদর উদ্দিন আহমেদসহ মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত তৈরি হলেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র বলতে হালকা অস্ত্র—স্টেনগান ও রাইফেল এবং কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেড। গুলির পরিমাণও সামান্য। এসবই সম্বল করে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের খোঁজে। তাঁরা সেনাদের মুখোমুখি হলেন হরিনারায়ণপুরের কাছে আড়পাড়ায়।

দলনেতার নির্দেশে সদর উদ্দিন আহমেদ ও তাঁর সহযোদ্ধারা আক্রমণ করলেন পাকিস্তানি সেনাদের। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা হকচকিত হলেও পাল্টা আক্রমণে দেরি করেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি যেতে থাকল। তাঁদের পক্ষে মাথা তোলাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল।

পাকিস্তানি সেনা সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি। অস্ত্রশস্ত্রও অত্যাধুনিক। গোলাগুলির একপর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের গুলি প্রায় শেষ হয়ে গেল। তাঁরা প্রচণ্ড ঝুঁকির মুখে পড়ে গেলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা সহযোদ্ধাদের দ্রুত পেছনে হটে নিরাপদ জায়গায় যেতে বললেন।

মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করছেন বুঝতে পেরে পাকিস্তানি সেনারা তাদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ল। এ রকম পরিস্থিতিতে সামনাসামনি যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বেশি গুলি না থাকায় সদর উদ্দিন আহমেদ সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি একাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করবেন। এই সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানে সরে যাবেন।

এরপর সদর উদ্দিন সাহসের সঙ্গে একাই সম্মুখযুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু এটা ছিল অসম যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ। এ ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর।

মো. সদর উদ্দিন আহমেদ পড়াশোনা শেষ করে ১৯৭১ সালে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ শেষে ভারতে যান। চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের শিকারপুর সাবসেক্টরে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় তিনি সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার

বীর প্রতীক

গ্রাম হাবলা, উপজেলা বাসাইল, টাঙ্গাইল।
বাবা মোবারক আলী তালুকদার, মা মাহফুজা বেগম।
তাঁর এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৩।

১৭ জুন ভোরে বাথুলীতে হাজির হলো একদল পাকিস্তানি সেনা। তারা আক্রমণ করল মো. হাবিবুর রহমান তালুকদারদের দলের ওপর। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ চালালেন। মো. হাবিবুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনা আক্রমণ প্রতিহত করে চললেন।

যুদ্ধ চলতে থাকল। এর মধ্যে আবদুল কাদের সিদ্দিকীও (বীর উত্তম) মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর সঙ্গেও ছিলেন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে থেমে গেল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা। শেষে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে গেল। ওই এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলেই থাকল।

দুই দিন পর ১৯ জুন ভোরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাথুলীতে আবার হাজির হলো। এবার তারা ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু করল। মো. হাবিবুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা এতে দমে গেলেন না। আগের মতোই বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করে চললেন।

বেলা আনুমানিক ১১টা। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া শেল এসে পড়ে মো. হাবিবুর রহমান তালুকদারের একেবারে কাছাকাছি অবস্থানে। নিমেষে বিস্ফোরিত শেলের টুকরো এসে লাগল তাঁর পায়ে। আহত হয়েও তিনি দমে গেলেন না। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন। সহযোদ্ধারা দ্রুত মো. হাবিবুর রহমান তালুকদারকে উদ্ধার করে পাঠালেন চিকিৎসকের কাছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাঁকে পাঠানো হয় হেডকোয়ার্টার্স চিকিৎসাকেন্দ্রে।

বাসাইল থানা টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত। জেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। করটিয়া-সখীপুর সড়কে বাসাইলের অবস্থান। কাদেরিয়া বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পসহ সব কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণস্থল ছিল সখীপুর। মে-জুন মাসে যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য কাদেরিয়া বাহিনী বেশ কয়েকটি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জুন বাসাইল থানা দখল করা হয়।

বাথুলী যুদ্ধে আহত মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার পরে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে আর অংশ নিতে পারেননি। পুরোপুরি সুস্থ হতে তাঁর প্রায় তিন মাস সময় লাগে। এরপর তিনি কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক বিভাগে কাজ করেন।

মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার ১৯৭১ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়া সা'দত কলেজের এইচএসসির ছাত্র ছিলেন। ছাত্ররাজনীতিও করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। টাঙ্গাইলের সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রবল আক্রমণে টাঙ্গাইলে তাঁদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। তখন তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে তিনি কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোফাজ্জল হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম বড়িকান্দি, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা তোফাজ্জল হোসেন, মা জোবেদা বেগম।
স্ত্রী কোহিনুর বেগম। তাঁর এক মেয়ে ও এক ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৭৬। মৃত্যু ২০০৬।

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মোফাজ্জল হোসেনসহ নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের কাছে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান। তাঁরা আসেন সমুদ্রবন্দরে দুঃসাহসী এক অপারেশন করতে। ১৩ আগস্ট রেডিওর আকাশবাণী কেন্দ্রে পরিবেশিত হয় একটি গান— 'আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম যত গান'। এ গান শোনার পর দলনেতার নির্দেশে তাঁরা সবাই প্রস্তুত হন। পাকিস্তানিদের সতর্ক চোখ এড়িয়ে গোলাবারুদসহ শহর অতিক্রম করে পরদিন কর্ণফুলী নদীর তীরে পৌঁছান। এরপর নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা অপেক্ষায় থাকেন আকাশবাণী বেতারকেন্দ্রে আরেকটি গান শোনার জন্য। গানটি সেদিনই বাজার কথা ছিল, কিন্তু তা বাজেনি। ১৫ আগস্ট সকালে গানটি বাজে। 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি'। দলনেতা সহযোদ্ধাদের জানান ওই রাতেই হবে অপারেশন।

এরপর মোফাজ্জল হোসেনসহ নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা চরম উৎকণ্ঠায় সময় কাটান। তাঁদের স্নায়ুচাপ বেড়ে যায়। কারণ, ওই রাতই হয়তো তাঁদের জীবনে শেষ রাত। আগামীকালের সকাল হয়তো কারও জীবনে আর আসবে না। এভাবে ১৫ তারিখের সূর্য বিদায় নেয়। অন্ধকার নেমে আসে নৌ-মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন শিবিরে। তাঁরা দ্রুত প্রস্তুত হন।

বর্ষণমুখর রাত। গাঢ় অন্ধকার। মোফাজ্জল হোসেনসহ মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে রওনা হন। রাত আনুমানিক একটায় কর্ণফুলী নদীর পানিতে নেমে সাঁতার কেটে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা লক্ষ্যের দিকে। জাহাজসহ নানা জলযানে মাইন লাগিয়ে আবার ফিরে আসতে থাকেন। রাত আনুমানিক দুইটা ১৫ মিনিট। হঠাৎ কানফাটা আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা নগর। একের পর এক বিস্ফোরণ। বন্দরে থাকা পাকিস্তানিরা ছোটাছুটি শুরু করে। কী ঘটেছে তারা কেউ জানে না।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় ১৬ আগস্ট চট্টগ্রাম, খুলনাসহ আরও কয়েকটি নৌবন্দরে একযোগে কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। এতে পাকিস্তানি সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হইচই পড়ে। এর সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট'।

মোফাজ্জল হোসেন চাকরি করতেন পাকিস্তানি নৌবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানে (তখন পশ্চিম পাকিস্তান)। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ছুটিতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। ভারতে যাওয়ার কিছুদিন পর তিনি মুক্তিবাহিনীর নৌ-দলে অন্তর্ভুক্ত হন।

জ্যাকপট অপারেশন করার পর নৌ-মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান। কিছুদিন পর তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আবার বাংলাদেশে রওনা হন। এবার আগের মতো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছিল না। কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোবারক হুসেন মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম দক্ষিণ মির্জানগর পূর্বপাড়া, আমিরগঞ্জ, রায়পুরা, নরসিংদী। বাবা হুসাইন আলী, মা আরেফা খাতুন। স্ত্রী বেগম নূরজাহান। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৪। গেজেটে নাম মোবারক হোসেন।

মুক্তিবাহিনীর ৩ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত হতে থাকলেন চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য। একটি দলে আছেন মোবারক হুসেন মিয়া। আক্রমণের নির্ধারিত সময় ১ ডিসেম্বর মধ্যরাত। লক্ষ্যবস্তু আখাউড়া ও সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ।

মোবারক হুসেনের দলের (কোম্পানি) অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মতিন (বীর প্রতীক, পরে মেজর জেনারেল)। তাঁর অধীনে আছে আরও একটি দল। ৩০ নভেম্বর সকালে তিনি জরুরি খবর পেয়ে চলে যান সিংগারবিলের মুক্তিযোদ্ধা অবস্থানে। সেদিন বা পরদিনও তিনি ফিরে এলেন না। আক্রমণের নতুন পরিকল্পনার কারণে তাঁকে সেখানে থেকে যেতে হয়। সেখানে যুদ্ধে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। এ খবর মোবারক হুসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা পাননি।

ক্রমে আক্রমণের সময় ঘনিয়ে এল। মোবারক হুসেন তাঁর অধিনায়কের জন্য রাত ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। শেষে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে তাঁর কাছে থাকা ভেরি লাইট পিস্তল দিয়ে নির্ধারিত সময় সংকেত দিলেন। সংকেত পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সামনে রওনা হলেন। এদিকে আগেই নির্ধারিত ছিল, আক্রমণ শুরু করার আগে ভারতীয় গোলন্দাজ দল দূরপাল্লার গোলাবর্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করবে।

১১টা ৪৫ মিনিটে গোলাবর্ষণ শুরু হলো। এই অবস্থায় তাঁরা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলেন। পাকিস্তানি বাহিনীও পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু করল। এর তীব্রতা এমন যে অনেক দূরে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। নির্ধারিত সময় ভারত থেকে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর দুই পক্ষে শুরু হয়ে গেল রাইফেল, মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি। এইভাবে ঘণ্টা খানেক যুদ্ধ চলল।

এর মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ ও গুরুতর আহত হলেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। মোবারক হুসেন বিচলিত না হয়ে সামনে এগোতে থাকেন। তাঁকে দেখে তাঁর সহযোদ্ধারাও অনুপ্রাণিত হলেন। বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ করে চললেন। গোলাগুলির একপর্যায়ে হঠাৎ তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে গুলি লাগে। পরে এক সহযোদ্ধার সহযোগিতায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগ দেন। এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

মোবারক হুসেন মিয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেষণে ইপিআরে কর্মরত ছিলেন। ডিসেম্বরে তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। এ সময় পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ক্রমে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে নির্ধারিত ছুটি শেষ হওয়ার পরও তিনি আর পাকিস্তানে যাননি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোশাররফ হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম ভীমপুর, উপজেলা চাটখিল, নোয়াখালী। বাবা মোবারক উল্লাহ, মা আম্বিয়া খাতুন। স্ত্রী জাহেদা খাতুন। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬০। গেজেটে নাম মোশাররফ হোসেন বাঙাল। মৃত্যু ১৯৮৯।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনের বেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে যান মোশাররফ হোসেন। গোপনে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান। তারপর ফিরে যান নিজেদের শিবিরে। শিবিরে বসে তৈরি করেন মানচিত্র। দূরত্ব হিসাব করে তা বুঝিয়ে দেন দলনেতার কাছে। দুই-তিন দিন পর নির্ধারিত হয় আক্রমণের সময়। তখন আবার চলে যান পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থানের কাছে। এবার অবস্থান নেন উঁচু গাছে।

নির্ধারিত সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে শুরু হয় গোলাবর্ষণ। গাছের ওপর বসে মোশাররফ হোসেন লক্ষ করেন সেগুলো সঠিক নিশানায় পড়ছে কি না। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দলের কাছে নির্দেশনা দেন। তাঁর নির্দেশনায় নিখুঁত নিশানায় গোলা পড়তে থাকে। দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনারা। এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের।

মোশাররফ হোসেন ছিলেন মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দলের সদস্য। মুজিব ব্যাটারির ওপি হিসেবে তিনি শত্রু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আক্রমণ পরিচালিত হতো। সফলতার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

AMARBOI.COM

মোশাররফ হোসেন ১৯৭১ সালে কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণও তাঁর নেওয়া ছিল। ২৫ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাসিক এলাকায় ছিলেন। পরে ঢাকা থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় যান। সেখানে এলাকার ছাত্র-যুবক সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিছুদিন পর ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টরে দুই-তিনটি গেরিলা অপারেশনে অংশ নেন। পরে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বীর প্রতীক

গ্রাম গাউটিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা ২০/৫ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা। বাবা আবদুল খালেক, মা আনোয়ারা খাতুন। স্ত্রী আনোয়ারা রশীদ। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৯। জিয়াউর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত।

পাকিস্তানি সেনারা শহরের দিকে আসছে—খবর পেয়ে মোহাম্মদ আবদুর রশীদ একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে অবস্থান নিলেন পথে। অগ্রগামী পাকিস্তানি সেনাদের বাধা দেওয়ামাত্র শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা মোহাম্মদ আবদুর রশীদের নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলা করতে থাকলেন। থেমে গেল পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। এ ঘটনা রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে প্রেষণে অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে। তখন তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। ২৫ মার্চের পর তিনি রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির প্রশিক্ষণরত পুলিশ কর্মকর্তা ও কাছের ইপিআর বিওপির বাঙালি সেনাদের সংগঠিত করে নিজেই একটি দল গঠন করেন। পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবিলায় তিনি তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের মোতায়েন করেন ঈশ্বরদী-রাজশাহী রেললাইনে।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরাট একটি দল ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখে আসতে থাকে। আরিচা ঘাট দিয়ে যমুনা নদী অতিক্রম করে তারা নগরবাড়ী আসার পর মুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি দল তাদের বাধা দেয়। তখন দুই পক্ষের মধ্যে সামান্য গোলাগুলি হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ঈশ্বরদী ও নাটোর হয়ে আবার রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হয়। তখন মোহাম্মদ আবদুর রশীদ তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করেন। তাঁর অধীন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়।

সেই সময় এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, মোহাম্মদ আবদুর রশীদের দলের তখন প্রস্তুতি এবং অস্ত্র-গোলাবারুদ যে পরিমাণ থাকা দরকার, তা ছিল না। তার পরও তিনি দুর্দম আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালান। তাঁর এই প্রত্যয় অব্যাহত থাকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ পরে মুক্তিবাহিনীর ৭ নম্বর সেক্টরের শেখপাড়া সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সাবসেক্টরে বেশ কটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁর দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ছিল রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর, পুঠিয়া, চারঘাট ও বাঘা উপজেলা। এই এলাকা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের জন্য অত্যন্ত সুরক্ষিত।

বিশাল পদ্মা নদীর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ রাজশাহী ও এই এলাকার জন্য বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল। শেখপাড়া সাবসেক্টরের অধীন এলাকায় অপারেশন করার জন্য পদ্মা নদী পার হতে হতো। মুক্তিযোদ্ধারা মোহাম্মদ আবদুর রশীদ নেতৃত্বে বাঘা, বাজুবাঘা, বেসপুকুরিয়া, চারঘাট ও দুর্গাপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন চালান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ আবদুল মতিন, বীর প্রতীক

গ্রাম কাজলা, উপজেলা তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা ফ্ল্যাট-সি ৩, বাড়ি-১০০, সড়ক-৪, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম। বাবা আবদুল গনি, মা রওশন আরা বেগম। স্ত্রী শওকত আরা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ০৩।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর থেকে সিলেটমুখী সড়কের ১৮ মাইল পরই মাধবপুর। হবিগঞ্জ জেলার (১৯৭১ সালে মহকুমা) অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধকালে ২৮ এপ্রিল এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যে যুদ্ধ হয়, তাতে এই বাহিনীর একটি দলের নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদ আবদুল মতিন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখলের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২১ এপ্রিল শাহবাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়। জঙ্গি বিমানের অব্যাহত আক্রমণ এবং অবিরাম কামানের গোলাবর্ষণের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনারা নদীর তীর ধরে শাহবাজপুরে চলে আসে। মোহাম্মদ আবদুল মতিন সাহসের সঙ্গে সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।

রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শাহবাজপুর দখল করে। তবে মোহাম্মদ আবদুল মতিনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের যথেষ্ট দেরি করিয়ে দিতে সক্ষম হন। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ ক্ষয়ক্ষতিও করেন।

AMARBOI.COM

মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আর প্রতিরক্ষা অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আবদুল মতিন সহযোদ্ধাদের নিয়ে পিছিয়ে যান। এরপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জগদীশপুর-ইটখোলা সড়কে নতুন করে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলেন। পরে কৈতরা গ্রামে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

২৮ এপ্রিল সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবদুল মতিনের প্রতিরক্ষা অবস্থানে ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। তারা নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করছিল। প্রাথমিক আক্রমণের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দল দুপুর ১২টার মধ্যে মাধবপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সব প্রতিরক্ষার সামনে পৌঁছে যায়।

প্রথমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সেনা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। বাঁ পাশের দল মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দক্ষিণ ভাগের অবস্থান অর্থাৎ মোহাম্মদ আবদুল মতিনের প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয় দলটি মুক্তিবাহিনীর দুই প্রতিরক্ষাব্যূহের মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তৃতীয় দলটি মুক্তিবাহিনীর অপর প্রতিরক্ষাব্যূহের ওপর আক্রমণ চালায়।

পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আরেকটি ব্যাটালিয়ন এসে যুদ্ধে যোগ দেয়। বিকেল চারটা পর্যন্ত দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সংকটময় এমন মুহূর্তে মোহাম্মদ আবদুল মতিন বিচলিত হননি। সহযোদ্ধাদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেন।

মোহাম্মদ আবদুল মতিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৭১-এ মার্চে ছুটিতে ছিলেন পৈতৃক বাড়িতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ময়মনসিংহে সমবেত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ পেলে ৩ নম্বর সেক্টরের সিমনা সাবসেক্টরের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে এস ফোর্সের অধীন ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানির অধিনায়ক হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

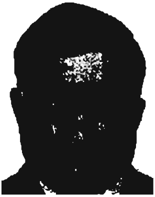

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, বীর প্রতীক

গ্রাম বরায়া উত্তরভাগ, উপজেলা গোলাপগঞ্জ, সিলেট। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৯৩/এ, সড়ক ৬/সি, পুরাতন ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা। বাবা এইচ এম আলী, মা মোমেনা খানম। স্ত্রী নূরনাহার সালাম। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪১। গেজেটে নাম আব্দুস সালাম।

মোহাম্মদ আব্দুস সালামসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা শেষ রাতে নিঃশব্দে হাজির হলেন একটি সেতুর ধারে। সেখানে আছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী একদল মিলিশিয়া ও রাজাকার। কৌশলে তাদের আটক করলেন তাঁরা। তারপর বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সেতু।

এই অপারেশনের বিবরণ শোনা যাক মোহাম্মদ আব্দুস সালামের ভাষ্যে : 'সময়টা আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। সে সময় একদিন মেজর কে এম সফিউল্লাহ (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান) ক্যাম্পে এলেন। শায়েস্তাগঞ্জের পূর্ব পাশে কেরাঙ্গী নদীর ওপর দারাগাঁও রেলসেতু ধ্বংস করার পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রিফিং দিলেন। তাঁর ব্রিফিং শেষ হওয়ামাত্র আমি বলে উঠলাম, এই অপারেশন আমি করতে পারব। পরে সাবসেক্টর কমান্ডার আমাকে নিয়ে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করে কত জনবল দরকার, কারা কারা যাবেন ইত্যাদির তালিকা করলেন।

'আমাদের ক্যাম্প থেকে অপারেশনস্থল প্রায় ২৫ মাইল দূরে। সময় হিসাব করে দুপুর ১২টার দিকে আশ্রমবাড়ীর ক্যাম্প থেকে অ্যাম্বুলেন্স ও একটি ট্রাক্টরে আমরা সিন্দুরখান সীমান্তে যাই। সেখান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে হাঁটতে থাকি। পাহাড়ি পথ। কখনো ৩০০ ফুট উঁচুতে উঠতে হয়, কখনো সমতলে নামতে হয়। এভাবে বেলা তিনটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত হেঁটে আমরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাই।

'সেতুর দুই পাশেই পাহারা। মিলিশিয়া ও রাজাকার মিলে ১২ জন। সেতুটি ৬০-৭০ গজ দীর্ঘ। সেখানে ঘূর্ণমান সার্চলাইট জ্বালানো। আমরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হলাম। একটি দল গেল পশ্চিম পাশে। একটি দল পূর্ব পাশে। একটি দল থাকল বিস্ফোরক লাগানোর জন্য।

'ক্রলিং করে সেতুর কাছে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাহারারত দুই মিলিশিয়াকে কৌশলে আমরা আটক করলাম। বাকিরা ঘরের ভেতর তাস খেলছিল। তাদেরও আমরা একই কায়দায় আটক করলাম। আমাদের সংকেত পেয়ে এক্সপ্লোসিভ দল সেতুতে এক্সপ্লোসিভ লাগাতে শুরু করল। এক্সপ্লোসিভ লাগানো শেষ, এ সময় দেখি দুই রাজাকার চা নিয়ে আসছে। তাদের আমরা গুলি করে মেরে ফেললাম। আগে আটক করা ব্যক্তিদের সেতুর মাঝখানে বেঁধে রাখা হলো।

'সেফটি কর্ডে আগুন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। মনে হলো, আকাশ ভেঙে বজ্রপাত হচ্ছে। ভেঙে পড়তে থাকল লোহার গার্ডার। লোহার কিছু টুকরো উড়ে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। সেতুটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল।'

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম ১৯৭১ সালে ঢাকার জিন্নাহ (বর্তমান তিতুমীর) কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৩ নম্বর সেক্টরের আশ্রমবাড়ী সাবসেক্টরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ ইব্রাহিম, বীর প্রতীক

পাপুয়া মিজিবাড়ি, উপজেলা সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
বাবা হায়দার আলী মিজি, মা ছামারফ বানু।
স্ত্রী ছলেমা বেগম। তাঁদের এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৯৩। মৃত্যু ২০০৭।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টরের অধীনে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। হালিশহরে ছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স। এর অধীনে ছিল তিনটি উইং—১১ ও ১৪ উইংয়ের অবস্থান ছিল হালিশহরে, ১৭ উইংয়ের ছিল কাপ্তাইয়ে। ১১ উইংয়ের ইপিআর সদস্যরা ছিলেন কক্সবাজার, টেকনাফ, বরকল ও মাসলংয়ে এবং ১৪ উইংয়ের সদস্যরা ছিলেন সাজেক, ট্যানডং ও রামগড়ে।

মার্চ মাসের শুরুতে চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টরের অধীন ইপিআর সদস্যদের চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়। অল্পসংখ্যক সদস্য থেকে যান সীমান্ত এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা সরাসরি তাতে অংশ নেন। ২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা সংঘবদ্ধ ও বিচ্ছিন্নভাবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এসব যুদ্ধে তারা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম পরে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টরে। এই সাবসেক্টরের অধীন এলাকা ছিল বিলুনিয়ার পশ্চিমাঞ্চল, লাকসামের দক্ষিণাঞ্চল, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম-নাঙ্গলকোট, ফেনী জেলার অংশবিশেষ এবং নোয়াখালী জেলার কিছু অংশ। রাজনগর সাবসেক্টর এলাকায় অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মোহাম্মদ ইব্রাহিম বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেন।

তবে এসবের মধ্যে কোন যুদ্ধে মোহাম্মদ ইব্রাহিম অংশ নিয়েছেন, সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

বীর প্রতীক

গ্রাম চণ্ডীপুর, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা সুফিয়া মঞ্জিল, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। বাবা সাদত আলী, মা সুফিয়া খাতুন। স্ত্রী সুলতানা আরা বেগম। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯৫।
গেজেটে নাম মোহাম্মদ খুরশেদ আলম।

রাস্তায় স্টেনগান হাতে সতর্ক প্রহরায় মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। অদূরে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিকআপ ভ্যান। তাঁর সহযোদ্ধারা নিঃশব্দে তাতে লিমপেট মাইন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র তুলছেন। আধাআধি তোলা হয়েছে, এ সময় মোহাম্মদ খোরশেদ আলম দেখতে পেলেন কাছেই এক তরুণ পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে। তরুণটি রাজাকার না মুক্তিবাহিনীর সদস্য, এই দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি রাজাকার হয়, তাহলে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ওই তরুণ তাঁর স্টেনগানের গুলির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। এই অবস্থার মুখে ওই তরুণ দিল চম্পট। অনুসরণ করেও ধরতে পারলেন না তাকে।

এ ঘটনা চট্টগ্রাম শহরের। ঘটেছিল ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা (মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো) তখন গোপনে চট্টগ্রাম এসেছিলেন বন্দরে অপারেশন করার জন্য। সীতাকুণ্ডে রাখা ছিল তাঁদের মাইন ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র। সে দিন মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ কয়েকজন সীতাকুণ্ড থেকে চট্টগ্রাম শহরে সেগুলো নেওয়ার জন্য পিকআপে তুলছিলেন। বিপদের মুখে মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সহযোদ্ধাদের সঙ্গে পরামর্শ করে পিকআপ নিয়ে সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়েন। বড় রাস্তায় এসে তরিতরকারি (বরবটি, ঝিঙে ইত্যাদি) কিনে সেগুলো দিয়ে ঢেকে দেন মাইন ও অস্ত্রগুলো। গাড়ি ছেড়ে দিলেই শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। পরিস্থিতি তাঁদের অনুকূলে আসে। নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই শহরের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যান।

১৫ আগস্ট শেষ রাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ১৬ আগস্ট) তাঁরা চট্টগ্রাম বন্দরে সফলভাবে অপারেশন করেন। তাঁদের অপারেশনে কয়েকটি জাহাজ, বার্জ, গানবোট ও পন্টুন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস এবং কয়েকটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ছিল জাহাজ এমভি আল আব্বাস, এমভি হরমুজ, বার্জ ওরিয়েন্ট, দুটি গানবোট ও দু-তিনটি পন্টুন। এ ছাড়া ছোট কয়েকটি বার্জ সম্পূর্ণ তলিয়ে যায়। অপারেশনে অংশ নেন ৩৭ জন। নৌ-কমান্ডোদের বেশির ভাগই পানিতে নেমে সাঁতরে নির্দিষ্ট টার্গেটে গিয়ে জায়গামতো মাইন সংযুক্ত করেন। কয়েকজন তীর থেকে একটু দূরে প্রহরায় থাকেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দলনেতা আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (বীর উত্তম-বীর বিক্রম) এবং মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ কয়েকজন।

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যাওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে যোগ দেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ শরীফ, বীর প্রতীক

গ্রাম ছয়আনী টগবা, চাটখিল, নোয়াখালী।
বাবা সুলতান আলী, মা ছবুরা বেগম। অবিবাহিত।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৫১। শহীদ ৯ মে ১৯৭১।

১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে মোহাম্মদ শরীফসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন কুমিল্লার বিবিরবাজারে। মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট গেরিলাদলের সদস্যরা এখান থেকে গোমতী নদী অতিক্রম করে কুমিল্লা শহরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখতেন। তাঁরা অনেক সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কুমিল্লা শহরের অবস্থানের ওপর মর্টার হামলাও চালাতেন। এতে পাকিস্তানি সেনারা হতাহত হতো। এ জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রতিরক্ষা অবস্থানে মে মাসের শুরু থেকে ব্যরবার আক্রমণ চালাতে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় ৮ মে সন্ধ্যার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রতিরক্ষা অবস্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৯ বালুচ রেজিমেন্ট তাদের গোলন্দাজ বাহিনী ও ট্যাংকের সাহায্যে অতর্কিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। সেনাবাহিনী প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পূর্ব দিকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণ মোহাম্মদ শরীফসহ মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে নস্যাৎ করে দেন। তাঁদের পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেকে নিহত ও আহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়।

পরদিন ৯ মে সকালে পাকিস্তানি সেনারা দক্ষিণ দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আবার আক্রমণ করে। এ দিনের যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ এবং চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয়। মোহাম্মদ শরীফসহ মুক্তিযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। তাঁরা তাঁদের এই প্রতিরক্ষা অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। যুদ্ধে শহীদ হন তিনিসহ কয়েকজন। যুদ্ধ চলাবস্থায় মোহাম্মদ শরীফের বুকে ও মাথায় গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে মেজর খালেদ মোশাররফের (বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল এবং ১৯৭৫ সালে ক্যু, পাল্টা ক্যুর ঘটনায় নিহত) বয়ানে। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে এবং পেছন দিক থেকে আমরা ঘেরাও হওয়ার আশঙ্কায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই অবস্থান ছাড়তে হয়। এ যুদ্ধে ইপিআরের জওয়ানরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে মনে পড়ে এক নায়েকের কথা। সে শত্রুদের গুলি করতে করতে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের নিহতের বিপুলসংখ্যা দেখে একপর্যায়ে "জয় বাংলা" হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় দুর্ভাগ্যবশত তাঁর মাথায় গুলি লাগে এবং মারা যান।

'যুদ্ধে আমার ছয়জন সেনা মারা যায় এবং ৮-১০ জন আহত হয়। আহতদের পেছনে নিয়ে আসি। কিন্তু তাঁদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। এ রকম একজন আহত তরুণ ছাত্রের কথা মনে পড়ে, যাঁর পেটে গুলি লেগেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপারেশন করার ব্যবস্থা না থাকায় সে মারা যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ সিদ্দিক, বীর প্রতীক

পৈতৃক নিবাস বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম চরনোয়াবাদ, সদর, ভোলা। বাবা গোলাম রহমান, মা উম্মে কুলসুম। স্ত্রী হাসিনা বেগম ও খাদিজা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৩৬। মৃত্যু ২০০৫।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার লাতুমুড়া সীমান্ত এলাকা। ১৯৭১-এর ২২ জুন। সীমান্তের ওপারে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের নেতা রাতে খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল চন্দ্রপুর-লাতুমুড়ার দিকে আসছে। খবর পেয়েই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই দলকে অ্যামবুশের সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুক্তিযোদ্ধারা দলনেতার নির্দেশে দ্রুত প্রস্তুত হলেন। তিনটি উপদলে বিভক্ত তাঁরা। একটি দলে থাকলেন মোহাম্মদ সিদ্দিক। পরদিন ভোর হওয়ার আগেই তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে অবস্থান নিলেন লাতুমুড়ার কাছে ইয়াকুবপুর-কুয়াপাইনা ও খৈনলে।

পাকিস্তানি সেনারা পথে এক স্থানে রাত যাপন করে সকালে এসে উপস্থিত হলো মুক্তিযোদ্ধাদের অ্যামবুশ এলাকায়। ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে আসামাত্র গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধা সবার অস্ত্র। আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত পাকিস্তানি সেনারা। এমন আক্রমণ তারা কল্পনাও করেনি। দিশাহারা হয়ে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে গেল। আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও তিনজন আহত হলো।

পাকিস্তানি সেনারা পেছনে সংগঠিত হয়ে পুনরায় এগিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের পাল্টা আক্রমণ চালাল। মোহাম্মদ সিদ্দিক ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে সেই আক্রমণ প্রতিহত করলেন। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। এরপর দিনভর দুই পক্ষে গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে যায়। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দল তাদের আক্রমণ করে বেশ ক্ষতিসাধন করে।

পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে লাতুমুড়ার উত্তরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। পরদিন ২৪ জুন পাকিস্তানি সেনারা যখন নিজেদের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরিতে ব্যস্ত, তখন মোহাম্মদ সিদ্দিক ও তাঁর সহযোদ্ধারা তাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালান। ওই আক্রমণে নিহত হয় আরও কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুজন আহত হন।

চন্দ্রপুর-লাতুমুড়া অ্যামবুশে মোহাম্মদ সিদ্দিক যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মূলত তাঁদের দলের হাতেই পাকিস্তানি সেনাদের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়।

মোহাম্মদ সিদ্দিক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল কুমিল্লা সেনানিবাসে। ১৯৭১-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি এই রেজিমেন্টের বেশির ভাগ সদস্যকে সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়। কিছু সদস্য থাকেন সেনানিবাসে। তিনি সেনানিবাসে ছিলেন। ২৫ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যান।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে ক্যাপ্টেন এম এ মতিনের (বীর প্রতীক, পরে ব্রিগেডিয়ার) নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলার মাস্তাননগর ও মিরসরাইয়ে যুদ্ধ করেন। ২০ এপ্রিল মিরসরাইয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ হাফিজ, বীর প্রতীক

গ্রাম রতনপুর, উপজেলা নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মুন্সি রহমতউল্লাহ, মা আসাদুন্নেছা বেগম। স্ত্রী আম্বিয়া খাতুন। তাঁদের এক ছেলে ও চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৫২। মৃত্যু ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদ হাফিজ নিঃশব্দে পৌঁছালেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছে। উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ করল। মোহাম্মদ হাফিজ সহযোদ্ধাদের দ্রুত সংগঠিত করলেন। তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল গোয়াইনঘাটে ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবরে।

গোয়াইনঘাট সিলেট জেলার অন্তর্গত। ১৯৭১ সালে সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। এই প্রতিরক্ষা অবস্থানে আক্রমণ করার জন্য নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৩ অক্টোবর রাতে সেখানে সমবেত হয়। নদীর পূর্বপাড়ে আক্রমণের দায়িত্ব ছিল আলফা কোম্পানির। এই দলে ছিলেন মোহাম্মদ হাফিজ।

লেংগুরা গ্রামের দক্ষিণে ব্রিজহেড তৈরির মাধ্যমে সুরমা নদী অতিক্রম করে তাঁরা সেখানে পৌঁছান। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। পাকিস্তানিরা ভোররাতে (তখন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ২৪ অক্টোবর) আকস্মিকভাবে তাঁদের আক্রমণ করে। এ সময় মোহাম্মদ হাফিজ সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। দুপুরের পর হেলিকপ্টারযোগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নতুন দল এসে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। তাদের ফায়ার পাওয়ার ছিল খুবই শক্তিশালী। এই রকম এক চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মোহাম্মদ হাফিজ তাঁর দলবল নিয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলে। গোটা এলাকা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কোনো কোনো স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতাহাতি যুদ্ধ পর্যন্ত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২২ জন শহীদ ও ৩০ জন আহত হন।

মোহাম্মদ হাফিজ তাঁর এক লেখায় এই যুদ্ধের স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন: '...দুপুর ১২টার দিকে শত্রুরা আমাদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এ সময় অসংখ্য পাকিস্তানি সেনা আচমকা পেছন দিক থেকে এসে 'হ্যান্ডসআপ' বলে চিৎকার করে ওঠে। আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক শত্রুর দিকে এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার করি। আমার সঙ্গে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের ত্রিমুখী আক্রমণ খুবই সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। আমরা সবাই শত্রুর বেষ্টনী থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হই। সে দিনের ঘটনাটি ছিল আমার মুক্তিযুদ্ধ জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।'

মোহাম্মদ হাফিজ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর সেনানিবাসে। তিনি ছিলেন আলফা কোম্পানিতে। তখন তাঁর পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মার্চ মাসে তাঁরা ছিলেন দিনাজপুরের পার্বতীপুরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন জেড ফোর্সের অধীনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম আমড়াতলী, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট। বর্তমান ঠিকানা মোগড়া, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাবা মো. তাহের খান। মা গোলাপচান বেগম। স্ত্রী শামসুননাহার বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও তিন ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৬৯। গেজেটে নাম মো. হোসেন। মৃত্যু ২০০৭।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একদল মুক্তিযোদ্ধা প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গঙ্গাসাগর ও তালশহরে। দুটি উপদল অগ্রবর্তী দল হিসেবে অবস্থান নেয় দরুইন গ্রামে। মো. হোসেন (মোহাম্মদ হোসেন) ছিলেন একটি উপদলের নেতৃত্বে। অপর উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন মোস্তফা কামাল (বীরশ্রেষ্ঠ, দরুইন যুদ্ধে শহীদ)।

১৮ এপ্রিল সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ওই এলাকায় উপস্থিত হয়। তারা দূর থেকে গোলাগুলি শুরু করে। সেদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথমে দক্ষিণ দিকে অবস্থান নিয়ে আক্রমণের ব্যাপক মহড়া প্রদর্শন করে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা মনে করেন যে মোগড়াবাজার ও গঙ্গাসাগরেই পাকিস্তানিরা আক্রমণ করবে। এ জন্য তাঁরা মূল শক্তি সেদিকেই বেশি নিয়োজিত করে আক্রমণ মোকাবিলার প্রস্তুতি নেন।

পাকিস্তানিরা প্রকৃত আক্রমণ শুরু করে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ দরুইনের দিক দিয়ে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের এই বিভ্রান্তি ও বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানিরা দ্রুত দরুইন গ্রামের খুব কাছে পৌঁছে যায়। মোহাম্মদ হোসেন ও মোস্তফা কামাল সহযোদ্ধাদের নিয়ে বিপুল বিক্রমে পাকিস্তানিদের অপ্রত্যাশিত ওই আক্রমণ প্রতিহত করেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

দরুইন গ্রামের দিকে আগত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই দলটি ছিল বেশ বড় ও বেপরোয়া। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সংখ্যানুপাতে মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে তারা ছিল অনেক বেশি।

মোহাম্মদ হোসেন ও মোস্তফা কামাল এতে মনোবল হারাননি। সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখেন। কিন্তু একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের একাংশ তাঁদের পেছনে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানিরা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। ফলে তাঁরা প্রচণ্ড ঝুঁকির মুখে অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁদের পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

কাভারিং ফায়ারের ছত্রচ্ছায়ায় মোহাম্মদ হোসেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে নিরাপদেই পশ্চাদপসরণ করেন। অপর উপদলের মুক্তিযোদ্ধারাও পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু ওই দলের দলনেতা মোস্তফা কামাল কাভারিং ফায়ার দেওয়ার সময় পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণে শহীদ হন। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে চারজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম, বীর প্রতীক

গ্রাম মুছাপুর, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা অ্যাপার্টমেন্ট এ ৪, প্লট বি ৪২, সড়ক ১ এ, বনানী, ঢাকা। বাবা ফজলুল হক, মা হালিমা খাতুন। স্ত্রী পারভিন সুলতানা। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৬। গেজেটে নাম দিদারুল আলম।

কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার পাঁচথুড়ি ইউনিয়নের দুটি গ্রাম আমড়াতলী ও কৃষ্ণপুর। অবস্থান গোমতী নদীর উত্তর পারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। ওপারে ভারতের মতিনগর ও কোনাবন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মতিনগরে ছিল মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের একটি সাবসেক্টর। ওই ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করে আমড়াতলী-কৃষ্ণপুর গ্রামে এসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলের ওপর আক্রমণ চালাতেন।

১৯৭১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সকালে মতিনগর সাবসেক্টরে অবস্থানরত মোহাম্মেদ দিদারুল আলম খবর পান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল আমড়াতলী-কৃষ্ণপুরে এসেছে। তাদের সঙ্গে আছে রাজাকার বাহিনী। মতিনগরে তখন মুক্তিযোদ্ধা ১০০ জনের মতো। তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন পেশাদার। বাকি সবাই স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তার পরও মোহাম্মেদ দিদারুল আলম দমে যাননি। স্বল্প শক্তি নিয়েই তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

তাঁর নির্দেশে সহযোদ্ধাদারা দ্রুত তৈরি হলেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালেন। তখন সকাল প্রায় ১০টা। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা হকচকিত। সেটা অবশ্য কিছু সময়ের জন্য। তারা যে যেভাবে পারল, পজিশন নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধারা মোহাম্মেদ দিদারুল আলমের নেতৃত্বে সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকলেন।

যুদ্ধ চলল সারা দিন। সন্ধ্যার পর মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তের ওপারে চলে গেলেন। কারণ, তাঁদের গোলাগুলি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য বাধ্য হয়েই তাঁরা পশ্চাদপসরণ করেন। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কয়েকজন নিহত ও অনেকে আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হননি।

পাকিস্তানি সেনারা ফিরে যাওয়ার সময় রাতে পাশের একটি গ্রামে হামলা চালায়। গ্রামে কেউ ছিল না। তবে একটি বাড়িতে অনেক শরণার্থী ভারতে যাওয়ার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সেনাদের নির্বিচার গুলিতে প্রায় ৪০-৪২ জন নিরপরাধ নারী-পুরুষ শরণার্থী শহীদ হন।

মোহাম্মেদ দিদারুল আলম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা থেকে পালিয়ে চাঁদপুরে গিয়ে স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন। চাঁদপুর ও লাকসামের কাছে বাগমারাসহ বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেন।

পরে ভারতে পুনঃসংগঠিত হওয়ার পর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোহাম্মেদ দিদারুল আলম ২ নম্বর সেক্টরের মতিনগর সাবসেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মুক্তিবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ দল 'মুজিব ব্যাটারি'তে অন্তর্ভুক্ত হন। অনেক গেরিলা এবং খণ্ডযুদ্ধ, অ্যামবুশ, ডিমলিশন, আর্টিলারি যুদ্ধ তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে কুমিল্লা জেলার কোটেশ্বর ও চট্টগ্রাম জেলার নাজিরহাটের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিউল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম উত্তর আনন্দপুর, ইউনিয়ন মুন্সিরহাট, উপজেলা, ফুলগাজী, ফেনী। বাবা আমিনউল্লা মজুমদার, মা ছাবেদা খাতুন। স্ত্রী মেহের আফরোজ বেগম। তাঁদের এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৫০। শহীদ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্ত এলাকায় নিজেদের ক্যাম্প প্রহরায় আরও কয়েকজনসহ মুক্তিযোদ্ধা রবিউল হক। ক্যাম্পের পাশেই রাখা পাকিস্তানি সেনাদের ফেলে যাওয়া বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। হঠাৎ তাঁদের ক্যাম্পের আশপাশে পড়তে লাগল গোলা। বিভ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বোঝার চেষ্টা করলেন সেগুলো আসছে কোন দিক থেকে। তাই তাঁরা দ্রুত নিরাপদ অবস্থানে যেতে লাগলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল পাঠাননগরে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে।

পাঠাননগর ফেনী জেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিলোনিয়া দখল করলে পাকিস্তানি সেনারা পাঠাননগরে সমবেত হয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় এবং পেছন দিকে পালিয়ে যায়। তারা ফেলে যায় অসংখ্য গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধারা সেগুলো সংগ্রহ করে পাঠাননগরে তাঁদের ক্যাম্পে জমা করেন। ওদিকে পাকিস্তানি সেনাদের একাংশ পালিয়ে যায় চট্টগ্রামের দিকে। অপর দলটি যায় লাকসামের দিকে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং হাতেগোনা কয়েকজন থেকে যান ক্যাম্প, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের পাহারায়। এই দলে ছিলেন রবিউল হক।

৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা ফেনী মুক্ত করেন। এরপর তাঁরা অগ্রসর হন চট্টগ্রামের দিকে। এ সময় পলায়নরত পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা ব্যাপক হারে দূর ও স্বল্প পাল্লার কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। একদিন সেসব গোলারই কিছু এসে পড়ে পাঠাননগরে। এসব গোলার আঘাতে সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হঠাৎ এই সময় একটি গোলা এসে পড়ে রবিউল হকের একদম কাছে। বিস্ফোরিত গোলার স্প্লিন্টার সরাসরি আঘাত হানে তাঁর শরীরে। তিনি শহীদ হন। পরে সহযোদ্ধারা রবিউল হকের মরদেহ পাঠিয়ে দেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে। সেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রবিউল হক চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন ময়মনসিংহ ইপিআর সেক্টরের অধীনে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টরে তিনি যুদ্ধ করেন। বিলোনিয়া, পরশুরামসহ আরও কয়েকটি জায়গায় সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুন নূর মাওলা, বীর প্রতীক

গ্রাম বাসুদেব, ইউনিয়ন উপজেলা গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
বাবা নূর মোহাম্মদ মাওলা, মা সুফিয়া বেগম।
স্ত্রী জান্নাতুন নাহার মাওলা। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৯৮।
গেজেটে নাম এস এম মওলা। মৃত্যু ১৯৮৪।

সহযোদ্ধা নৌ-কমান্ডোদের সঙ্গে শফিকুন নূর মাওলা (এস এম মওলা) সাঁতার কেটে যেতে থাকলেন সমুদ্রের গভীরে। পানির মধ্যে তাঁদের পায়ের ফিনস অনবরত ওঠানামা করছে। এক ঘণ্টার বেশি সময় সাঁতরে তাঁরা মাথা তুলে তাকালেন লক্ষ্যস্থলের দিকে। দেখলেন লক্ষ্যস্থল তখনো অনেক দূরে। আরও আধা ঘণ্টা সবাই সমানতালে সাঁতার কাটলেন। তার পরও দূরত্ব কমল না। ক্লান্ত হয়ে গেলেন তাঁরা। সামনে কিংবা পেছনে যাওয়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন। চরম দুঃসাহস প্রদর্শন করেও ব্যর্থ হলেন তাঁরা। এ ঘটনা চট্টগ্রাম নৌবন্দরের বহির্নোঙরে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকের কোনো একদিন।

দুঃসাহসী এই অপারেশনের জন্য নৌ-কমান্ডোরা রেকি করেছিলেন। কিন্তু রেকিতে তাঁদের একটা বড় ভুল হয়। সেটা হলো দূরত্বের হিসাব। তাঁরা অনুমান করেছিলেন বহির্নোঙরের দূরত্ব দেড়-দুই মাইলের বেশি হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই দূরত্ব ছিল তিন-চারগুণেরও বেশি। জলপথের দূরত্ব হিসাব করার ব্যাপারে তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন না। নৌ-কমান্ডোরা তাঁদের অজ্ঞাতেই বিরাট এই ভুল করে ফেলেন। রহস্যের এই নিষ্ঠুর মরীচিকা তাঁদের জন্য দুঃখময় এক মরণফাঁদ রচনা করে।

এস এম মাওলাসহ দুঃসাহসী নয়জন নৌ-কমান্ডো রাতে ভাটার সময় সমুদ্রের পানিতে নেমে লক্ষ্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু দেড় ঘণ্টার বেশি সময় সাঁতরেও তাঁরা সেখানে পৌঁছাতে পারেননি। দেড় ঘণ্টা ধরে একটানা সাঁতরানোর পর এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে তাঁরা সামনে বা পেছনে ফেরার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের অভিযান শেষ হয় ট্র্যাজিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

পরে জোয়ারের প্রবল ধাক্কায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় সমুদ্রের তীরে পৌঁছান। তখন তাঁদের অনেকের জ্ঞান ছিল না। নয়জনের মধ্যে শফিকুন নূর মাওলাসহ চারজন মৃতপ্রায় অবস্থায় যেখানে ভেসে ওঠেন, সেখানে ছিল সশস্ত্র প্রহরা। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের দেখে ফেলে। সেনারা তাঁদের আটক করে। তাঁদের ব্যাপক নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। নির্যাতনে একজন (মোহাম্মদ হোসেন, বীর প্রতীক) মারা যান। শফিকুন নূর মাওলাসহ তিনজনকে পরে ঢাকা সেনানিবাসে পাঠানো হয়। এখানেও চলে তাঁদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন। স্বাধীনতার পর তাঁরা ছাড়া পান।

শফিকুন নূর মাওলা ১৯৭১ সালে ঢাকার তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে চলে যান। ভারতে তিনি মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডো দলে যোগ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম জোত রহিমপুর, ইউনিয়ন ইছালী, সদর, যশোর।
বাবা নওয়াব আলী বিশ্বাস, মা জরিনা বেগম।
স্ত্রী শাহনাজ বেগম। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৩২। মৃত্যু ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

গোলাগুলির শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। বৃষ্টির মতো শত শত গুলি ধেয়ে আসছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে। গোলাও এসে পড়ছে বিরামবিহীন। শফিকুর রহমান ও তাঁর সহযোদ্ধারা ভীতসন্ত্রস্ত হলেন না। অধিনায়কের নির্দেশ পেয়ে গোলাগুলি উপেক্ষা করে সাহসের সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন সামনের দিকে। ঢুকে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহের ভেতরে। এ সময় হঠাৎ একটি গোলা এসে পড়ল শফিকুর রহমানের পাশে। বিস্ফোরিত গোলার বড় এক স্প্লিন্টার আঘাত করল তাঁর বাঁ হাতে। নিমেষে উড়ে গেল তাঁর হাতের সামনের অংশ। এ ঘটনা ঘটে কামালপুরে ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই।

জামালপুর জেলায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ঘেঁষে কামালপুরের অবস্থান। সেদিন মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওই ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদের বয়ানে কামালপুর যুদ্ধের বিবরণ আছে। তাতে তিনি বলেন, '৩১ জুলাই ভোর সাড়ে তিনটার সময় দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমরা কামালপুর বর্ডার আউট পোস্টে আক্রমণ করি। এফইউপিতে পৌঁছানোর পূর্বেই আমাদের পক্ষ থেকে আর্টিলারির গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এফইউপিতে পৌঁছার পরই আর্টিলারি ব্যবহার করার কথা ছিল। এতে মুক্তিযোদ্ধারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

'এ সময়ে শত্রুপক্ষও আর্টিলারি ও ভারী মর্টারের সাহায্যে গোলাগুলি শুরু করে। তা সত্ত্বেও আমি ও সালাহউদ্দীন আমাদের কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের একত্র করে শত্রুদের আক্রমণ করি ও সামনে অগ্রসর হই। কাঁটাতার এবং মাইন ফিল্ড অতিক্রম করে শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষার অর্ধেক জায়গা দখল করে নিই। শত্রুরা পেছন দিকে হটে যায়।

'এই আক্রমণ ও যুদ্ধে আমাদের পক্ষে একজন অফিসারসহ ৩১ জন যোদ্ধা শহীদ ও দুজন জুনিয়র কমিশন অফিসারসহ ৬৫ জন আহত হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, শত্রুপক্ষের ৫০ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়। ওই আক্রমণ যদিও পুরোপুরি সফল হয়নি, তবু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় আক্রমণ ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাঁটাতারের ঘের ও মাইন ফিল্ড উপেক্ষা করে আমাদের যোদ্ধারা যেভাবে অসীম সাহসিকতায় সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তা থেকে প্রমাণিত হয় তাঁরাও অসীম বীরত্বের অধিকারী।'

শফিকুর রহমান ওই যুদ্ধে আহত হওয়ার পর সহযোদ্ধারা তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেন ফিল্ড হাসপাতালে। পরে ভারতে তাঁর চিকিৎসা হয়।

শফিকুর রহমান চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহিদুল হক ভূঁইয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম তন্তর, উপজেলা আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা সুন্দর আলী ভূঁইয়া, মা করপুলের নেছা।
স্ত্রী বকুল বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৯৫। গেজেটে নাম ভূঁইয়া।

মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে। তাঁদের সঙ্গে আছে মিত্রবাহিনীও। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। শহিদুল হক ভূঁইয়া মুক্তিবাহিনীর অবজারভার। তিনি দূরবর্তী স্থানে থাকা যৌথ বাহিনীর গোলন্দাজ (আর্টিলারি) দলকে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে গ্রিড রেফারেন্স (শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য) জানাচ্ছেন। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গোলন্দাজ দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে গোলা ফেলছে।

ভোরে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, চলল দুপুর ১২টা পর্যন্ত। কিন্তু মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে সাঁড়াশি আক্রমণ করেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তেমন ক্ষতি করতে পারল না। বরং তাদেরই ক্ষয়ক্ষতি হলো ব্যাপক। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সেনারা দিশাহারা। এ অবস্থায় তাঁদের পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়া হলো। তাঁর বেতারযন্ত্রেও এল সেই নির্দেশ। সে সময় শহিদুল হক ভূঁইয়া মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলামের (বীর বিক্রম) পাশে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাংকার উঁচু স্থানে। সেখান থেকে বৃষ্টির মতো দূরপাল্লার গুলি ছুটে আসছে। শহিদুল হক ভূঁইয়া বেতারযন্ত্রে কথা বলছেন, এ সময় তাঁর চোখের সামনে খন্দকার আজিজুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল তাঁর প্রাণবায়ু। শহীদ হলেন তিনি।

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরও মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্য যে মনোবল ছিল, এরপর তা-ও ভেঙে পড়ল। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে। এ ঘটনা ঘটে চন্দ্রপুর-লাতুমুড়ায় ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বরে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপুর-লাতুমুড়া। কসবা রেলস্টেশন থেকে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে। এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা। এই প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল বেশ সুবিধাজনক স্থানে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী যৌথভাবে সেখানে আক্রমণ করে।

এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। মিত্রবাহিনীর একজন কোম্পানি কমান্ডার (শিখ মেজর), তিনজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারসহ ৪৫ জন, মুক্তিবাহিনীর লেফটেন্যান্ট খন্দকার আজিজুল ইসলামসহ ২২ জন শহীদ হন। আহত হন অসংখ্য। পরে আহত ও শহীদদের মরদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে শহীদ হন আরও কয়েকজন।

শহিদুল হক ভূঁইয়া চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। ফেব্রুয়ারি মাসে ছুটিতে বাড়িতে আসেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি ঢাকা সেনানিবাসের ট্রানজিট ক্যাম্পে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সেখান থেকে পালিয়ে নিজ এলাকায় এসে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর ভারতে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ উল্লাহ, বীর প্রতীক

গ্রাম ফরদাবাদ, উপজেলা বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
বাবা আবদুল জলিল, মা আমেনা বেগম।
স্ত্রী শায়েস্তা বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০৯। মৃত্যু ২০০২।

তীব্র শীত, অন্ধকার ও কুয়াশার বাধা উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকলেন সামনে। তাঁরা কয়েকটি দলে বিভক্ত। একটি দলে আছেন শহীদ উল্লাহ। রাত আনুমানিক ১১টা। তাঁরা সমবেত হলেন সিঙ্গারবিলের অদূরে।

চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। একটু পর নির্ধারিত সময়েই (রাত ১১টা ৪৫ মিনিট) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। এই গোলা আসছে তাঁদের পেছন থেকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ ব্যাটারি সীমান্ত থেকে দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ করছে। এর তীব্রতা এমন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠছে। বিকট শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণের সুযোগে শহীদ উল্লাহ এবং তাঁর সহযোদ্ধারা আবার এগিয়ে যেতে থাকলেন। উদ্দেশ্য সিঙ্গারবিল রেলস্টেশন দখল করা। তাঁরা লক্ষ্যস্থলের আনুমানিক ৪০০ গজ দূরে পৌঁছালে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে সীমান্ত এলাকা থেকে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ব্যাপক গোলাবর্ষণে পাকিস্তানি সেনারা ভীতসন্ত্রস্ত। তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান প্রায় তছনছ। এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। নিমেষে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে শুরু হয়ে গেল মেশিনগান, এলএমজি আর রাইফেলের অবিরাম গোলাগুলি।

কুয়াশা আর শীতের মধ্যে যুদ্ধ করা বেশ কষ্টকর। সব উপেক্ষা করে শহীদ উল্লাহ ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। হতোদ্যম পাকিস্তানি সেনারা ভোররাতে পালিয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে এল সিঙ্গারবিল।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকলেন আজমপুর রেলস্টেশন অভিমুখে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিকেলের মধ্যে আজমপুর রেলস্টেশনও তাঁরা দখল করে ফেললেন। সেখানে থাকা পাকিস্তানি সেনারাও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুখে তখন পালিয়ে গেল।

মধ্যরাতে পরিশ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা কেউ ঘুমিয়ে, কেউ জেগে। হঠাৎ এল পুনঃসংগঠিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জোরালো পাল্টা আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধারা বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেও আজমপুর রেলস্টেশনের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলেন না। মুক্তিযোদ্ধারা এতে মনোবল হারালেন না। পরদিন পুনঃসংগঠিত হয়ে আক্রমণ চালালেন সেখানে। যুদ্ধের পর আবার দখল করলেন আজমপুর রেলস্টেশন। পাকিস্তানি সেনারা একেবারে পালিয়ে গেল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ১ থেকে ৩ ডিসেম্বরের।

শহীদ উল্লাহ চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরে, পরে এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখাওয়াত হোসেন, বীর প্রতীক

গ্রাম কাজলা, ইউনিয়ন বৈরাটি, উপজেলা পূর্বধলা, নেত্রকোনা। বাবা মহিউদ্দিন তালুকদার, মা আশরাফুননেছা। অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১১। গেজেটে নাম বাহার। ১৯৭৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে হামলার ঘটনায় নিহত।

১৯৭১ সালের জুন মাসের একদিন। মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দল পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্ধকার রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে যেতে থাকে। শাখাওয়াত হোসেন বাহার একটি দলের নেতৃত্বে।

একজন পথপ্রদর্শক তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্ধকারে পথপ্রদর্শকের ভুল নির্দেশনায় তাঁরা শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থানের একদম কাছে চলে যান। উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের আক্রমণ করে। ঠিক তখনই শুরু হয় ভারত থেকে কামানের গোলাবর্ষণ। সেগুলো পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর না পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপরই পড়ে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ এবং নিজেদের গোলায় শহীদ ও আহত হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। জীবন বাঁচাতে কেউ কেউ দলনেতার নির্দেশ ছাড়াই বিভিন্ন দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করেন। চরম সংকটময় অবস্থায় শাখাওয়াত হোসেন দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। একই সঙ্গে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করে গোলন্দাজ দলকে পরিস্থিতি জানান। পরে তারা নিশানা ঠিক করে পাকিস্তানি ঘাঁটির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে।

এরপর শাখাওয়াত হোসেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আক্রমণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর দলের বেশির ভাগ সহযোদ্ধা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মনোবলও ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় তিনি পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

সেদিন শেষ পর্যন্ত তাঁদের আক্রমণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে তিনি দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অস্ত্র দিয়ে গুলি করে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখেন। এ সুযোগে তাঁর সহযোদ্ধারা নিরাপদ স্থানে চলে যান। তাঁর একক প্রচেষ্টায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণে বেঁচে যান। এ ঘটনা হালুয়াঘাটের। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হালুয়াঘাট। সেখানে আছে সীমান্ত ফাঁড়ি। সেখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। এখানে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়।

শাখাওয়াত হোসেন ১৯৭১ সালে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে তিনি যোগ দেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ দখলের জন্য অগ্রসর হতে থাকলে তিনি ইপিআরদের সংগঠিত করে মধুপুর সেতুর অপর পাশে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিমান আক্রমণ করে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে দেয়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি শাখাওয়াত হোসেন ভারতে যান। তুরায় এক্সপ্লোসিভ ও লিডারশিপ প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের ঢালু ও মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি পরে আরও কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। কামালপুরে কয়েক দিন পরপরই তাঁরা গেরিলা হামলা চালাতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুদ্দীন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম মহিষখোলা, উপজেলা মিরপুর, কুষ্টিয়া। বাবা হাউস সরদার, মা জরিমন নেছা। স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন ওরফে আনারজান। তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭৮। শহীদ ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ছিল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় (তখন থানা)। তাঁদের দলনেতা আফতাব উদ্দিন আহমেদ। তাঁর দলে শামসুদ্দীন আহমেদসহ মাত্র কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের ক্ষুদ্র একটি দল।

দলনেতা আফতাব খবর পেলেন, তাঁদের এলাকায় পাকিস্তানি সেনা এসেছে। পাকিস্তানি সেনা কতজন, তাদের শক্তি কী, তা তিনি জানেন না। তার পরও তিনি পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গেরিলা আক্রমণ করার দুঃসাহসী এক সিদ্ধান্ত নিলেন।

এরপর তাঁর নির্দেশে শামসুদ্দীন আহমেদসহ মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত তৈরি হলেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র বলতে স্টেনগান, রাইফেল আর কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেড। গুলিও সামান্য। তা-ই সম্বল করে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন পাকিস্তানি সেনাদের উদ্দেশে। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি হলেন শেরপুরে। দৌলতপুর উপজেলারই অন্তর্গত শেরপুর।

দলনেতার নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। আকস্মিক আক্রমণে সেনারা হকচকিত। তবে নিমেষেই তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। তীব্র সেই আক্রমণ। বৃষ্টির মতো শত শত গুলি মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার ওপর দিয়ে যেতে থাকল। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে মাথা তোলাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল।

পাকিস্তানি সেনারা সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিগুণেরও বেশি। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে অত্যাধুনিক। একপর্যায়ে পাকিস্তানি আক্রমণের তীব্রতা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি শেষ হওয়ার পথে। ফলে তাঁরা প্রচণ্ড ঝুঁকির মুখে পড়ে গেলেন।

এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা সিদ্ধান্ত নিলেন পশ্চাদপসরণের। কিন্তু ব্যাপক গুলির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদপসরণ বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। তাঁরা কখনো ক্রল করে, কখনো দৌড়ে যেতে থাকলেন। এভাবে শামসুদ্দীন আহমেদ ও তাঁর এক সঙ্গী ছাড়া সবাই পালাতে সক্ষম হলেন। তাঁরা দুজন বেশি দূর যেতে পারলেন না। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা শামসুদ্দীন আহমেদকে শেরপুরের পাশের সাতবাড়িয়া গ্রামে ঘেরাও করে।

ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত শামসুদ্দীন আহমেদ অস্ত্রসহ পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। তখন তাঁর কাছে কোনো গুলি ছিল না। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে আটকের পর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বরের।

শামসুদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালে কৃষিকাজের পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ শেষে ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের শিকারপুর সাবসেক্টরে। কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর ও দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম ঘাসিপুর, সদর উপজেলা, চাঁদপুর।
বাবা ইসমাইল মিয়াজি, মা উলফতেন্নেছা।
স্ত্রী জয়নব বানু। তাঁদের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৫৪। মৃত্যু ২০১০।

১৯৭১ সালে নোয়াগাঁও গ্রামে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক ঘাঁটি। নোয়াগাঁও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার অন্তর্গত। কুমিল্লা থেকে উর্ধ্বতন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা কয়েক দিন পর পর সেখানে আসত। স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ জনসাধারণকে সেখানে ডেকে এনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সভা করত। মূল উদ্দেশ্য মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড ঠেকানো।

এ এলাকা ছিল মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টরের মন্দভাগ সাবসেক্টরের অধীন। এ এলাকায় যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর একটি দলের দলনেতা ছিলেন আবদুল ওয়াহাব (বীর বিক্রম)। আর একটি দলের (মর্টার প্লাটুন) দলনেতা ছিলেন শামসুল হক। ১৭ জুলাই তাঁরা খবর পান পাকিস্তানিরা পরদিন নোয়াগাঁওয়ে আবার এমন সভার আয়োজন করেছে। এরপর তাঁরা দুই দল মিলে সেখানে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮ জুলাই ভোরে শামসুল হক ও ওয়াহাব গোপন শিবির থেকে সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওনা হন নোয়াগাঁওয়ের উদ্দেশে। সুবিধাজনক স্থানে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন।

সভা শুরু হয় আনুমানিক বেলা ১১টা-সাড়ে ১১টার দিকে। শেষ হয় দেড়-দুই ঘণ্টার মধ্যে। লোকজন চলে যায়। এরপর পাকিস্তানি দুই সেনা কর্মকর্তা স্কুলমাঠসংলগ্ন ওপিতে (অবজারভেশন পোস্ট) উঠে বাইনোকুলার দিয়ে সীমান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণ শুরু করে। কিছুসংখ্যক সেনা এদিক-সেদিক পায়চারি করতে থাকে।

এ সুযোগ হাতছাড়া করেননি শামসুল হক ও ওয়াহাব। একসঙ্গে গর্জে ওঠে শামসুল হকের কাছে থাকা তিন ইঞ্চি মর্টার এবং ওয়াহাবের কাছে থাকা এলএমজি। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে গুলি শুরু করেন। নিমেষে শান্ত এলাকা গোলাগুলিতে প্রকম্পিত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানি শিবিরে সবাই ছোটাছুটি শুরু করে। প্রকাশ্যে এমন আক্রমণ তারা কল্পনাও করেনি। শামসুল হকের ছোড়া মর্টারের গোলা নিখুঁত নিশানায় আঘাত করে ওপি এবং স্কুলঘরে। ওপিতে নিহত একজনের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে থাকে। হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি।

সেদিন দুজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাসহ কয়েকজন নিহত ও অনেকে আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। এটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সফল এক অপারেশন। শামসুল হক এ অপারেশনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

শামসুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ২৭ মার্চ বিদ্রোহকালে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর তিনি প্রথমে ২ নম্বর সেক্টরের মন্দভাগ সাবসেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে তাঁকে কে ফোর্সের অধীন নবগঠিত নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহজামান মজুমদার, বীর প্রতীক

কালিতলা, সদর, দিনাজপুর। বর্তমান ঠিকানা পুরাতন ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা। বাবা রজব আলী মজুমদার, মা সায়েরা মজুমদার। স্ত্রী নূরনাহার মজুমদার। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩৪৪।

কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রাস্তায় গর্ত খোঁড়া শুরু করলেন। শাহজামান মজুমদারসহ বাকিরা থাকলেন সতর্ক প্রহরায়। গর্ত খোঁড়া শেষ করে তাতে অ্যান্টিট্যাংক মাইন বসিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিপুণভাবে মাটি ভরাট করলেন। এরপর মাটি খোঁড়ার চিহ্ন যাতে বোঝা না যায় সে জন্য ভরাট গর্তগুলোর ওপর দিয়ে কয়েকবার গাড়ির চাকা গড়াগড়ি করানো হলো। দেখে মনে হবে গাড়ির চাকার দাগ।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে অবস্থান নিলেন বিভিন্ন স্থানে। শাহজামান মজুমদার যেখানে অবস্থান নিয়েছেন, সেখান থেকে রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সময় গড়াতে থাকল। তাঁরা ছাড়া আশপাশে কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। গোটা এলাকা সুনসান। মাঝেমধ্যে শুধু পাখির কলকাকলি আর বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বিশেষত শাহজামান মজুমদার। এটাই তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ অপারেশন। তাঁর কাছে এসএমজি। উত্তেজনায় তাঁর হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে। শরীর ঘামছে। চোখ বড় বড় হচ্ছে। এর মধ্যে কেটে গেছে অনেক সময়।

একসময় শাহজামান মজুমদার রাস্তায় দেখতে পেলেন পাকিস্তানি সেনাদের এক কনভয়। প্রথমে একটি জিপ। দ্বিতীয়টি তিন-টনি বেডফোর্ড লরি। তৃতীয়টি একটি পাঁচ-টনি ট্রাক। এরপর একটি বাস। সেগুলো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সামনের জিপ মাইনের ওপর দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় গাড়িও। মাইন বিস্ফোরিত হলো না।

শাহজামান মজুমদারের হাতের আঙুল অস্ত্রের ট্রিগারে। মাইন বিস্ফোরণ হওয়ামাত্র গুলি করবেন। কিন্তু মাইন বিস্ফোরণ না হওয়ায় বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে থাকলেন, তবে কি কোনো ভুল হয়ে গেল! ঠিক তখনই পাঁচ-টনি ট্রাকের চাকা মাইনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে মাইনের বিস্ফোরণ। ট্রাকটি কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল। চারদিক কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

শাহজামান মজুমদার ও তাঁর সহযোদ্ধারা একযোগে গুলি শুরু করলেন। একদিকে মাইন বিস্ফোরণ, অন্যদিকে গুলি। হতভম্ব পাকিস্তানি সেনারা। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানি সেনারাও পাল্টা গুলি শুরু করল। শাহজামান মজুমদার তাঁর এসএমজির দুই ম্যাগাজিন গুলি শেষ করলেন। এরপর সহযোদ্ধাদের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করলেন নিরাপদ স্থানে। এ ঘটনা ঘটে তেলিয়াপাড়ায় ১৯৭১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি। তেলিয়াপাড়া হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। জেলা সদর থেকে দক্ষিণে।

শাহজামান মজুমদার ১৯৭১ সালে ঢাকায় উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বাড়িতে সবার অনুমতি নিয়ে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় যান। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। ৩ নম্বর সেক্টরে আখাউড়াসহ আরও কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ দিদার আলী, বীর প্রতীক

গ্রাম আড়ুয়াপাড়া, সদর, কুষ্টিয়া।
বাবা শেখ নূরুল ইসলাম, মা সুফিয়া খাতুন।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৮১।
শহীদ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। গেজেটে নাম দিদার আলী।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধ। শেখ দিদার আলীসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েক দিন আগে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের অবস্থান কুষ্টিয়ার সদর উপজেলায় (তখন থানা) গোপন এক শিবিরে। একদিন তাঁরা খবর পেলেন, তাঁদের এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল গ্রামবাসীকে নির্যাতন করছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের দলনেতা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন। শেখ দিদার আলীসহ তাঁর সব সহযোদ্ধা এ ব্যাপারে একমত হলেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বলতে এসএলআর, স্টেনগান আর রাইফেল। এ ছাড়া কয়েকটি গ্রেনেড। গুলির সংখ্যাও সীমিত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করলে বেশিক্ষণ তা মোকাবিলা করার শক্তি তাঁদের নেই। এতে তাঁরা মনোবল হারালেন না। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে রওনা হন অকুস্থলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা মুখোমুখি হলেন পাকিস্তানি সেনাদের। পাকিস্তানি সেনা আর রাজাকার মিলে সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি। সবাই এক স্থানে সমবেত। তারা নিরীহ গ্রামবাসীকে অত্যাচার-নির্যাতন করে তখন শহরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আয়োজন করছে। তাদের সঙ্গে আছে কিছু স্থানীয় দোসরও, অর্থাৎ রাজাকার।

গ্রাম থেকে লুটপাট করা অনেক মালামাল সেখানে স্তূপ করে রাখা। তিন-চারজন রাজাকার পাহারায়। আর পাকিস্তানি সেনারা লুটপাট করা মালামাল নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারায় ব্যস্ত। এতক্ষণ কোনো বাধা না পেয়ে তারা সবাই শিথিল অবস্থায়। মুক্তিযোদ্ধারা এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন।

আকস্মিক আক্রমণে হকচকিত পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা। তবে তারা, বিশেষত পাকিস্তানি সেনারা, নিজেদের সামলিয়ে নিমেষেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধারা এতে দমে গেলেন না। সীমিত সম্বল নিয়েই পাকিস্তানি আক্রমণ বিপুল বিক্রমে মোকাবিলা করতে থাকলেন। মুখোমুখি যুদ্ধ চলতে থাকল।

বৃষ্টির মতো গুলি করছে পাকিস্তানি সেনারা। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথা তোলা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। শেখ দিদার আলী এতে বিচলিত হলেন না। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। কিন্তু বেশি সময় পারলেন না। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া গুলি এসে লাগল তাঁর বুকে। তিনি ঢলে পড়লেন মাটিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ।

এ ঘটনা ৫ সেপ্টেম্বরের, কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার বংশীতলার কাছে দূর্বাচারা গ্রামে।

শেখ দিদার আলী পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করতেন কুষ্টিয়া টেলিফোন অফিসে। ১৯৭১ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ শেষে ভারতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের শিকারপুর সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

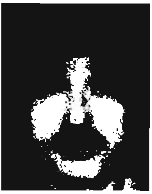

শেখ সোলায়মান, বীর প্রতীক

গ্রাম নারায়ণপুর, উপজেলা রাজৈর, মাদারীপুর। বাবা মো. সবদু শেখ, মা মাজু বিবি। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮৩। গেজেটে নাম শেখ সুলেমান। মৃত্যু ১৯৮৬।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে টানা প্রায় এক মাস শেখ সোলায়মান ও তাঁর সহযোদ্ধারা যুদ্ধে ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত যুদ্ধ করেন। ঠিকমতো তাঁদের আহার-নিদ্রা হয়নি। জনবল ও অস্ত্রের রসদ কমে যায়। সেনাবাহিনীর অব্যাহত আক্রমণের মুখে তাঁরা পিছু হটেন, কিন্তু মনোবল হারাননি।

এরপর শেখ সোলায়মান ও তাঁর সহযোদ্ধারা পিছু হটে সমবেত হন সীমান্ত এলাকায়। চারদিকে পাহাড়। তাঁদের অবস্থান এক জঙ্গলের ভেতরে। ভোর হয় হয়। এ সময় তাঁদের অবস্থানে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি সেনারা। শান্ত এলাকা তীব্র গোলাগুলিতে হঠাৎ প্রকম্পিত হয়ে পড়ে। শত্রুর আক্রমণে শেখ সোলায়মান ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিচলিত হননি। প্রত্যাশিত ছিল শত্রুর এ আক্রমণ। তাঁরা প্রস্তুতই ছিলেন। দ্রুত যে যেভাবে পারেন আক্রমণ মোকাবিলা শুরু করেন।

আক্রমণকারী পাকিস্তানি সেনারা ছিল বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য। জীবনের মায়া তাদের ছিল না। মরিয়া মনোভাব নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। শেখ সোলায়মান সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্তু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা তাঁরা ঠেকাতে ব্যর্থ হন। কয়েক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। এরপর তাঁরা পুনরায় পিছু হটতে বাধ্য হন। এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিলের। বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হেঁয়াকোয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিরোধযুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের পর সমবেত হন সীমান্তবর্তী রামগড়ে। তাঁদের একাংশ প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন হেঁয়াকোয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এ দলে ছিলেন শেখ সোলায়মান। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। একটি উপদলের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি।

রামগড় মুক্ত রাখতে সামরিক দিক থেকে হেঁয়াকো ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রামগড় দখলের জন্য পূর্ণ শক্তিতে অগ্রসর হয়। প্রথমে হেঁয়াকোয় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে শেখ সোলায়মানসহ মুক্তিযোদ্ধারা বেশ নাজুক অবস্থায় পড়ে যান। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাঁরা পিছু হটে চিকনছড়ায় যান। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক দিন পর সেখানেও আক্রমণ করে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের চিকনছড়া থেকে পিছু হটে রামগড় যেতে হয়। ২ মে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর রামগড়ের পতন ঘটে।

শেখ সোলায়মান চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম সেক্টরের অধীনে। তখন তাঁর পদবি ছিল হাবিলদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। কালুরঘাট, রাঙামাটি, হেঁয়াকো, চিকনছড়াসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। এরপর প্রথমে ১ নম্বর সেক্টরে এবং পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইদ আহমেদ, বীর প্রতীক

সুফি হাউস, আবদুস সালাম লেন, দক্ষিণ ঠাকুরপাড়া, সদর, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি ১৬, সড়ক ১২৭, গুলশান ১, ঢাকা। বাবা মীর আমির হোসেন। স্ত্রী নাসরিন চৌধুরী। তাঁদের দুই মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২৬।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত মুকুন্দপুর। ১৯৭১ সালের মে মাস থেকে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী মুকুন্দপুরে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যার পর পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এর আগে সেখানে কয়েকবার রেকি করা হয়। কিন্তু বারবার রেকি করেও পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষে একজন নারীর সহায়তায় সেই তথ্য পাওয়া যায়।

এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন সাইদ আহমেদ। তাঁর দলের বেশির ভাগই ছিলেন গণবাহিনীর সদস্য। নির্ধারিত দিন সূর্যোদয়ের আগে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান নেন। তাঁরা ছিলেন কয়েকটি উপদলে (প্লাটুন) বিভক্ত। দক্ষিণ দিকে একটি, উত্তর দিকে একটি ও মাঝে একটি দল।

দুপুরের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সাইদ আহমেদকে জানানো হয়, এই আক্রমণে তারাও অংশ নেবে। এই খবরে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। কারণ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর প্রতিশোধস্পৃহা তাঁদের আবেগকে শক্তিতে পরিণত করেছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের যা শক্তি আছে তা নিয়েই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে।

নির্ধারিত সময়ে আক্রমণ শুরু হয়; কিন্তু শুরুতেই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী (১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট) বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাপক গুলির মধ্যে ভারতীয় সেনারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে খাকি পোশাক পরিহিত মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি সেনা মনে করে ভারতীয় সেনারা তাঁদের ওপর গুলি ছোড়া শুরু করে। ফলে, আক্রমণ থমকে যায় এবং সাফল্যের আশা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

কিন্তু এতে হতোদ্যম বা মনোবল হারাননি অকুতোভয় সাইদ আহমেদ। কালক্ষেপণ না করে নিজেদের শক্তিতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। তাঁর প্রত্যয়ী মনোভাবে উজ্জীবিত হন সহযোদ্ধারা। পাকিস্তানি সেনারা ভারতীয় সেনাদের একাংশকে প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে পাকিস্তানি সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এতে ভারতীয় সেনারা প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

সেদিন যুদ্ধে ২৯ জন পাকিস্তানি সেনা, কয়েকজন ইপিসিএএফ বন্দী এবং কয়েকজন হতাহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সাইদ আহমেদ ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে তিনি প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হন। প্রশিক্ষণ শেষে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ৩ নম্বর সেক্টরের কলকলিয়া/বামুটিয়া সাবসেক্টরে যোগ দেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতা, সাহসিকতা নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইদুর রহমান, বীর প্রতীক

গ্রাম কামার্থী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড, কালিহাতী পৌরসভা, টাঙ্গাইল। বর্তমান ঠিকানা কুষ্টিয়া, কালিহাতী পৌরসভা, টাঙ্গাইল। বাবা সিরাজুল ইসলাম, মা বছিরুন্নেছা। স্ত্রী শাহীনা পারভীন। তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪২১।

টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে দক্ষিণে নাগরপুর উপজেলা। এর পরই মানিকগঞ্জ জেলার সীমানা শুরু। মুক্তিযুদ্ধকালে নাগরপুরে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত এক প্রতিরক্ষা অবস্থান। কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা বারবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানে আক্রমণ করেও জয়ী হতে পারেননি।

নভেম্বরের শেষে মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিলেন, কয়েকটি দল মিলে সেখানে আক্রমণ করবেন। এ জন্য সাইদুর রহমান, মালেক ও খোকার নেতৃত্বাধীন দলের বাছাই করা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হলো। আক্রমণের তারিখ নির্ধারিত হলো ৩০ নভেম্বর।

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত দল নির্ধারিত দিন সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে একযোগে আক্রমণ শুরু করলেন। সাইদুর রহমান দুঃসাহসের সঙ্গে সহযোদ্ধাদের নিয়ে গুলি করতে করতে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার খুব কাছে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখান থেকে পাকিস্তানি অবস্থানে প্রচণ্ডভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। মর্টার, এলএমজি ও রকেটের কর্ণবিদারী শব্দে আশপাশ এলাকা কেঁপে উঠতে থাকে।

পাকিস্তানি সেনাদের দলে ছিল এক কোম্পানি মিলিশিয়া ও শতাধিক রাজাকার। তারা সুরক্ষিত বাংকার থেকে পাল্টা আক্রমণ করে। বাংকারগুলো ছিল মাটির নিচে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের দুটি বাংকার ধ্বংস করলেন। কিন্তু তাতেও তারা কাবু হলো না। সারা দিন ধরে গোলাগুলি চলল। ক্রমে রাত নেমে এল। বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চলল রাতেও।

পরের দিন সকালে মুক্তিযোদ্ধারা নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করলেন। উপর্যুপরি আক্রমণে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা অবস্থান ভেঙে পড়ার উপক্রম। তখন আনুমানিক বেলা সাড়ে তিনটা। এ সময় সংবাদ এল একদল পাকিস্তানি সেনা টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুরে আসছে।

সাইদুর রহমান এতে বিচলিত হলেন না। সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। তাঁদের সাঁড়াশি আক্রমণে হতাহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি মিলিশিয়া ও তাদের সহযোগী রাজাকার। এর মধ্যে সেখানে হাজির হলো পাকিস্তানি সেনাদের নতুন দল। তারা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এ অবস্থায় সাইদুর রহমানকে সহযোদ্ধাদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)। তখন তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে পিছু হটে নিরাপদ স্থানে চলে যান।

সাইদুর রহমান ১৯৭১ সালে এইচএসসির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইলে গঠিত কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। বল্লা, ঘাটাইলের মাকড়াই, ভুঞাপুরসহ আরও কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ করেন। বল্লার যুদ্ধে নিহত পাকিস্তানি সেনাদের মৃতদেহ পাকিস্তানি সেনারা উদ্ধার করার চেষ্টা করে। তখন তিনি তাঁর দল নিয়ে তা নস্যাৎ করে দেন। যুদ্ধ চলা অবস্থায় তিনি ও তাঁর চার সহযোদ্ধা নদী সাঁতরে নিহত পাকিস্তানি সেনাদের মৃতদেহ নিজেদের অবস্থানে নিয়ে আসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইদুল আলম, বীর প্রতীক

গ্রাম চরকরমজী, সদর, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা কাঁঠালবাগান, ডেভাবর, সাভার, ঢাকা।
বাবা ইসরাইল বিশ্বাস, মা লালবানু বিবি।
স্ত্রী সেলিনা আলম। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১০৭।

মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি দল (এক ব্যাটালিয়ন শক্তি) গৌরীপুরে পৌঁছার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে পূর্ণ শক্তিতে অগ্রসর হয়ে তাঁদের আক্রমণ করে। আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ বেশ নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়।

এ সময় লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসানের (বীর প্রতীক, পরে মেজর) নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা ঝোড়োগতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মেশিনগান গ্রুপ ও এলএমজি গ্রুপের ফায়ারিং সাপোর্ট নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা সুকৌশলে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নাকের ডগার মধ্যে পৌঁছে যায়।

সাইদুল আলম ছিলেন মেশিনগান গ্রুপে। তিনি সাহসের সঙ্গে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। এরপর দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সাইদুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মেশিনগানের গুলিতে হতাহত হয় অনেক পাকিস্তানি সেনা। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা পরাজিত হয় এবং জীবিতরা সিলেটে পালিয়ে যায়।

গৌরীপুর যুদ্ধের পর সাইদুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মদের (বীর বিক্রম, পরে মেজর) নেতৃত্বে রওনা হন সিলেট শহর অভিমুখে। শহরের উপকণ্ঠে এমসি কলেজে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে সেখানে তাঁরা পৌঁছান।

একের পর এক যুদ্ধে সাইদুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা কিছুটা পরিশ্রান্ত। তাঁদের পরনে তেমন শীতবস্ত্রও নেই। তিন দিন তাঁরা প্রায় অনাহারে। কিন্তু তাঁদের যুদ্ধ করার আগ্রহে কোনোভাবে ভাটা পড়ল না।

শত্রুর নাকের ডগায় অর্থাৎ মাত্র ৫০০ গজ দূরত্বে টিলার ওপর ট্রেঞ্চ খুঁড়ে সাইদুল আলম ও তাঁর সহযোদ্ধারা অবস্থান নিতে শুরু করলেন। তখনই হঠাৎ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। তাঁদের দলের কাছে তিন ইঞ্চি মর্টারের গোলা আছে মাত্র ১৪টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই গোলা শেষ হয়ে গেল। সাইদুল এতে বিচলিত হলেন না। মেশিনগান দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। মেশিনগান গ্রুপের নিপুণ গুলিবর্ষণে হতাহত হলো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। শেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

সাইদুল আলম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ৩০ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্ট তাঁদের আক্রমণ করে। তখন তাঁরা যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইদুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম ঘাটিয়ারা, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাবা মমিনুল হক ভূঁইয়া, মা হাজেরা বেগম। স্ত্রী রওশন আরা বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২১৩।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন কসবা রেলস্টেশন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ অক্টোবর সাইদুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা সেখানে আক্রমণ করেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য একপর্যায়ে কসবা রেলস্টেশনে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি তৈরি করে। স্টেশন এলাকার চারদিকে ছিল মাইনফিল্ড। এ ছাড়া ছিল পর্যবেক্ষণ পোস্ট। রাতে সাইদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা সীমান্ত অতিক্রম করে নিঃশব্দে সেখানে অবস্থান নেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যান। মাইনফিল্ডের কারণে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। এতে তাঁরা দমে যাননি বা মনোবল হারাননি।

সব বাধা উপেক্ষা করে সাহসের সঙ্গে সাইদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। গোলাগুলিতে রাতের আকাশ লাল হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। শত্রুসেনাদের ওপর তাঁরা বিপুল বিক্রমে চড়াও হন। তাঁদের বিক্রমে পাকিস্তানি সেনারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে তারা কসবার পুরান বাজারের দিকে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে কসবা রেলস্টেশন।

২৫ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনারা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। সাইদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। সাহসের সঙ্গে তাঁরা পাল্টা আক্রমণ মোকাবিলা করতে থাকেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধের একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছোড়া একটি শেল বিস্ফোরিত হয় সাইদুল হকের পাশে। বিস্ফোরিত শেলের কয়েকটি ছোট-বড় স্প্লিন্টার আঘাত করে তাঁর শরীরে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

স্প্লিন্টারের আঘাতে সাইদুল হকের বাঁ পায়ের বিরাট অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটু পর সহযোদ্ধারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তখনো তাঁর জ্ঞান ছিল। এরপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সহযোদ্ধারা তাঁকে ফিল্ড চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠান। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় আগরতলায়। সেখানে চিকিৎসা চলা অবস্থায় তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় ভারতের উত্তর প্রদেশে। এখানে চিকিৎসা চলাকালে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

সাইদুল হক চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন সিলেট ইপিআর সেক্টরের অধীনে। তাঁর পদবি ছিল নায়েক। তিনি তখন তাঁর উইংয়ে (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন) কর্মরত একজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার দেহরক্ষী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। পরে তিনি নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধ করেন। তাঁকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কসবাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক

গ্রাম চৌসই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৫, সড়ক ৫৫, গুলশান ২, ঢাকা। বাবা কাজী আবদুল মুত্তালিব, মা নূরুন্নাহার বেগম। স্ত্রী খালেদা মরিয়ম সাজ্জাদ। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ২৪। গেজেটে নাম কাজী সাজ্জাদ আলী জহির।

সাজ্জাদ আলী জহির ১৯৬৯ সালের শেষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাকুল সামরিক একাডেমিতে সিনিয়র ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আগস্ট মাসের শেষে তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। কীভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন, তাঁর বয়ানেই তা শোনা যাক :

'কাকুল সামরিক একাডেমিতে বাঙালি আমরা কয়েকজন প্রশিক্ষণরত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল অথবা মে মাসে একাডেমি থেকে বাঙালি তিন-চারজন পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এস এম ইমদাদুল হক (বীর উত্তম, যুদ্ধে শহীদ)।

'তাঁর ও আমার একই সঙ্গে পালানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু একসঙ্গে একই কোম্পানি থেকে পালিয়ে গেলে দুজনেরই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই তিনি এবং অন্য কোম্পানি থেকে মোদাসসের (মোদাসসের হোসেন খান বীর প্রতীক) একসঙ্গে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

'...তাঁর পালিয়ে যাওয়ার খবর আমি চেপে রাখি। তিন-চার দিন পর খবরটা প্রকাশ পায়। তখন আমার কোম্পানি কমান্ডার এ ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করে কোর্ট মার্শাল করার হুমকি দেন। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি।

'আগস্ট মাসে আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরে কমিশন লাভ করি। আমার পোস্টিং হয় ৭৮ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট শিয়ালকোটে। একাডেমি থেকে শিয়ালকোটে যাওয়ার পথে আমি দুই দিন পিন্ডি অবস্থান করি। সেখানে দুই আত্মীয়সহ কয়েকজনের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করি। তাঁরা আমাকে যথাসম্ভব উপদেশ দেন। তা পরবর্তী সময়ে আমার কাজে লেগেছিল। এরপর শিয়ালকোটে যাই। কয়েক দিন পর সেখান থেকে পালিয়ে ভারতে যাই।'

সাজ্জাদ আলী জহির মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন সেপ্টেম্বর মাসে। এই সময় ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে কয়েকটি ১০৫ এমএম গান (হাউইটজার) দেয়। তা দিয়ে মুক্তিবাহিনীর জন্য একটি ফিল্ড আর্টিলারি ব্যাটারি (গোলন্দাজ দল) গঠন করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় রওশন আরা (বা ২ ফিল্ড) ব্যাটারি।

এই ব্যাটারিতে অন্তর্ভুক্ত হন সাজ্জাদ আলী জহির। তিনি সহ-অধিনায়ক ছিলেন। রওশন আরা ব্যাটারিতে ছিল ছয়টি গান। অক্টোবর মাস থেকে এই ব্যাটারি ১০৫ এমএম কামান দিয়ে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সকে বিভিন্ন যুদ্ধে আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট দিয়ে সহায়তা করে।

সাজ্জাদ আলী জহিরের পরিচালনায় রওশন আরা ব্যাটারি কয়েকবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে গোলাবর্ষণ করে। সঠিক নিশানায় গোলাবর্ষণ করার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামসুল আলম সিদ্দিকী, বীর প্রতীক

গ্রাম কালিয়াগ্রাম, উপজেলা ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
বাবা আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। মা রহিমা খাতুন।
স্ত্রী নূরুন নাহার বেগম। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ১৮১।
গেজেটে নাম এস এ সিদ্দিকী। মৃত্যু ২০০৮।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে সামসুল আলম সিদ্দিকীসহ (এস এ সিদ্দিকী) একদল মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন শেরপুর-সাদিপুরে। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সংযোগস্থল।

৮ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হন। একাংশ সিলেট শহরে, একাংশ খাদিমনগর এবং একাংশ আম্বরখানা ও ওয়্যারলেস স্টেশনে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন। তাঁদের আরেকটি অংশ ছিল সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে। তাঁরা বেশির ভাগ ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। এই দলে ছিলেন সামসুল আলম সিদ্দিকী।

২৩ এপ্রিল সকাল থেকে সামসুল আলম সিদ্দিকীরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক গোলাবর্ষণের মুখে পড়েন। কিন ব্রিজের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল তাঁদের দলের একটি এলএমজি পোস্ট। সেখানে পকিস্তানি সেনারা বিরামহীনভাবে গোলাবর্ষণ করে। এলএমজি ম্যান শহীদ হন। ফলে তাঁদের দলগত প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে।

সামসুল আলম সিদ্দিকী কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানিদের মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁদের সাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা অনেকক্ষণ নদী পারাপারে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে। তাঁর উপদলের অবস্থানের ডান দিকে ছিল তাঁদের দলের আরআর চালনাকারী উপদল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে ওই দলও অবস্থান ছেড়ে চলে যায়। তখন তাঁরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েন।

এতে অবশ্য বিচলিত হননি সামসুল আলম সিদ্দিকী। কিন্তু ভারী অস্ত্রের সমর্থন না থাকায় তাঁরা বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা অবস্থান ছেড়ে পেছনে যেতে বাধ্য হন। এ সময় অন্য উপদলের আতঙ্কগ্রস্ত কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা জানান, পাকিস্তানি সেনারা একদম কাছে চলে এসেছে। এরপর তাঁর ওই সহযোদ্ধারা পালিয়ে যান। এর পরের ঘটনা সে আরেক কাহিনি।

সামসুল আলম সিদ্দিকী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে এ রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি (চার্লি) ছিল ময়মনসিংহে ইপিআর বাহিনীর ২ নম্বর উইং হেডকোয়ার্টার্সে। এ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন তিনি।

২৭ মার্চ বাঙালি ইপিআর সেনারা বিদ্রোহ করেন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সামসুল আলম সিদ্দিকীসহ বেশির ভাগ বাঙালি সেনা বাঙালি ইপিআর সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে বেশির ভাগ পাকিস্তানি ইপিআর (উইং কমান্ডার কমর আব্বাসসহ) ও দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের পাকিস্তানি সেনা নিহত ও বাকিরা বন্দী হয়।

সামসুল আলম সিদ্দিকী প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরের আশ্রমবাড়ি সাবসেক্টরে, পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল ইসলাম, বীর প্রতীক

গ্রাম সাগাননা, সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ।
বাবা আবদুর রহমান বেপারী, মা আফিয়া খাতুন।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ২৪১।
শহীদ ৩১ জুলাই ১৯৭১।

মুষলধারায় বৃষ্টি আর ঘোর অন্ধকার। খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না। এর মধ্যেই সিরাজুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা দুটি দল (কোম্পানি) এবং কয়েকটি উপদলে (প্লাটুন ও সেকশন) বিভক্ত। তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সীমান্ত ঘাঁটি। সেখানে আক্রমণ করে ঘাঁটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ দল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দেয়। কিন্তু সেগুলোর কয়েকটি পাকিস্তানি অবস্থানের বদলে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে পড়ে। এতে হতাহত হন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা।

সিরাজুল ইসলাম ও তাঁর দলের সহযোদ্ধারা এতে দমে যাননি। মনের জোর ও অদম্য সাহসে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা অধিনায়কের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। সমন্বিত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরে।

প্রথম সারির অবস্থান ছেড়ে পাকিস্তানিরা অন্তঃসীমা প্রতিরক্ষা অবস্থানে সরে যায়। শেলপ্রুফ বাংকারে অবস্থান নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে। সিরাজুল ইসলামসহ ২২-২৩ জন অদম্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধা প্রচণ্ড গুলির মধ্যেই সামনে এগিয়ে যান। বাংকার অতিক্রম করে তাঁরা মূল প্রতিরক্ষার মধ্যে ঢুকে পড়েন। দুই পক্ষে একপ্রকার হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন সিরাজুল ইসলাম। তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধের একপর্যায়ে হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন তিনি। একঝাঁক গুলির কয়েকটি লাগে তাঁর দেহে। নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

এ ঘটনা ১৯৭১ সালের ৩১ জুলাইয়ের। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কামালপুর বিওপিতে। জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কামালপুর গ্রামের মাঝামাঝি বিওপির অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। চারপাশে ছিল বাংকার। মোটা গাছের গুঁড়ি ও কংক্রিটের মাধ্যমে সেগুলো আর্টিলারি শেলপ্রুফ করা হয়।

সেদিন যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা সাহসের সঙ্গে পার হয়ে মূল প্রতিরক্ষায় ঢুকে যান। এ সময় সিরাজুল ইসলামের দুই পাশের অনেক সহযোদ্ধা মাইন ও গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এর পরও তিনি থেমে যাননি। দেশমাতৃকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় প্রতিশোধের নেশায় এগিয়ে যান। কিন্তু বিজয়ী হতে পারেননি। তবে হেরে গিয়েও দেশমাতৃকার ভালোবাসায় জেতেন তিনি।

সিরাজুল ইসলাম চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। ১৯৭১ সালে এই রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। তখন তাঁর পদবি ছিল ল্যান্স নায়েক। প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর ভারতে যান। সেখানে পুনরায় সংগঠিত হয়ে জেড ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম শিলুয়া, উপজেলা সদর, ফেনী। বাবা আফজালুর রহমান, মা বদরের নেছা। স্ত্রী জরিনা আক্তার বেগম। তাঁদের এক ছেলে ও তিন মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৯৫। গেজেটে নাম সিরাজ।
মৃত্যু ১৯৯৭।

রাতের অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দল অবস্থান নিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের চারদিকে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলে আছেন সিরাজুল হক। সকাল থেকেই তাঁদের ওপর শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বোমাবর্ষণ। চলল সারা দিন বিরামহীনভাবে। তার পরও সিরাজুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা দমে গেলেন না। সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ মোকাবিলা করলেন। একপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ। ফলে অচিরেই ভেঙে পড়ল পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ। এ ঘটনা পরশুরামে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ৮-১১ নভেম্বর।

পরশুরাম ফেনী জেলার অন্তর্গত। এর অবস্থান বিলুনিয়া পকেটে। ফেনীর উত্তরে ভারত সীমান্তে বিলুনিয়া। উত্তর-দক্ষিণে এলাকাটি প্রায় ১৬ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ছয় মাইলজুড়ে বিস্তৃত। এর তিন দিকেই ভারত। ১৯৭১ সালে বিলুনিয়া পকেটের বিভিন্ন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধারা বিলুনিয়া পকেটে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের অবরোধ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ৯ নভেম্বর থেকে পাকিস্তানি সেনারা বোমাবর্ষণ শুরু করে। সারা দিন তাদের বোমাবর্ষণ অব্যাহত থাকে। দুপুরের পর পাকিস্তানি সেনারা শুরু করে সরাসরি আক্রমণ। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ সাহসের সঙ্গে প্রতিহত করেন। এ সময় পরশুরামে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সিরাজুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধারা বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা পরশুরাম থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

AMARBOI.COM

পরদিন ১০ নভেম্বর থেমে থেমে যুদ্ধ চলতে থাকে। রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরশুরাম ঘাঁটির ওপর মুক্তিযোদ্ধারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। এ আক্রমণে শত্রুপক্ষের বেশির ভাগ সদস্য নিহত হয়। বাকি সবাই আত্মসমর্পণ করে। সকাল হওয়ার পর সেখানে চারদিকজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে পাকিস্তানি সেনাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ধানখেত, বাংকার, খাল—কোথাও ফাঁকা নেই।

সিরাজুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। কর্মরত ছিলেন তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের মার্চে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে অংশ নেন। সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ করেন ২ নম্বর সেক্টরের রাজনগর সাবসেক্টরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম ওয়াহেদপুর, উপজেলা মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
বাবা সামসুল হক ভূঁইয়া, মা ঝিরাদন বিবি।
অবিবাহিত। খেতাবের সনদ নম্বর ১১১।
শহীদ ৪ আগস্ট ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট শেরপুর জেলার নকশী বিওপিতে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর একটি দলে ছিলেন সিরাজুল হক। আক্রমণকারী দলের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী (বীর বিক্রম, পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত)। তাঁর বয়ানে শোনা যাক সেদিনের কিছু ঘটনা।

'৩ আগস্ট রাতে (তখন ঘড়ির সময় অনুযায়ী ৪ আগস্ট) আমি দুই কোম্পানি যোদ্ধা নিয়ে নকশী বিওপি আক্রমণ করি। অ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে যোদ্ধারা অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এফইউপিতে (ফর্মিং আপ প্লেস) রওনা হয়। মাঝপথে নালা ক্রস করার সময় তারা কোনো শব্দ করেনি। এর আগে যোদ্ধাদের নিয়ে পানির মধ্যে বিনা শব্দে চলার প্র্যাকটিস করেছিলাম।

'তিনটা ৪৫ মিনিটে আমাদের আর্টিলারি গর্জে ওঠে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, যুদ্ধের আগেই এফইউপিতে নিজেদের আর্টিলারির কয়েকটি গোলা এসে পড়ে। একই সময়ে পাকিস্তানি আর্টিলারিও গর্জে ওঠে। এর মধ্যেই আমরা এক্সটেন্ডেড ফরমেশন তৈরি করি।

'একটু পর অ্যাসল্ট লাইন ফর্ম করে আমি চার্জ বলে হুংকার দেওয়ামাত্র মুক্তিযোদ্ধারা সঙ্গিন উঁচু করে 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাদের বেয়নেট চার্জের জন্য তারা রীতিমতো দৌড়াতে থাকে। আমাদের মনোবল দেখে পাকিস্তানি সেনারা তখন পলায়নরত।

'ঠিক তখনই শত্রুর আর্টিলারির শেলভো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়ে আমাদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমার ডান পায়েও একটা শেল লাগে। শত্রুর বাংকার তখন কয়েক গজ দূরে।

'দেখতে পেলাম, গুটি কতক অতি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা পলায়নরত শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের মারছে। কেউ কেউ মাইন ফিল্ডে ফেঁসে গিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।...'

সেদিন যুদ্ধে অবশ্য মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারেননি। সিরাজুল ইসলাম হাতাহাতি যুদ্ধের একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হন। বিদীর্ণ হয়ে যায় তাঁর শরীর। শহীদ হন তিনি। সহযোদ্ধারা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তাঁকে ভারতের মাটিতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সমাহিত করা হয়।

সিরাজুল হক চাকরি করতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তাঁর পদবি ছিল নায়েক। ১৯৭১ সালে এর অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরে। কয়েকজন সঙ্গীসহ তখন তিনি চট্টগ্রামের একটি জুট মিলের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাতে। প্রতিরোধযুদ্ধ শেষে ভারতে যান। ১ নম্বর সেক্টরের হরিণা ক্যাম্পে থাকাকালে তিনি মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ গোলাম মোস্তফা, বীর প্রতীক

গ্রাম গোলরা, ইউনিয়ন পাইকরা, উপজেলা কালিহাতী, টাঙ্গাইল। বাবা সৈয়দ ইউনুস আলী, মা সৈয়দা সেতারা খাতুন। স্ত্রী সুফিয়া খাতুন। তাঁদের চার মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪১৯। নিখোঁজ ১ জানুয়ারি ১৯৭৮।

টাঙ্গাইল জেলা সদরের উত্তরে কালিহাতী উপজেলা। এর দক্ষিণ প্রান্তে বল্লা। ১৯৭১ সালের ১৫-১৬ জুলাই এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিরাম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অংশ নেয় কয়েকটি দল। একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ গোলাম মোস্তফা।

১৫ জুলাই সকালে মুক্তিযোদ্ধারা বল্লায় পাকিস্তানি সেনাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করেন। তাঁদের সাঁড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একপর্যায়ে হতোদ্যম পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দুর্বিনীত সাহস ও অসীম মনোবল পাকিস্তানি সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সেদিন তিনি যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর সাহসিকতায় উজ্জীবিত হন সহযোদ্ধারা।

পরদিন ১৬ জুলাই। অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সেনাদের উদ্ধারে নতুন একদল পাকিস্তানি সেনা বল্লার দিকে অগ্রসর হয়। বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা নৌকাযোগে বল্লায় আসছিল। তখন সৈয়দ গোলাম মোস্তফা সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে যান পাকিস্তানি সেনাদের আসার পথে। তাঁরা চারান নামক স্থানে নতুন পাকিস্তানি সেনাদের অতর্কিতে আক্রমণ করেন। হতবিহ্বল পাকিস্তানি সেনারা নৌকার মধ্যে ছোটাছুটি শুরু করলে নৌকা ডুবে যায়। এতে সলিলসমাধি হয় কয়েকজন পাকিস্তানি সেনার। বাকি সেনারা তীরে উঠে বল্লার দিকে রওনা হয়। এদিকে বল্লায় অবরুদ্ধ সেনারা নতুন সেনাদের মুক্তিযোদ্ধা মনে করে বৃষ্টির মতো গুলি ও মর্টারের শেলিং শুরু করে। এতে নিজেদের হাতে তারা নিজেরাই হতাহত হয়।

এদিন সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। নতুন পাকিস্তানি সেনারা হতাহত কয়েকজনকে ফেলে পালিয়ে যায়। অবরুদ্ধ সেনারা অবরুদ্ধই থাকে। সন্ধ্যায় নতুন আরেক দল পাকিস্তানি সেনা বল্লার দিকে অগ্রসর হয়। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক আক্রমণের মধ্যেই অগ্রসর হয়ে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সেনাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দুই দিনের যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়। গ্রামবাসী হতাহত সেনাদের ট্রাকে করে নিয়ে যেতে দেখেছেন।

সৈয়দ গোলাম মোস্তফা টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করেন। তিনি একটি দলের দলনেতা ছিলেন।

স্বাধীনতার পর সৈয়দ গোলাম মোস্তফা জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। ডেপুটি লিডার ছিলেন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের পর রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করে এর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেননি। ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি কথিত গণবাহিনী (চরমপন্থী) তাঁকে অপহরণ করে। এর পর থেকে তিনি নিখোঁজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ, বীর প্রতীক

গ্রাম ফকিরাবাদ, সদর, হবিগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা আমেরিকা। বাবা সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মা সৈয়দা মাহমুদা খাতুন। স্ত্রী কাইসার নাহার আহমেদ। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ১১।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল না। পরে আহত ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবার জন্য মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে স্থাপন করা হয় অস্থায়ী হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র। প্রতিটি সেক্টরে ছিল একটি বা দুটি হাসপাতাল এবং সাবসেক্টরে ফিল্ড মেডিকেল ইউনিট।

৩ নম্বর সেক্টরে তখন দুটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি হোজামারাতে। এটি ছিল ৩০ শয্যার। আরেকটি আশ্রমবাড়িতে। সেটি ছিল ১০ শয্যার। চিকিৎসক হিসেবে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের একজন সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় প্রতিদিনই তাঁর কাছে পাঠানো হতো। কেউ গুলিবিদ্ধ, কেউ শেলের স্প্লিন্টারে আঘাতপ্রাপ্ত। সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমদের তাঁদের চিকিৎসাসেবা দিতেন। বেশির ভাগই বেঁচে যেতেন এবং সুস্থ হতেন। ওষুধ ও চিকিৎসা-সরঞ্জামের স্বল্পতা সত্ত্বেও কয়েকজন ছাড়া কেউ তখন মারা যাননি।

সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে চিকিৎসক হিসেবে চাকরি করতেন। কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেডিকেল অফিসার হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট। ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট সিলেটের খাদিমনগরে মোতায়েন ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ এবং ওই রেজিমেন্টের আরেকজন বাঙালি সেনাকর্মকর্তা পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হাতে বন্দী ও পরে আহত হন। রেজিমেন্টের একজন পাঠান সেনাকর্মকর্তা তাঁদের সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। তাঁর বদান্যতা এবং হাসপাতালের পরিচালক ডা. সামসুদ্দীন আহমদের তাৎক্ষণিক সুচিকিৎসায় তিনি বেঁচে যান। ৯ এপ্রিল হাসপাতাল থেকে তিনি বাড়ি যান। ওই দিনই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ডা. সামসুদ্দীনকে হত্যা করে।

সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ কিছুদিন পর ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে তাঁকে ৩ নম্বর সেক্টরের চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে এস ফোর্সের চিকিৎসক হিসেবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বয়ং বেশ কয়টি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দেন। দুই-তিনবার অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধেও অংশ নেন।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে চান্দুরায় সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ আহত হন। ৫-৬ ডিসেম্বর চান্দুরায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে আকস্মিক এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় তিনি এস ফোর্সের অধীন ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির সঙ্গে ছিলেন। তিনি ও রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর এ এস এম নাসিম (বীর বিক্রম, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও সেনাপ্রধান) ক্রসফায়ারে আহত হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক

গ্রাম উত্তর বুড়িশ্চর, উপজেলা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা বাসা ৩২৫, লেন ২২, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা। বাবা এস এম হাফেজ আহমেদ, মা শামসুন নাহার। স্ত্রী ফোরকান ইবরাহিম। তাঁদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ১৮।

নির্ধারিত সময়ে ভারত থেকে শুরু হয় দূরপাল্লার গোলাবর্ষণ। চারদিকের মাটি কেঁপে ওঠে। গোলাবর্ষণ শেষ হওয়া মাত্র সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম সহযোদ্ধাদের নিয়ে সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর। শুরু হয় মেশিনগান, রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি। দুই পক্ষে সমানতালে যুদ্ধ চলে।

একপর্যায়ে পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। এ রকম অবস্থায় দলনেতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইবরাহিম অত্যন্ত দক্ষতা এবং যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে নিজের জীবন বাজি রেখে সহযোদ্ধাদের মনে তিনি সাহস জুগিয়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সহযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহসের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁদের বীরত্বে থেমে যায় বেপরোয়া পাকিস্তানি সেনাদের অগ্রযাত্রা। যুদ্ধ চলতে থাকে।

এ ঘটনা আজমপুরের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আখাউড়া রেলজংশন ঘিরে যে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করেছিল তার উত্তর অংশ ছিল এই আজমপুর। ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট রেলপথে আখাউড়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। আখাউড়া সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই আজমপুর দখলের মাধ্যমেই শুরু হয় আখাউড়া দখলের যুদ্ধ। ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আজমপুর, সিংগারবিল, মুকুন্দপুর ও আখাউড়ায় তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৪ ডিসেম্বর ভোরে আখাউড়া মুক্ত হয়। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য দলসহ 'সি' কোম্পানির দলনেতা ইবরাহিমও সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই যুদ্ধে। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার ট্রেঞ্চে থাকা সেনাদের বধ বা অপসারণ করতে মুক্তিযোদ্ধারা ৩ ডিসেম্বর সারা দিন ও রাত কদমে কদমে অগ্রসর হন। ইবরাহিমের সাহসী নেতৃত্বে তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করেন।

ইবরাহিম ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। এর অবস্থান ছিল জয়দেবপুর রাজবাড়িতে।

প্রতিরোধযুদ্ধে সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তিনি হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এরপর ভারতে যান। সেখানে আবার সংগঠিত হওয়ার পর তিনি প্রথমে ৩ নম্বর সেক্টরের অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর এস ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চার্লি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তেলিয়াপাড়া, মাধবপুর, আখাউড়া, লালপুর ও ডেমরার যুদ্ধ তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সদরুজ্জামান, বীর প্রতীক

গ্রাম দুরমুজ, উপজেলা মেলান্দহ, জামালপুর।
বাবা সৈয়দ বদরুজ্জামান, মা সৈয়দা খোদেজা জামান।
স্ত্রী সৈয়দা সাহানা জামান। তাঁদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪০৭।

দিনের বেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ভারত থেকে এসে অবস্থান নিল বাংলাদেশের ভূখণ্ডে। তাদের নেতৃত্বে সৈয়দ সদরুজ্জামান। অদূরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থান। কিছুক্ষণ পর শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড যুদ্ধ। চলল প্রায় ১০ মিনিট। এ ঘটনা ঘটে উঠানিপাড়ায় ১৯৭১ সালের ৯ আগস্টে।

উঠানিপাড়া জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার উত্তর প্রান্তে ধানুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত। এই যুদ্ধের ঘটনা শোনা যাক তাঁর বয়ানে। '...বিএসএফের ক্যাপ্টেন ন্যাগি আমাকে বলল, কামালপুর ক্যাম্পে পাকিস্তানি কম আছে। আজ সেখানে আক্রমণ করা হবে। আমাকে বলা হলো বকশীগঞ্জের দিকে যেতে। সেদিক হয়ে যেন কোনো পাকিস্তানি না আসতে পারে। আমরা ৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধা উঠানিপাড়ায় অ্যামবুশ করি।

'আমাদের বলা হয়েছিল, সন্ধ্যার মধ্যে কামালপুর দখল করে সিগন্যাল দেওয়া হবে। সিগন্যাল পেলে আমরা যেন অবস্থান ছেড়ে চলে আসি। তিনটার দিকে কামালপুর সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, আমরা অপেক্ষায় আছি। সন্ধ্যায় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো।

'রাতে পোস্ট অফিসের কাছে শব্দ শুনে আমার সেন্ট্রি সামছু বলে উঠল, কে যায়? আমার সহ-দলনেতা লতা ওদের হ্যান্ডস আপ করাল। জিজ্ঞাসাবাদ ও ভয় দেখানোর পর জানা গেল, ওরা রাজাকার। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, পাকিস্তানি সেনারা আমাদের দিকে আসছে। সেনা কত জন, তা ওরা বলতে পারল না। আমরা দ্রুত পরিকল্পনা করে পজিশন নিলাম।

'অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। একসময় মনে হলো দলবেঁধে অনেকে হেঁটে আসছে। ১০০ জনের বেশি হবে। কলাম করে হেঁটে আসছে। এক কোম্পানি হয়তো। পাকিস্তানি সেনারা যেই কাছাকাছি এল, দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আমরা অবিরত গুলি করছি। ১০ মিনিটের বেশি সময় সম্মুখযুদ্ধ করে আমরা পিছে ফিরতে শুরু করি। তখন পর্যন্ত সিগন্যাল পাইনি। বুঝতে পারি, কামালপুর আক্রমণ করা সম্ভব হয়নি। কামালপুরে মোট ১৮ বার আক্রমণ করা হয়। আমি ১৪ বার আক্রমণে ছিলাম। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৭ জন হতাহত হয়। আমাদের পক্ষে কেউ আহত বা শহীদ হননি।'

সৈয়দ সদরুজ্জামান ১৯৭১ সালে কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯। মা-বাবার অনুমতি নিয়েই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নম্বর সেক্টরের মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরের একটি কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কামালপুরসহ আরও কয়েক স্থানের যুদ্ধে সাহসের সঙ্গে অংশ নেন। তিনি ও তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজারীলাল তরফদার, বীর প্রতীক

গ্রাম রানীয়ালী, ইউনিয়ন পাশাপোল, উপজেলা চৌগাছা, যশোর। বর্তমান ঠিকানা কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ঝিকরগাছা, যশোর। বাবা রসিকলাল তরফদার, মা শৈলবালা তরফদার। স্ত্রী শেফালী রানী তরফদার ও সুমিত্রা রানী তরফদার। তাঁদের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৩৭৭।

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম দোসতিনা। ঝিকরগাছা-দোসতিনা সড়কটি যশোর জেলার পশ্চিমাংশে যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সড়কে নিয়োজিত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদল। তারা এ অঞ্চলে নিয়মিত ঘুরেফিরে টহল দিত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি লক্ষ রাখত।

জুলাই মাস থেকে যশোর অঞ্চলের প্রশিক্ষণ পাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে আসতে থাকলেন ৮ নম্বর সেক্টরে। কয়েকটি দল পাঠানো হলো বয়রা সাবসেক্টরে। কিন্তু তাঁরা বাংলাদেশে ঢুকতে পারছেন না পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলের কারণে। তাই তাদের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত হলো।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে একদিন। হাজারীলাল তরফদারসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা অ্যামবুশ করলেন দোসতিনায়। সুবিধাজনক এক স্থানে তাঁরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে থাকলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদল তাঁদের ফাঁদের মধ্যে উপস্থিত হতেই গর্জে উঠল হাজারীলালসহ সবার অস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে তাৎক্ষণিক হতাহত হলো কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তবে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে তারাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তখন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। হাজারীলাল তরফদার সেদিন যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব দেখান। সেদিন যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর টহলদলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছয়জন নিহত ও দুজন আহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

১৯৬৯ সালে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর আর পড়ালেখার সুযোগ হয়নি হাজারীলাল তরফদারের। এরপর তিনি বাড়িতে নানা সাংসারিক কাজে জড়িত ছিলেন। কৃষিকাজও করতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নেন। পরে ভারতের চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেন ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাবসেক্টরে।

হাজারীলাল তরফদার বয়রা সাবসেক্টরে দুর্ধর্ষ ও সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। অনেক সম্মুখ ও গেরিলাযুদ্ধে তিনি অংশ নেন। এর মধ্যে চৌগাছা, নাভারন, ছুটিপুর, গোয়ালহাটি, গদখালী, কাগজপুকুর ও বেনাপোলের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক

গ্রাম পিরুলী, উপজেলা কালিয়া, নড়াইল। বর্তমান ঠিকানা ১/৩ দিলু রোড, ইস্কাটন, ঢাকা। বাবা (প্রকৌশলী) হাফিজুল আলম, মা ফাতেমা বেগম। স্ত্রী তৌহিদা আলম। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।
খেতাবের সনদ নম্বর ৩১৫।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক প্লাটুনের অকুতোভয় ও দুর্ধর্ষ সদস্যরা ঢাকায় একের পর এক অপারেশন করেন। এসব অপারেশনে তখন পাকিস্তান সরকারের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। এই ক্র্যাক প্লাটুনের একজন সদস্য ছিলেন হাবিবুল আলম। তিনি ঢাকায় বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন।

হাবিবুল আলমের নিজ বয়ানে একটি অপারেশনের আংশিক বর্ণনা :

'আমরা প্ল্যান করলাম একটা সিরিয়াস টাইপের অ্যাকশনের। সিদ্ধান্ত হলো ২০ নম্বর রোডে (ধানমন্ডি) চায়নিজ অ্যাম্বাসি এবং ১৮ নম্বর রোডে জাস্টিস আবদুল জব্বার খানের বাসার সামনে অপারেশন করার। সেখানে পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ প্রহরায় থাকত।

'কাজী (কাজী কামালউদ্দিন বীর বিক্রম), বদি (বদিউল আলম বীর বিক্রম), জুয়েল (শহীদ আবদুল হালিম জুয়েল বীর বিক্রম), রুমি (শহীদ শাফী ইমাম রুমী বীর বিক্রম), স্বপন (কামরুল হক বীর বিক্রম) ও আমাকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হলো। এবার আমাদের টার্গেট ছিল "অ্যাটাক অন দ্য মুভ"। বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন। আগেই রেকি করা হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য গাড়ি প্রয়োজন। সংগ্রহের ভার পড়ল আমার ও বদির ওপর।

'মাজদা রাইটহ্যান্ড গাড়ি। ঠিক হলো আমি স্টিয়ারিং হুইলটা ধরব। আমার অস্ত্র যাবে বদির কাছে। এ অপারেশনে শেষ পর্যন্ত জুয়েলকে নেওয়া হয়নি তাঁর হাতের জখমের কারণে। আমরা গাড়ি নিয়ে ২০ নম্বর সড়কে গিয়ে আশ্চর্য হলাম। দেখি, নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে পাকিস্তানি সেনা-পুলিশ নেই। গাড়ি টার্ন করে ১৮ নম্বরে ঢুকে পশ্চিম দিকে এগোতে থাকলাম।

'দেখলাম, জাস্টিস জব্বার খানের বাড়ির সামনে আটজন পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ বসে আড্ডা মারছে। কেউ কেউ সিগারেট ফুঁকছে। আমি সাতমসজিদ রোডের সামনে থেকে গাড়ি ঘুরালাম। কাজী ও বদিকে বলা হলো ফায়ার করতে। রুমী ও স্বপনকে বলা হলো আমাদের লক্ষ্য করে কেউ গুলি করে কি না, তা খেয়াল রাখতে।

'ইট ওয়াজ হার্ডলি টু-থ্রি সেকেন্ড। একটা ব্রাশ মানে দুই থেকে তিন সেকেন্ড, ১০ রাউন্ড গুলি বেরিয়ে যাওয়া। দুই লেবেলে গেল। কাজীরটা বুক বরাবর, আর বদিরটা পেট বরাবর। আমি খুব আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। আটজনই পড়ে গেল। সহজেই কাজ শেষ হওয়ায় আমরা আনন্দিত হলাম।'

হাবিবুল আলমরা এ অপারেশন করেন ২৫ আগস্ট।

হাবিবুল আলম ১৯৭১ সালে শিক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে ভারতে যান। ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামিদুল হক, বীর প্রতীক

গ্রাম কচুয়া, উপজেলা সখীপুর, টাঙ্গাইল। বর্তমান ঠিকানা ৭ নম্বর ওয়ার্ড, সখীপুর, টাঙ্গাইল। বাবা হাবিল উদ্দিন, মা কছিরন নেসা। স্ত্রী রোমেচা বেগম। তাঁদের চার মেয়ে ও এক ছেলে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪২২।

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার একটি গ্রাম বল্লা। ১৯৭১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় সেখানে কয়েক দিন ধরে অবস্থান করছেন হামিদুল হকসহ একদল মুক্তিযোদ্ধা। সকাল আটটার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেলেন ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল পাকিস্তানি সেনা কালিহাতী থেকে এগিয়ে আসছে বল্লার দিকে। যে পথে আসছে, সে পথে আছে নদী।

হামিদুল হকসহ মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিলেন নদী তীরে আড়ালে। নদীর ওপাড় থেকে তাঁদের দেখা যায় না। মুক্তিযোদ্ধারা বসে আছেন টানটান উত্তেজনা নিয়ে। সবার চোখ নদীর ওপাড়ে। একটু পর সেখানে হাজির হলো পাকিস্তানি সেনারা।

মুক্তিযোদ্ধারা সবাই নিশ্চুপ। পাকিস্তানি সেনারা কোথাও কোনো বাধা পায়নি। ঘাটে তারা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে নৌকায় উঠল। তারপর নৌকা চলতে শুরু করল। সেনারা সবাই নৌকায় নিশ্চিত মনে দাঁড়িয়ে। তারা বুঝতেও পারল না নদীর এপাড়ে তাদের জন্য কী ঘটনা অপেক্ষা করছে।

AMARBOI.COM

নৌকা নদীর এপাড়ে আসামাত্র গর্জে উঠল মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজনের অস্ত্র। সবাই গুলি করলেন না। তাঁদের ওপর নির্দেশ, এমনভাবে গুলি করতে হবে যাতে সব নিশানাই সঠিক হয়। এলোপাতাড়ি গুলি করে গুলির অপচয় করা যাবে না। কারণ তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব প্রকট।

আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই সেনাদের ছোটাছুটিতে ডুবে গেল দুটি নৌকা। ঝাঁপাঝাঁপি করে পানি থেকে উঠে তারা অবস্থান নিল বিভিন্ন স্থানে। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের গুলিতে নিহত হয়েছে চারজন পাকিস্তানি সেনা। কয়েকজন নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

একটু পর শুরু হলো পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও প্রশিক্ষিত। অন্যদিকে হামিদুল হক ও তাঁর বেশির ভাগ সঙ্গী মাত্র কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণ বেশ বেপরোয়া ধরনের। এতে মুক্তিযোদ্ধারা বিচলিত হলেন না। স্বল্প প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সম্বল করেই সাহসের সঙ্গে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন।

হামিদুল হক ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বীরত্বে পাকিস্তানি সেনারা ভড়কে গেল। অবস্থা বেগতিক বুঝে তারা পিছু হটতে শুরু করল। পিছু হটার আগে তারা চেষ্টা করল নিহত সহযোদ্ধাদের লাশ উদ্ধারে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের ত্বরিত তৎপরতায় তাদের সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো। পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধের পর তারা পালিয়ে গেল।

হামিদুল হক ১৯৭১ সালে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইলে গঠিত কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়ে বল্লাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় যুদ্ধ করেন তিনি। পাশাপাশি কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক বিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিছ মিয়া, বীর প্রতীক

গ্রাম বসন্তপুর, ইউনিয়ন গোপালপুর, উপজেলা বদরগঞ্জ, রংপুর। বাবা আহম্মদ হোসেন, মা মফিজুননেছা। স্ত্রী খাদিজা বেগম। তাঁদের পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। খেতাবের সনদ নম্বর ৪৪। মৃত্যু মে ২০০৮।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রথমে যুদ্ধ করেন দিনাজপুর এলাকায়। পরে জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধ করেন জামালপুরের বাহাদুরাবাদ, সিলেটের গোয়াইনঘাট, রাধানগর ও ছাতকসহ আরও কয়েকটি জায়গায়। তিনি ছিলেন নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর।

মুক্তিযুদ্ধকালে এই রেজিমেন্টের ডেলটা কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) এম আই এম নূরুন্নবী খান (বীর বিক্রম; ১৯৭১ সালে লেফটেন্যান্ট)। বাহাদুরাবাদ, রাধানগর, গোয়াইনঘাট ও ছাতক যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা বইয়ে তিনি লিখেছেন :

'২৮ নভেম্বর ১৯৭১। ভোর চারটা বাজতে আরও পাঁচ মিনিট বাকি। আমরা সবাই এক সারিতে হেঁটে হেঁটে অ্যাসল্ট লাইনে পৌঁছে গেলাম। চারদিক তখনো ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ২০-৩০ ফুট দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সব সহযোদ্ধাকে এক্সটেনডেড ফরমেশনে দাঁড় করালাম।

'সবাই দ্রুতবেগে সামনে এগোতে লাগল। প্রতিটি সৈনিকের অস্ত্রগুলো থেকে শত শত গুলি সামনের দিকে ছুটতে লাগল। একই সময় ঘোরা ও দুয়ারিখেল গ্রামের উত্তর প্রান্তের অবস্থান থেকে আমাদের দুটি মেশিনগান ও দুটি আরআর গুলি ছুড়তে লাগল শত্রুর ছোটখেল অবস্থানের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তের দিকে তাক করে। সব মিলিয়ে এক প্রলয়ংকরী অবস্থার সৃষ্টি হলো।

'ভোরের আলো তখন ফুটে উঠেছে মাত্র। আমাদের অতর্কিত হামলায় পাকিস্তানিরা বাংকার ছেড়ে যে যেখানে এবং যেদিকে সম্ভব দৌড়ে পালাতে থাকল। খড়স্তূপের আগুনে চারদিক তখন আলোকিত হয়ে উঠছে।

'আমাদের যোদ্ধারা অপ্রত্যাশিত বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা। তারা বাংকার টু বাংকার ফাইট করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। কোনো কোনো অবস্থানে বেয়নেট চার্জ করে শত্রুর মোকাবিলা করতে হলো। চারদিকে তখন যেন রক্তের বন্যা। পাকিস্তানিরা তাদের পরনের উর্দি পর্যন্ত ফেলে পালাল। উর্দি পরার সুযোগও পেল না। আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক এ সময় এক অশরীরী শক্তির অধিকারী হয়ে এক একটি ব্যাঘ্রের রূপ ধারণ করে পাকিস্তানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।'

হারিছ মিয়া রাধানগর এবং অন্যান্য যুদ্ধে যে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন, সে কথার উল্লেখ আছে ওই বইয়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তাঁর রেজিমেন্টের অধিনায়ক ও উপ-অধিনায়ক দুজনই ছিল অবাঙালি। মার্চ মাসে সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসনের কথা বলে তাঁদের চারটি কোম্পানিই সেনানিবাসের বাইরে পাঠানো হয়। সেনানিবাসে ছিল হেডকোয়ার্টার্স কোম্পানি এবং রিয়ার পার্টি। ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর হারিছ মিয়া ছিলেন সেনানিবাসে। ৩০ মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। সেনানিবাসে অবস্থানরত বাঙালি সেনারা তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রতিরোধযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, বীর প্রতীক

গ্রাম লক্ষ্মীপুর, উপজেলা নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।
বাবা শফিকুর রহমান চৌধুরী, মা জাহানারা বেগম।
স্ত্রী পারভীন কবীর। তাঁদের দুই ছেলে।
খেতাবের সনদ নম্বর ২২।
গেজেটে নাম মোহা. হুমায়ুন কবীর চৌধুরী

মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবীর চৌধুরী বর্তমানে কানাডায় বসবাস করেন। ১৯৭১ সালে তিনি যুদ্ধ করেন দুই নম্বর সেক্টরে। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেখানে তিনি বলেন :

'১৭ মে আমাকে অপারেশনে পাঠানো হয়। তখন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল হঠাৎ করে আক্রমণ করো এবং সরে এসো। আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে এক দলকে রক্ষণভাগে রাখি। দ্বিতীয় দল মর্টারের সাহায্যে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়।

'আমি ছিলাম মর্টার শেলিংয়ে। শেলিং করে আমরা চলে আসি। আসার সময় পাকিস্তানি সেনারা গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আমাদের ওপর প্রচণ্ড গোলাগুলি করে। আমরা সবাই নিরাপদে ফিরে আসি। পরে খবর পেয়েছিলাম, ওদের (পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) ১৫ জনের মতো নিহত হয়েছে।

'এটাই ছিল আমার প্রথম অপারেশন। ক্যাম্পে আমাদের সব মুক্তিযোদ্ধা দেখি শত্রু খতম বা আক্রমণের এক নেশার মধ্যে আছে। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম বা কাপড়চোপড়ের অভাব তাদের ছিল, কিন্তু সেদিকে কারও খেয়াল ছিল না। শত্রুর খোঁজ পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করার আনন্দে মেতে উঠত। দেশপ্রেম এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে মৃত্যুভয়ও তাদের টলাতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে আমাকেও এই নেশায় পেয়ে বসল।

'কসবা হচ্ছে এমন একটি স্থান, যার ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। কসবা রেলস্টেশন থেকে ভারতীয় সীমান্ত দেখা যায়। সীমান্তের পাশ দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়। মে মাসের ২২/২৩ তারিখে খবর পেলাম, পাকিস্তানি সেনারা দুটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র মন্দভাগ রেলস্টেশন থেকে সালদা নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রেলট্রলির দুই পাশ দিয়ে এক প্লাটুন পাকিস্তানি সেনা টহল দিতে দিতে হেঁটে যাচ্ছে।

'ট্রলি দুটি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দিল। আমরা এসএমজি, এলএমজির সাহায্যে শত্রুর ওপর অতর্কিতে গুলি ছুড়তে লাগলাম। কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। বাকি পাকিস্তানি সেনারা ট্রলির ওপাশে পজিশন নিয়ে আমাদের ওপর গুলি ছুড়তে থাকল। আমরা রকেট লঞ্চারের সাহায্যে ট্রলির ওপর আঘাত হানলাম। ট্রলির অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

'তারপর পাকিস্তানি সেনারা আর্টিলারির সাহায্যে আমাদের ওপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করে তাদের আহত জওয়ানদের নিয়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যাওয়ার পর আমি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। দেখি ভাঙাচোরা অনেক অস্ত্র পড়ে আছে। এর মধ্যে কিছু ভালো অস্ত্র ছিল। এ এক দুঃসাহসিক অভিযান ছিল, যা আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

যাঁদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি বা চিহ্নিত করা যায়নি

বীর বিক্রম

আনসার আলী (শহীদ), সৈনিক নং এম/৫০২৫১
আবদুল আজিম, সৈনিক নং ৫২২০
আবদুল মতলেব, সৈনিক নং ১৭৬৬০
আবদুল সামাদ (শহীদ), গণবাহিনী, সেক্টর ৬, পরে ১৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত
আবদুস সালাম (শহীদ), গণবাহিনী, সেক্টর ২
জামাল উদ্দিন (শহীদ), সৈনিক নং ৬৮০৫০১৬
মফিজ উদ্দিন (শহীদ), ল্যান্স নায়েক, সৈনিক নং ১২০২৩
মাহমুদ হোসেন (শহীদ), পিতা ইয়াকুব আলী, গণবাহিনী, সেক্টর ৪
মোহাম্মদ মহসীন, সৈনিক নং ২২৪২
সিরাজ মিয়া (শহীদ), সৈনিক নং ৮০৬৬

বীর প্রতীক

আবদুল আউয়াল, হাবিলদার, সৈনিক নং ৫৬৬৭
আবদুল কুদ্দুস গাজী (শহীদ), মুজাহিদ সদস্য, পিতা আমির গাজী, ২ নং সেক্টর
আবদুল জব্বার, সুবেদার, বিজেও নং ১৯৯৬
আবদুল মান্নান, সৈনিক নং ৬৫০৫৭
আবদুল মান্নান খান, নায়েক, সৈনিক নং ৪১০২৩২
আবদুল হাই (শহীদ), ল্যান্স নায়েক, ২ ইস্ট বেঙ্গল
আসাদ মিয়া, সৈনিক, ৮ ইস্ট বেঙ্গল
আহসান উল্লাহ, নায়েব সুবেদার, বিজেও নং ১২৫৪৯৯৬
ইউসুফ আলী, ল্যান্স নায়েক, ১ ইস্ট বেঙ্গল, সৈনিক নং ৩৯৩৮৩০৯
ইদ্রিস, গণবাহিনী, ৭ নং সেক্টর
ইলিয়াসুর রহমান, সৈনিক নং ২৬৬৫৩
এ বি এম ফসিউল আলম, সৈনিক নং ৩৯৩৪৭২৪
এম এ মতিন চৌধুরী, সুবেদার, ৪ নং সেক্টর
এস এ সিদ্দিকী, নায়েব সুবেদার, বিজেও নং ১০২০৯
কামালউদ্দিন, সৈনিক, ৪ নং সেক্টর
কাসেম আলী হাওলাদার, হাবিলদার, সৈনিক নং ২৬৪৬
জুলফু মিয়া, মুজাহিদ সদস্য, ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
তরিকুল ইসলাম, সৈনিক নং ৫০৯৮, ১ ইস্ট বেঙ্গল
দেবদাস বিশ্বাস (খোকন), ১৯৭৩ সালে ঠিকানা ঝালকাঠি অগ্রণী ব্যাংক, ঝালকাঠি, গণবাহিনী, সেক্টর ৯
নাজিমউদ্দিন (শহীদ), পুলিশ কনস্টেবল
নাসির উদ্দিন (শহীদ), পিতা আজহারউদ্দিন, গণবাহিনী, সেক্টর ৮, মুক্তিযোদ্ধা নং ৩৮০০
বদিউর রহমান, সুবেদার, বিজেও নং ১৫৯০
ময়েজুল ইসলাম, গণবাহিনী, সেক্টর ৪, মুক্তিযোদ্ধা নং ৫৩৪৭
মুসলিম উদ্দিন, নায়েব সুবেদার, এসি, ৮ ইস্ট বেঙ্গল
মো. আশরাফ, গণবাহিনী, সেক্টর ৩
মো. নূরুল হক, পিতা আকতার হোসেন, গণবাহিনী, সেক্টর ১১
মোহাম্মদ ইসমাইল (শহীদ), সৈনিক নং ৩৯৩৭৯৬৭
মোহাম্মদ মালন খান, সৈনিক নং ১২১৪৮
মোহাম্মদ শাহজাহান, সৈনিক নং ১৬৯৭
রফিকউদ্দিন (শহীদ), পিতা তাজান শেখ, গণবাহিনী, সেক্টর ৪
শফি উদ্দিন, সৈনিক নং ৫২৪০, ১ ইস্ট বেঙ্গল
শফিকুল ইসলাম, হাবিলদার, সৈনিক নং ৩৯৩২৫৬২
সাজ্জিদুর রহমান, সৈনিক নং ২৬৬৫১
সিরাজুল ইসলাম (শহীদ), মুজাহিদ সদস্য, পিতা জামাল খান, ২ নং সেক্টর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকেতের ব্যাখ্যা

ইপিআর—ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)। বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

ইপিকাপ—ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স (EPCAF)। এ বাহিনীকে ইপিসিএএফ বলেও অভিহিত করা হতো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকার এ বাহিনী গঠন করে।

একেএফ—আজাদ কাশ্মীর ফোর্স। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন।

এফইউপি—ফর্মি আপ প্লেস। আক্রমণ শুরু করার আগে যে স্থানে যোদ্ধারা সমবেত হন।

এফএফ—ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন।

ওপি—অবজারভেশন পোস্ট বা পাহারা চৌকি।

বিওপি—বর্ডার আউট পোস্ট বা সীমান্ত চৌকি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এইচ আওয়ার—চূড়ান্ত আক্রমণের সময়।

এস ফোর্স—নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। দ্বিতীয় ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল এস ফোর্সের অধীনে।

কাদেরিয়া বাহিনী—আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম ও আনোয়ারুল আলম শহীদ যৌথভাবে টাঙ্গাইল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। এটিই কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত।

কিলো ফ্লাইট—মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর একটি বিমান উইং গঠন করা হয়। এর সাংকেতিক নাম ছিল কিলো ফ্লাইট।

কিলো ফোর্স—কে ফোর্সের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ আহত হওয়ায় এর কাঠামোতে পরিবর্তন এনে কিলো ফোর্স নামে নতুন একটি বাহিনী গঠন করা হয়।

কে ফোর্স—নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। কে ফোর্সের অধীনে ছিল চতুর্থ, নবম ও দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

জেড ফোর্স—নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। জেড ফোর্সের অধীনে ছিল নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

টসি ব্যাটালিয়ন—মুজাহিদ বাহিনীর অনুরূপ আধা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী।

ডিফেন্স—প্রতিরক্ষা অবস্থান।

তোচি স্কাউটস ও থাল স্কাউটস—পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আধা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুটো আলাদা দল। মুক্তিযুদ্ধকালে এ দুই বাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আনা হয়।

প্রিএইচ আওয়ার—চূড়ান্ত আক্রমণের আগের সময়।

মুজাহিদ বাহিনী—১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান সরকার এই অনিয়মিত বাহিনী গঠন করে। এ বাহিনী বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার যুবকদের নিয়ে গঠিত হয়। আধা সামরিক বাহিনীর মতো প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনা ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুজাহিদ বাহিনীর দলনেতাদের অনারারি ক্যাপ্টেন বলা হতো।

মুজিব ব্যাটারি—মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দল। এটি ছিল কে ফোর্সের অধীনে।

রওশন আরা ব্যাটারি—মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দল। এটি ছিল জেড ফোর্সের অধীনে।

লিসনিং পোস্ট—রণাঙ্গনে মূল ঘাঁটির অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র।

সেক্টর—মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুদ্ধ-তৎপরতা চালানোর সুবিধার্থে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সারা দেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে। এ রকম প্রতিটি অঞ্চলকে সেক্টর বলা হতো। প্রতিটি সেক্টরের অধীনে সাবসেক্টর, নিয়মিত সেনা ও গেরিলাযোদ্ধা এবং সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

১. *অপারেশন গোয়াইনঘাট*, লে. কর্নেল (অব.) এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম

২. *অপারেশন রাধানগর*, লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম

৩. *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*, অপরাজেয় সংঘ

৪. *১৯৭১, উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়*, আখতারুজ্জামান মণ্ডল

৫. *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম

৬. *একাত্তরের যুদ্ধে বিমানবাহিনী*, শ জামান

৭. *গাজীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, বিলু কবীর

৮. *গেরিলা থেকে সম্মুখযুদ্ধে*, মাহবুব আলম

৯. *চাঁদপুরে নৌমুক্তিযুদ্ধ*, সালমা আহমেদ

১০. *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

১১. *নরসিংদী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন

১২. *পতাকার প্রতি প্রণোদনা*, মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া

১৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, নবম ও দশম খণ্ড

১৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ব্রিগেডভিত্তিক ইতিহাস*

১৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, সেক্টর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১

১৬. *বীরত্বগাথা, জ্বলে একাত্তরের অগ্নিশিখা*, এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম

১৭. *মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টর, বানিয়াডাঙ্গা যুদ্ধ*, কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক

১৮. *মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস*, মেজর সুবিদ আলী ভূঁইয়া

১৯. *মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান*, কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান

২০. *মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডো*, মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক

২১. *মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর বাঘা সিদ্দিকী*, সুনীল কুমার গুহ (প্রকাশকাল ১৯৭৩, টাঙ্গাইল)

২২. *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম

২৩. *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, সুকুমার বিশ্বাস

২৪. *শহীদ শাফী ইমাম রুমী স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা ২০১০, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর

২৫. *স্বাধীনতাযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা*, মো. আবদুল হান্নান

২৬. *স্বাধীনতা সংগ্রাম ঢাকায় গেরিলা অপারেশন*, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ

পত্রিকা

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ ২০১১।

পোস্টার

নিতুন কুন্ডু, 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' (১৯৭১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন তৈরি ও ছবি দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন

১. নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা
প্রথম আলো
আব্বাস সিকদার, ঝালকাঠি
আজহারুল হক, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)
আবদুর রাজ্জাক, পটিয়া (চট্টগ্রাম)
আবু তাহের, ফেনী
আরিফুল হক, রংপুর
ইকবাল গফুর, সখীপুর (টাঙ্গাইল)
উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট
এ কে এম ফয়সাল, মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর)
এম এ কুদ্দুস, চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা)
এম কে মানিক, ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর)
এম মনিরুল ইসলাম, বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
এস এম আব্বাছ উদ্দিন, ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম)
কামনাশীষ শেখর, টাঙ্গাইল
কামরান পারভেজ, ময়মনসিংহ
কার্তিক দাস, নড়াইল
গাজীউল হক, কুমিল্লা
গৌরাঙ্গ দেবনাথ, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
দুলাল ঘোষ, আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
নেয়ামতউল্যাহ, ভোলা
পান্না বালা, ফরিদপুর
ফখরুল ইসলাম, নোয়াখালী
মনিরুজ্জামান, নরসিংদী
মনিরুল আলম, যশোর
মহিউদ্দিন আহমেদ, গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ)
মিজানুর রহমান, কুড়িগ্রাম
মিলন রহমান, বগুড়া
মো. গোলাম মোস্তফা, পূর্বধলা (নেত্রকোনা)
মো. বদর উদ্দিন, সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
মো. সোহরাব হোসেন, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
মোস্তফা মনজু, জামালপুর
রমেশ কুমার, নান্দাইল (ময়মনসিংহ)
শহীদুল ইসলাম, পঞ্চগড়
শারফুদ্দীন কাশ্মীর, মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
শাহাবুল শাহীন, গাইবান্ধা
শেখ কামাল, কেন্দুয়া (নেত্রকোনা)
সত্যজিৎ ঘোষ, শরীয়তপুর
সফি খান, কুড়িগ্রাম
সাইফুর রহমান, বরিশাল
সাইফুল হক মোল্লা, কিশোরগঞ্জ
সুব্রত সাহা, গোপালগঞ্জ
সুমন কুমার দাশ, সিলেট
সৈকত দেওয়ান, খাগড়াছড়ি

২. সদস্য : মুক্ত আসর, ঢাকা
আ ফ ম মাসউদ
আবু সাঈদ

৩. যাঁরা ছবি দিয়েছেন
আনিস মাহমুদ
এহসান মিথুন
ওমর ফারুক
মঈনুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
রাশেদ মাহমুদ
স্বর্ণময়ী সরকার

৪. সাক্ষাৎকার ও লিখিত বয়ান
আকরাম আহমেদ বীর উত্তম
আতাহার আলী খান বীর প্রতীক
আনিসুর রহমান বীর প্রতীক
আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীর প্রতীক
আবদুল কুদ্দুস বীর প্রতীক
আবদুল খালেক বীর বিক্রম
আবদুল বাতেন খান বীর প্রতীক
আবদুল মান্নান বীর প্রতীক
আবদুল মালিক বীর প্রতীক
আবদুল হক বীর বিক্রম
আবু মুসলিম বীর প্রতীক
আবুল হাশেম বীর প্রতীক
আলমগীর সাত্তার বীর প্রতীক
আলী আশরাফ বীর প্রতীক
ইমাম-উজ-জামান বীর প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক
কাজী আকমল আলী বীর প্রতীক
কে এম আবু বাকের বীর প্রতীক
গোলাম মোস্তফা খান বীর বিক্রম
জামাল কবির বীর প্রতীক
জামিলউদ্দীন আহসান বীর প্রতীক
তারামন বিবি বীর প্রতীক
দেলোয়ার হোসেন বীর প্রতীক
নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক
নূরউদ্দীন আহমেদ বীর প্রতীক
মমতাজ হাসান বীর প্রতীক
মাহবুবুর রব সাদী বীর প্রতীক
মু শামসুল আলম বীর প্রতীক
মো. এজাজুল হক খান বীর প্রতীক
মো. নুরুল আমিন বীর উত্তম
মো. বিলাল উদ্দিন বীর প্রতীক
মো. শাহজাহান কবির বীর প্রতীক
মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী বীর বিক্রম
মোবারক হোসেন বীর প্রতীক
মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বীর প্রতীক
মোহাম্মেদ দিদারুল আলম বীর প্রতীক
শাহজামান মজুমদার বীর প্রতীক
সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ বীর প্রতীক
সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক
সৈয়দ সদরুজ্জামান বীর প্রতীক
হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ বীর বিক্রম
হাবিবুল আলম বীর প্রতীক
হুমায়ুন কবীর চৌধুরী বীর প্রতীক

৫. অন্যান্য

আনোয়ার হোসেন
আবদুর রশিদ
আবদুল আউয়াল (শহীদ আবদুস সাত্তার বীর বিক্রমের ভাই)
আবদুল মান্নান, সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষক, কুমিল্লা জিলা স্কুল (শহীদ আবদুল মমিন বীর প্রতীকের ভাই)
আবদুল রাজ্জাক পাটোয়ারী (আবদুল জব্বার পাটোয়ারী বীর বিক্রমের ছেলে)
আবদুল্লাহ সেলিম (মো. নূরুল হক বীর প্রতীকের ছেলে)
আমজাদ হোসেন (আবদুল মালেক বীর প্রতীকের ছেলে)
আমিনুল ইসলাম
আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অব.) বীর বিক্রম
আরিফুর রহমান (আবু তাহের বীর প্রতীকের ছেলে)
আহমদ তাজুল ইসলাম (এ কে এম আতিকুল ইসলাম বীর প্রতীকের বড় ভাই)
ইফতেখার হোসেন, মেজর (আবদুল মজিদ বীর প্রতীকের ছেলে)
ইমরান আহমেদ খান (মনির আহমেদ খান বীর প্রতীকের ছেলে)
ওয়াকার হাসান, মেজর (অব.) বীর প্রতীক
কর্নেল (অব.) আনোয়ার-উল আলম শহীদ
কাজী মনির উদ্দিন (শহীদ আবদুল কাদের বীর প্রতীকের ভাই)
কোহিনুর বেগম
খুরশিদ আহমেদ (গিয়াসউদ্দিন বীর প্রতীকের ছেলে)
খোন্দকার হাবিবুর রহমান
গুলশান আরা (শহীদ নিজামউদ্দীন বীর বিক্রমের বোন)
চিনিরন নেছা (আবদুল আলিম বীর প্রতীকের মা)
জাহিদ রহমান, প্রধান নির্বাহী, মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা গবেষণাকেন্দ্র
জেসমিন চৌধুরী
তাছলিমা বেগম (তোফায়েল আহমেদ বীর প্রতীকের মেয়ে)
তাসলিমা বেগম
দেল আফরোজ
দেলোয়ার হোসেন (শহীদ আলী আশরাফ বীর বিক্রমের ভাই)
নজরুল ইসলাম
নূরজাহান দেলাওয়ার
নূরুল ইসলাম তালুকদার
পূরবী মতিন (মো. আবদুল মতিন বীর প্রতীকের মেয়ে)
ফাহাদ মোস্তফা (গোলাম মোস্তফা বীর প্রতীকের ছেলে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনির আহমেদ পাটোয়ারি, বিচারক (মমিনুল হক ভূঁইয়া বীর প্রতীকের জামাতা)
মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ (গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ বীর প্রতীকের ছেলে)
মাহবুবুর রহমান চৌধুরী
মিনা রহমান
মো. আবদুল হান্নান
মো. আবদুল হান্নান (মুক্তিযোদ্ধা)
মো. আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী (শহীদ আবদুল মালেক বীর প্রতীকের ভাই)
মো. আবু আকতার (শহীদ আবু বকর বীর বিক্রমের ভাই)
মো. আবুল কালাম মোল্লা
মো. আলমগীর হোসেন
মো. ইমরান হোসেন (সারোইল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)
মো. গুলজার হোসেন (মো. আবদুল কুদ্দুস বীর প্রতীকের ছেলে)
মো. মনির মিয়া (মো. আবদুল মালেক বীর বিক্রমের ছেলে)
মো. মিজানুর রহমান (তবারক উল্লাহ বীর প্রতীকের ছেলে)
মো. মিজানুর রহমান (মো. খলিলুর রহমান বীর প্রতীকের ছেলে)
মো. মোশতাক আহমেদ (আবদুল আউয়াল সরকার বীর প্রতীকের ছেলে)
মো. শাহীন আলম (আবদুল হক বীর বিক্রমের ছেলে)
মো. শাহেদ ববি
মো. সালাহ উদ্দিন (মো. মহিবুল্লাহ বীর বিক্রমের ছেলে)
মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন (আহমেদুর রহমান বীর প্রতীকের ছেলে)
রবিউল ইসলাম
রাফিয়া চৌধুরী
লুৎফর রহমান (মো. আবু তাহের বীর প্রতীকের ছেলে)
লুৎফুন্নাহার
লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইবনে ফজল সায়েখউজ্জামান (শহীদ ইবনে ফজল বদিউজ্জামান বীর প্রতীকের ছোট ভাই)
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম
লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহিদ সিদ্দিকী (শহীদ আবু বকর সিদ্দিকী বীর বিক্রমের ছেলে)
শাহীন সুলতানা
শিমুল আকন (আলী আকবর আকন বীর প্রতীকের ছেলে)
শেখ হাবিবুর রহমান (শেখ সোলায়মান বীর প্রতীকের ছেলে)
সাইদুল আলম বীর প্রতীক
সাকিল আজাদ (দেলোয়ার হোসেন বীর প্রতীকের ছেলে)
সিরাজুল ইসলাম (নূর আহমেদ গাজী বীর বিক্রমের ছেলে)
সুব্রত চক্রবর্তী ও কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিলেট মহানগর ইউনিট
সুলতানা আকবর
সেলিমউদ্দিন
সৈয়দ সাজ্জাদ আলী (সৈয়দ মনসুর আলী বীর বিক্রমের ছেলে)
স্মৃতি বেগম (মো. দৌলত হোসেন মোল্লার মেয়ে)
হাবিব গাজী (শহীদ এনামুল হক গাজী বীর প্রতীকের ভাতিজা)
হাবিবুর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~